২১ জানুয়ারি ১৯৮৭ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ চার টাকা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

স্ক্যান করে দিয়েছেন : পার্থ ভট্টাচার্য

এডিট করেছেন : সুস্মিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বোর্নভিটা দিয়ে জেগে উঠল শরীর-মন স্বাস্থ্যে ঝলমলালো!

প্রতিটি মা জানেন যে, ক্যাডবেরিস বোর্নভিটা. কোকো, মল্ট, দুধ ও চিনির পুষ্টিগুণে ভরপুর থাকে। বোর্নভিটা দুধে, এমনই স্বাদেভরা গুণ ভরে দেয়, যা বাচ্চাদের দারুণ পছন্দের—

যেসব বাচ্চারা প্রতিদিন বোর্নভিটা পায়, প্রতি কাজে ও প্রতি খেলায় তারা স্ফূর্তি দেখায়—বোর্নভিটা, সুস্থ-সবল, সজাগ-সচেতন রাখতে ও বাড়তে, ওদের সবদিক দিয়ে সঙ্গ দেয়।

এ হল সেই স্বাদ, যার সাথে সাথে বাড়তে থাকার মজাই আলাদা!

ক্যাডবেরিস

বোর্নভিটা

ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলমূর্তি রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭
ডোরাকাটা জামা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৪
সম্পূর্ণ উপন্যাস
(শেষাংশ)
মাঠের রাজা । দুলেন্দ্র ভৌমিক ৩০

গল্প
শিকড়ের সন্ধানে । রতন ভট্টাচার্য ৮

গোয়েন্দা যখন ছোটমামা
মীরা বালসুব্রমনিয়ন ৮৩
কাব্য-কাহিনী
নিমকের মর্যাদা
প্রভাকর মাঝি ১৪
প্রচ্ছদকাহিনী
ডোবা জাহাজের রত্ন উদ্ধার
চঞ্চল পাল ৪৮

সমুদ্রতলের লুপ্ত-ধন
প্রসাদ সেন ৫৫
টাইটানিক কি আবার ভেসে উঠবে
বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ৫৬

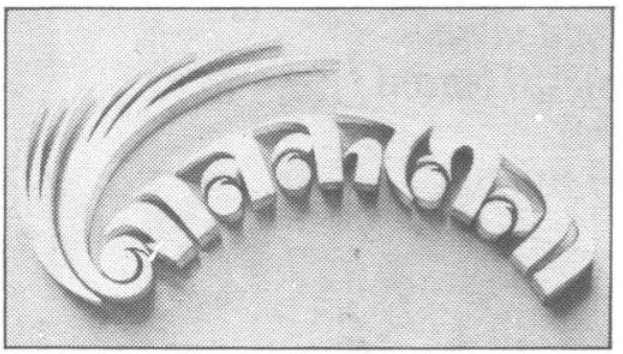

ভ্রমণকাহিনী
অলকানন্দার দেশে
উদয়ারুণ রায় ৯০

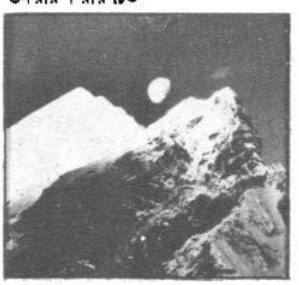

সাক্ষাৎকার
শিশুদের বন্ধু আমজাদ
আশিস চট্টোপাধ্যায় ২০

বিজ্ঞানবিচিত্রা
আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন
বিশ্বরূপ সেন ৪৭
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে
অনুসন্ধানী ৫৯

শার্লক হোমসের গল্প
গ্রিক দোভাষীর বিপদ
সার আর্থার কোনান ডয়েল ৬১
যন্ত্রসব
তারাপদ রায় ৬০
জানা-অজানা
সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬০
পশ্চাৎপট
কাওলিনের কথা ৭

লেখাপড়া
উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম
বাণীব্রত চক্রবর্তী ২৩
বিশ্ববিচিত্রা
গভীর জঙ্গলের পিগমি-সমাজ ২৯

খেলাধুলো
মার্শাল মনে করেন, বয়কটই সেরা
গৌতম ভট্টাচার্য ৭০

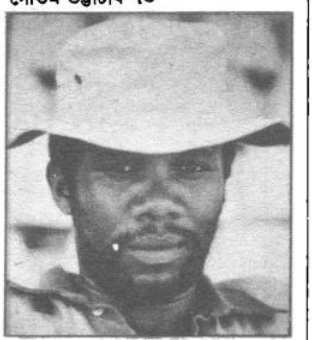

লর্ডস ও এম· সি· সি–র দুশো বছর
আশিস উপাধ্যায় ৭১
ম্যাকেনরো কি ফর্মে ফিরবেন
সুভাষ সরকার ৭৩
কী করে বক্সার হলেন মহম্মদ আলি
অশোক রায় ৭৫

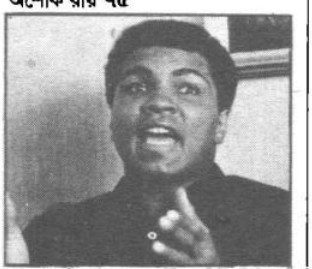

কমিকস্
স্পাইডারম্যান ২৭, টারজান ৬৭, টিনটিন ৬৮, রোভার্সের রয় ৭৭, স্টার ওঅরস ৮৭, গাবলু ৮৯
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৫, কুইজ ৬, ডাকটিকিট ৬৪, ম্যাজিক ৬৪, যোগব্যায়াম ৬৫, অনুষ্ঠান ৬৫, দূরদর্শনে ৬৬, ডাক্তারবাবু বলছেন ৭৯, ধাঁধা ৮০, হাসিখুশি ৮০, মজার খেলা ৮০, আঁকিবুকি ৮১, শব্দসন্ধান ৮১, কিসের ফোটো ৮১, সহজে ইংরেজি ৮২, অর্থ জানো ৮২, বইয়ের খবর ৯৪
প্রচ্ছদ
বিমল দাস

আগামী সংখ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প : বটুকদাদার গল্প
হিমানীশ গোস্বামীর সম্পূর্ণ উপন্যাস : ভয়ংকর বাংলোয়
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী : ড্র্যাকুলার মুখোমুখি
সঙ্গে ড্র্যাকুলা নিয়ে সম্পূর্ণ কমিকস্
কুইজ □ খেলাধুলো □ বিজ্ঞান □ লেখাপড়া

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম চার টাকা ।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ৩০ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

আপনার পরিবারের
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার
এখন
ফ্যামিলি প্যাকে

চকোলেট স্বাদের কমপ্লান এখন ১ কিলো টিনে!

৪ টাকা বাঁচান!

৫০০ গ্রামের দুটি'ন কেনার চেয়ে, কমপ্লান-এর নতুন এক কিলোর টিন কিনুন আর ৪ টাকা বাঁচান।

একমাত্র কমপ্লান-এই আছে ঠিক অনুপাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত ২৩-টি পুষ্টিকর খাদ্যগুণ, যা পরিবারের প্রতিজনের প্রতিদিন প্রয়োজন। এতে আছে প্রোটিনের সেরা, মিল্ক প্রোটিন (২০%) আর আছে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ।

পরিবারের সকলের জন্যে কমপ্লান দিনে দুবার অপরিহার্য্য।

কমপ্লান® – সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

স্বাস্থ্যের উৎস
গ্ল্যাক্সো

ULKA-GL-K-85 BEN

আমাদের সৌর পরিবার

'আমাদের সৌর পরিবার' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় নিজের কক্ষের ওপর একবার ঘুরছে। কিন্তু তা হবে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ২৩·৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে বলে লেখক যে মন্তব্য করেছেন, তা ভুল। এটা হবে ৬৬·৫ ডিগ্রি।

অর্ণব রায়
কলকাতা ৫৩

'আমাদের সৌর পরিবার' প্রবন্ধটি আমাদের মতো ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগবে। কিন্তু প্রবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ২৩·৫ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে।' এই তথ্য কি ঠিক ? আমার মনে হয়, পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ৬৬½ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানালে উপকৃত হব।

জয়দেব আচার্য
কৃষ্ণনগর

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমাদের সৌর পরিবার' প্রবন্ধটি খুব ভাল হয়েছে। আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে গ্রহ ও সূর্য নিয়ে অনেক প্রবন্ধ আছে। কিন্তু তার কোনওটিতেই এমন সুন্দর ও সহজ করে ছাত্রদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেই। তবে লেখকের কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। তিনি লিখেছেন, বাঙালি জ্যোতির্বিজ্ঞানী জগদীশ ভট্টাচার্য ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করেন ১৯৭৭ সালে। কিন্তু জগদীশবাবু কীভাবে ওই বলয় আবিষ্কার করলেন তা জানালে ভাল হত। মনে হয়, এই আবিষ্কারের কাহিনীও রীতিমত চমকপ্রদ।

অমিতাভ সেন
কলকাতা ২৯

দশম আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। নাম ভলিকান।

বিশ্বপ্রকাশ দাশ
ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ
রবিব্রত ঘোষ
দুর্গাপুর ৪

কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা

আনন্দমেলার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা দারুণ ভাল লাগল। বাংলা ভাষায় যে উৎকৃষ্ট মানের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখা হয়, এই সংখ্যাটিই তার প্রমাণ দেবে। বিদেশী সায়েন্স ফিকশন-এরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই সংখ্যায়। সঙ্গে যেসব ছবি দেওয়া

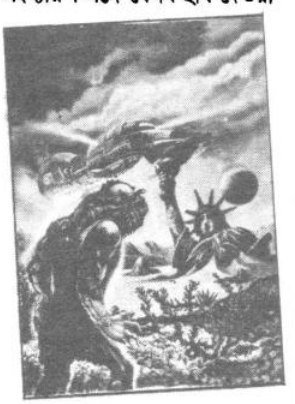

হয়েছে, সেগুলিও চমৎকার। আমাদের দেশে এরকম সংখ্যা আর বেরোয়নি বলেই মনে হয়।

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য
তমলুক, মেদিনীপুর

বারো মাসের ছড়া

'বারো মাসের ছড়া' পড়লাম আনন্দমেলার ২৬ নভেম্বর সংখ্যায়। এটি পড়ে আমাদের এত ভাল লেগেছে যে, তা কলমের আঁচড়ে বোঝানো অসম্ভব। আমাদের ভাল-লাগাটুকুই শুধু জানিয়ে দিলাম।

মোহনচন্দ্র মণ্ডল,
বেঙ্গাই, হুগলি

মাসাইরা রক্ত কোথায় পায়

চিঠিচাপাটি বিভাগে মানসী ভট্টাচার্য জানতে চেয়েছেন, মাসাইরা দুধের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে খায়, তারা পশুহত্যা করে না, তা হলে তারা এই রক্ত কোথা থেকে পাচ্ছে ? লেখক ছাড়াও, আশা করি, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। মাসাইরা দড়ি ও এক টুকরো কাঠ

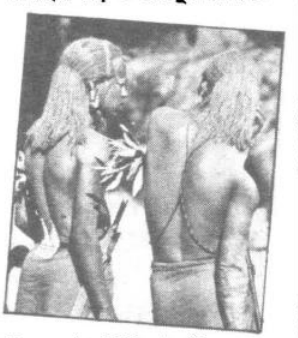

দিয়ে একটা জিনিস তৈরি করে। সেটা তারা গোরু বা বাছুরের গলায় আটকে একটা শিরা ফুলিয়ে নেয়। সেখানে তারা তীর মারার ফলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই রক্তই তারা সংগ্রহ করে ও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খায়।

দেবযানী চ্যাটার্জি
শ্রীনিকেতন, বীরভূম

বেতলার জঙ্গলে রবিন হুড

'বেতলার জঙ্গলে রবিন হুড' লেখার এক জায়গায় বলা হয়েছে, রীতেশ তলোয়ার ওরফে তেত্রা-র মা নেই। আবার পরে লেখক বলেছেন, তেত্রার মা শিক্ষিকা। কোন্‌টা ঠিক ? লেখাটি পড়ে কিন্তু, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না।

শুভদীপ রায়
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

লেখকের উত্তর : 'আজ কা রবিন হুড' ছবিতে রীতেশ তলোয়ার যে চরিত্রটিতে অভিনয় করছে, তার নাম 'তেত্রা'। ছবিতে তেত্রার মা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে রীতেশের মা একজন শিক্ষিকাই। ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত।

স্বপনকুমার ঘোষ
কলকাতা : ৭০০০৩৪

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ১৯৫২ সাল।
(২) সুইজারল্যান্ড।
(৩) জার দ্বিতীয় নিকোলাস।
(৪) আর্জেন্টিনা।

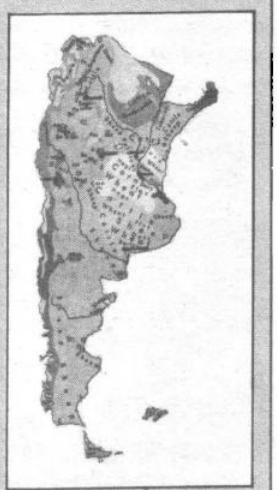

(৫) গল।
(৬) পদ্মাবতী।
(৭) পাবলো দিগো জোস ফ্রান্সিসকো দ্য পাউলা জন নেপো মুসেলিও মেরিয়া দ্য লুইস সান্টিসিমা ত্রিনিদাদ রুইজ পিকাসো।

(৮) অলিভ (জলপাই) গাছ।
(৯) জাহাঙ্গিরনগর।
(১০) লালফৌজ (রাশিয়া)।
(১১) লাইট অ্যামপ্লিফিকেশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশান অব রেডিয়েশান।
(১২) ডাঃ যোসেফ বেল।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

সি· ভি· রামন

সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানে পেয়েছিলেন চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন। তাঁর জন্ম ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ভূম্যধিপতি পিতার পুত্র রামনের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল অত্যন্ত অল্প বয়সেই। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন, আর মাস্টার্স ডিগ্রি পান ১৮ বছর বয়সে। আলোকতরঙ্গের উপরে সেই বয়সেই তাঁর একটি মৌলিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট সুযোগ সেই সময়ে এ-দেশে ছিল না। রামন তাই অর্থনীতিকেই তাঁর বৃত্তির বিষয় হিসেবে বেছে নেন। একই সঙ্গে ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়ে তারই মধ্যে চালাতে থাকেন তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার কাজ।

বিজ্ঞান-বিষয়ে নানা প্রবন্ধও তিনি লিখে যেতে থাকেন। তাঁর গবেষণা ও প্রবন্ধের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ দেরি হয়নি। ফলে, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদ গ্রহণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

রামন যখন নোবেল পুরস্কার পান, এই পুরস্কারের অর্থমূল্য তখন ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার। সেই অর্থ দিয়ে তিনি প্রচুর হিরে কেনেন, এবং তাই নিয়ে চলতে থাকে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার কাজ। ৮২ বছর বয়সে বাঙ্গালোরে তিনি মারা যান।

প্রশ্ন

(১) কবে প্রথম ডেভিস কাপের খেলা হয়? —**সুমিত্রা পাল**, শিলচর।

(২) ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করেন কে? —**দীপ্তদীপ চক্রবর্তী**, করিমগঞ্জ।

(৩) ৮৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইংল্যান্ডের নাম কী ছিল? —**সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়**, দুর্গাপুর।

(৪) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম কী? —**জয়ন্তী মণ্ডল**, কৃষ্ণনগর।

(৫) 'গালিভার'স ট্রাভেলস' বইটি কার লেখা? —**অংশুমান ঘাটি**, আসানসোল।

(৬) পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি? —**রাজা সেনচৌধুরি**, সোদপুর।

(৭) পেঙ্গুইন কী? —**অভিজিৎ রায়নন্দী**, সোদপুর।

(৮) কোন লেখিকা মেরি ওয়েস্টম্যাকট ছদ্মনামেও লিখেছিলেন? —**ধ্রুবজ্যোতি সেন**, আগরপাড়া।

(৯) 'সুনন্দ' কার ছদ্মনাম? —**মঞ্জুলা রায়**, পানিহাটি।

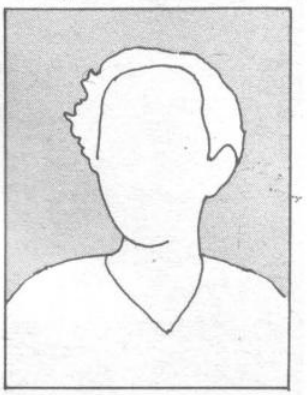

(১০) কোন্ ভারতীয় প্রথম বিলেত যান সাধারণের জন্য? —**অরূপ দাস**, করিমগঞ্জ।

(১১) ইডেন-টেস্টে মাত্র একজন খেলোয়াড়ই এ-যাবৎ ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। তিনি কে? —**সঞ্জয়কুমার মাইতি**, মেদিনীপুর।

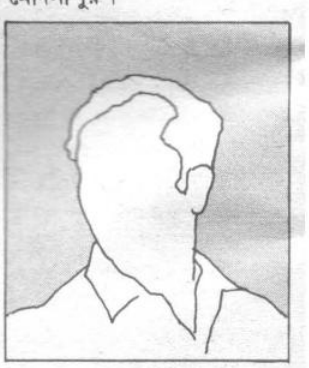

(১২) রাজা ভগীরথ কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? —**ইন্দ্রনীল চৌধুরী**, আসানসোল।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

ওপরে, দেওয়াল সাজানোর চিত্রিত টালি, ইরানে পোর্সেলিনের তৈরি। নীচে, দুর্মূল্য শিল্পসামগ্রী

কাওলিনের কথা

পোর্সেলিন বস্তুটা আসলে মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে কিনা যে-কোনও ধরনের মাটি নয়, একটা বিশেষ ধরনের মাটি, যাকে আমরা চিনেমাটি বলে থাকি। এই মাটিই হল মূল উপাদান, এর সঙ্গে ফেল্‌ড্‌স্পার বা অ্যালকালি অ্যালুমিনা সিলিকেট, আর কোয়ার্ট্‌জ পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে পেয়ালা, পিরিচ, ছাইদান আর পুতুল থেকে শুরু করে কত যে বাহারি জিনিস তৈরি করা হয়, তা তো তোমরা জানোই।

যাকে সেরামিক্‌স বলা হয়, তারই আওতায় পড়ে এই বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্প। এর প্রথম উদ্‌ভাবনা হয়েছিল চিন দেশে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে। 'চিনেমাটি' নামটাও তো তারই জন্যে। তবে আমরা যাকে চিনেমাটি বলি, চিন দেশে সেই মাটির নাম হল কাওলিন।

কাওলিনের তৈরি বাসনকোসন যখন ইউরোপে গিয়ে পৌঁছয়, সেখানকার লোকেরা তো অবাক। এ তো নেহাত সেদিনকার ব্যাপার নয়, তা প্রায় চার শো বছর আগের ঘটনা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটবার পরে অবশ্য ইউরোপের মানুষরা ঠিক করল যে, এমন জিনিস তারাও বানাবে। কিন্তু বানাবে বললেই কি হয়, অমন মাটি তারা পাবে কোথায় ? কাওলিন এমন স্বচ্ছ মাটি যে, তার পাতলা স্তরের ভিতর দিয়ে গলে যায় সূর্যের আলো। তা শেষ পর্যন্ত জার্মানির ড্রেসডেনে খোঁজ মিলল সেইরকমের স্বচ্ছ মাটির। এ হল ১৭০৮ সনের কথা। বলা বাহুল্য, খোঁজটা একবার পেয়ে যাবার পরে আর ইউরোপের কারিগরেরা কোনও অসুবিধেয় পড়েনি। পোর্সেলিনের কাজে দ্রুত তারা উন্নতি করতে লাগল। ড্রেসডেনে তৈরি পোর্সেলিনের কাজের সুখ্যাতি আজ জগৎ-জোড়া।

তবে কিনা চিন দেশে মিং সম্রাটদের আমলে (১৩৬৮—১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) চিনেমাটির যে সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম হত, তার সুখ্যাতিই সবচেয়ে বেশি। সেই আমলের যে-সব চিনেমাটির 'ভাস' এখনও দেখা যায়, তার এক-একটার দাম শুনলে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে। শিল্পবস্তুর যখন নিলাম হয়, শৌখিন কোটিপতিরা ছাড়া আর-কেউ তখন সে-সব ভাস-এর দিকে হাত বাড়াতেও সাহস পান না।

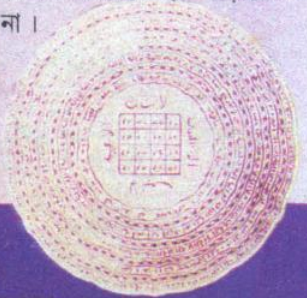

শিকড়ের সন্ধানে

রতন ভট্টাচার্য

এখানে আসার পরদিনই পিসেমশাই বলেছিলেন, "দ্যাখো বাপু, কোনও কারণে বাড়ির পিছন দিকের জলায় গিয়ে নেমো না। তোমার মা-বাবার অমতে তোমাকে এনেছি, কিছু হলে আমি আর তাদের মুখ দেখাতে পারব না।"

মানিক বলেছিল, "জলার ওদিকটা তো বেড়া দিয়ে দেওয়া পিসেমশাই।"

"এর মধ্যে তাও দেখা হয়ে গেছে?" পিসেমশাই চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, "সর্বনাশ! ওদিকে আর একদম যেও না। বেড়া দিয়েছি আমার সীমানাটুকু। তার বাইরে তো সবটাই ফাঁকা। আসবার সময়, 'ও মা, আমি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যাব। ও বাবা, আমি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যাব।' বলে এমন কান্নাকাটি শুরু করলে যে, না এনে পারলুম না। কিন্তু এখন দেখছি বড্ড ভুল করেছি। ভোরবেলা উঠে ঠিক বাড়ির পিছন দিকেই ঘুরতে চলে গেলে?"

মানিক হাসছিল। পিসিমা বলেছিলেন, "তুমি ওকে শুধু-শুধু বকছ। তুমি 'না' করলে ও সেদিকে যাবে কেন?"

ইজিচেয়ারে শুয়ে পিসেমশাই ভুড়ুক-ভুড়ুক শব্দ তুলে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। একটু আগে সকালের চা খেয়েছেন। মুখ থেকে নল সরিয়ে বললেন, "হুঁ। খবর্দার বাড়ির পিছন দিকে যেও না। গেলেও জলায় নেমো না।"

"আপনার কি ভয় হচ্ছে আমি ডুবে যাব?"

'মোটেই না। কেউ ডুবতে থাকলে তাকে ছুটে গিয়ে বাঁচানো যায়। জলার মধ্যে জায়গায় জায়গায় যা আছে তাতে পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমাকে।"

"কী আছে?"

"কুইক-স্যাণ্ড। শব্দটা জানা আছে?"

মানিক মাথা নাড়ল।

পিসেমশাই খুব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "কী শেখায় আজকাল স্কুলগুলোতে? এমন দরকারি শব্দটাই শেখায়নি। কুইক-স্যাণ্ড মানে চোরাবালি। চোরাবালি জানো তো? পা দিলেই ভুস্। একদম বালির সমাধি।"

"ওই জলার মধ্যে চোরাবালি আছে?" অবাক হয়ে মানিক বলেছিল, "আমি যে সকালবেলা দুটো লোককে জলা পার হয়ে ওপারে যেতে দেখলুম!"

"হুঁ। ঠিকই দেখেছ। মাঝখান দিয়ে এক চিলতে একটা রাস্তা আছে।"

"না, কোনও রাস্তা নেই। আমি নিজের চোখে দেখেছি জল ভেঙে পার হচ্ছে।"

"আছে, আছে। বর্ষার জলে রাস্তা ডুবে গেছে। স্থানীয় লোকেরা জানে রাস্তাটা কোথায়, তাই জল ভেঙে চলে যায়। তুমি তো আর স্থানীয় নও। ক্যালকাটার লোক। উরিব্বাপ্ রে। খবর্দার, জলে নামবে না।"

এসব হল এখানে আসবার পরদিন সকালবেলার কথাবার্তা। চা খেতে বসে পিসেমশাই বলেছিলেন। পিসেমশাই তাঁর নিজের কী কাজে কলকাতা গিয়েছিলেন। তখন সত্যি-সত্যি কান্নাকাটি করে তার সঙ্গে চলে এসেছিল মানিক। মাত্র দু-মাস আগে মাধ্যমিক পাশ করে ক্লাস ইলেভনে ভর্তি হয়েছে সে। কান্নাকাটি ছেলেমানুষি তার সাজে না। তবু করেছিল। হঠাৎ পিসেমশাইকে দেখে কীরকম যেন বেড়াবার নেশায় চেপে বসেছিল। তারপর দিন-কুড়ি পার হয়ে গেছে। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো শেষ। কালীপুজোর আর দিন সাতেক বাকি। অবশ্য এ-বাড়িতে কালীপুজো হয় না। দুর্গা, লক্ষ্মী হয়েছিল। এখানকার প্রতিমা অদ্ভুত। লম্বা-লম্বা মুখ। ডাকের সাজের প্রতিমা যেরকম হয়, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সাজটা নেই। সাজটা মানে পুঁতি আর শোলার কাজ। মাথায় মাটির মুকুট আর শেয়ালে-শেয়ালে রঙ। জয়ঢাক বাজিয়ে চারদিন ধরে সেই পুজোরই কী ঘটা। তার দুটো পিস্‌তুতো দাদা। একজন লণ্ডনে থাকে, একজন শিলিগুড়ি। পুজোর আগের দিন সেই শিলিগুড়ির দাদা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আসতেই বাড়ি ভর্তি। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছিল তারা। সেই কটা দিন দারুণ কেটেছিল মানিকের। তারপর আবার সে একা। এই বিশাল দোতলা বাড়িটায় শুধু তারা তিনজন। পিসিমা, পিসেমশাই আর সে। ফলে, বাড়ির পেছনের ভয়ঙ্কর জলাটা তাকে ভীষণ টানে। গুটি-গুটি খিড়কির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে জলার দিকে তাকিয়ে বসে সময় কেটে যায় তার। নামার প্রশ্ন ওঠে না। কেন না, কে আর সাধ করে মরতে চায়? আশ্চর্য এই যে, আজ পর্যন্ত একটা গোরু-ছাগলকেও ভুল করে জলায় নামতে দেখেনি সে। অথচ এপারে-ওপারে দু-পারেই মাঠেঘাটে গোরু চরছে। শুধু মাঝখানের সেই জলে-ডোবা অজ্ঞাত রাস্তাটা দিয়ে কখনও-সখনও সে এক-আধজনকে পার হতে দেখে। চার-পাঁচদিন বাদে হয়তো একজনকে দেখা গেল। আর পার হতে থাকা সেরকম কাউকে দেখলেই আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলে মানিক। তার ভীষণ ভয় করতে থাকে। চোখ খুলতে পারে না। মনে হয় চোখ খুললেই সে দেখবে লোকটা নেই। ভুল জায়গায় পা দিয়ে ভুস্ করে তলিয়ে গেছে।

চোরাবালির এই জলাটা যে মানিককে টানে, তার আর একটা

ত্বকে আসুক চির বসন্ত

বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—সতেজ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক'র সাথী এতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেন্ডুলা ও হাইড্রাস্টিস ভেষজ'র উপকারী নির্য্যাস। বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—প্রতিকুল আবহাওয়ায় আপনার ত্বক'র চিরকালীন সুরক্ষা। ঠোঁট ফাটা, ছোটা খাটা কাটা-ছড়া আর পোড়া'র ক্ষতকেও চটপট সারিয়ে তোলে। বোরো ক্যালেন্ডুলার ভেষজ পরশ, ত্বক'র যত্ন—সারা বরষ।

বোরো ক্যালেন্ডুলা*

অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

HL এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Micage/HL/1-86

* A PATENT AND PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY

কারণ আছে। জলাভূমিটা লম্বায় বিশাল বটে, কিন্তু চওড়ায় আধমাইলটাক। এখানে দাঁড়িয়ে ওপারের জঙ্গলটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে শুনেছে এই জঙ্গল পার হয়ে মাইল-চার গেলেই বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশ, কিন্তু অনেককাল আগে নাকি দেশটার নাম ছিল পূর্ববাংলা। তার বাবা, কাকা, পিসিমা-পিসেমশাই সবাই নাকি একদিন ওই দেশে ছিলেন। ওখানে জন্মেছিলেন। দেশ ভাগ হতে দেশছাড়া হয়ে চলে আসেন তাঁরা। ওপারের ওই জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে থাকলে বড্ড মনখারাপ হয়ে যায় মানিকের। কল্পনায় দেশটার কথা ভাবতে ভীষণ ভাল লাগে তার। সে যখন ক্লাস নাইনে পড়ত, তখন একবার খবরের কাগজে দেখেছিল মরিশাস থেকে একদল ভারতীয় তাদের পূর্বপুরুষের জন্মস্থান খুঁজতে ভারতে এসেছে। কাগজে একটা খুব মজার কথা লিখেছিল। লিখেছিল 'শিকড়ের সন্ধানে'। এই জঙ্গলটার দিকে তাকালে কথাটা খুব মনে পড়ে। পূর্বপুরুষের জন্মস্থান হিসেবে তারও তো শিকড় রয়ে গেছে ওই দেশে। তা হলে কি মরিশাসের সেই ভারতীয়দের মতো তাকেও একদিন বার হতে হবে শিকড়ের সন্ধানে ? ওই বাংলাদেশে ? ওপারের জঙ্গলটার ঠিক চারমাইল দূরে যার অবস্থান ! ভাবতে ভারী ভাল লাগে মানিকের। তাই,শুধু চোরাবালি নয়, এখানে দাঁড়িয়ে এই সব ভাববার জন্যেও সে কখনও-সখনও টুক করে খিড়কির দরজাটা খুলে বাড়ির পেছনটায় বেরিয়ে আসে।

আজও এসেছিল। তখন চারটে হবে। মসজিদ থেকে মাইকে আজান শুরু হয়েছে ঠিক তখন। পিসেমশাই মহকুমা-শহরে গেছেন। সন্ধের আগে ফিরবেন না। নিশ্চিন্ত মনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল মানিক। কার্ত্তিক মাসের দিন যেন চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এমন ভুস্ করে তলিয়ে গিয়ে অন্ধকার নামে যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন খুব জোর সাড়ে-চারটে। কিন্তু গাছের মাথায় কি এদিক-ওদিকে কোথাও একচিলতে রোদ নেই। হেমন্ত-বিকেলের মরা আলোয় কাছের জলাভূমি আর দূরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মানিকের বুকের ভেতরটা কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। কষ্ট হচ্ছিল একটু। মনে হল কেউ যেন তার বুকখানাকে ধরে ভিজে গামছার মতো নিংড়ে দিতে চাইছে।

ঠিক সেই সময় সে দেখতে পেল লোকটাকে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে অনেকখানি বাঁদিকে পিসেমশাইয়ের সীমানার প্রায় শেষে জলা পার হবার চেষ্টা করছে। জলে-ডোবা সেই গোপন রাস্তা ধরে লোকটা এপারে আসছে। প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে। মানিক অবাক হয়ে গেল। এমন ভর-সন্ধেবেলায় সে কোনওদিন কাউকে জলা পার হতে দেখেনি। তা ছাড়া সাধারণত এখানকার আদিবাসীরাই জলা পার হয়। কিন্তু এই লোকটা আদিবাসী না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটা প্যান্ট-শার্ট পরা। সম্ভবত জিন্সের প্যান্ট। গাঁট্টা-গোট্টা,এবং,সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড, লোকটার হাতে একটা বন্দুক। লোকটা কে ?

খুব কৌতূহল হল মানিকের। ভর-সন্ধেবেলা বন্দুক হাতে একটা মানুষকে দেখে তার উচিত ছিল খিড়কির দরজা বন্ধ করে বাড়ি ঢুকে পড়া। কিন্তু সেটা সে পারল না। টুকটুক করে হেঁটে বাঁদিকে পিসেমশাইয়ের জমির সীমানায় গিয়ে দাঁড়াল। সীমানার বেড়া ভেঙে গেছে। সীমানা-বরাবর রাজ্যের কাঁচা বাঁশ কেটে রেখেছেন পিসেমশাই। প্রায় বাঁশের পাহাড় বলা চলে। লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে সাবধানে বাঁশের পাহাড়ের ওপর উঠে পড়ল সে। রাস্তাটা এখানে এসেই শেষ হয়েছে।

না, গাঁট্টাগোট্টা হলেও লোকটা জোয়ান না। বয়স্ক মানুষ। মাথাটা বড়। তাতে ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। শুয়োরের কুঁচির মতো। এক-পা এক-পা করে লোকটা ভীষণ সাবধানে আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল এই রাস্তায় সে প্রথম। রাস্তাটা যে আছে তা কিন্তু জানে। মনে হয় পিসেমশাইয়ের কুইক-স্যাণ্ডের খবরও জানা। জানা বলেই এমন ভয়ে-ভয়ে আসছে। এত সাবধানতা। চমৎকার লাগছিল মানিকের। সন্ধের আলোয় বিশাল জলাভূমির মধ্যে একটা অসহায় মানুষ। অন্যান্য দিন কাউকে পার হতে দেখলে সে ভয় পায়। আজ কিন্তু তার একদম ভয় করছিল না। মানিকের মনে হল তার ভয় না পাওয়ার কারণ লোকটার বগলের বন্দুক। যেন ইচ্ছে করলেই বন্দুক বাগিয়ে ধরে লোকটা চোরাবালির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

লোকটা তাকে অনেক আগেই দেখেছে, কিন্তু কিছু বলেনি। পারে উঠতে যখন আন্দাজ হাত-সাতেক মতো বাকি, তখন লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কোন্ দিকে রে ভাই ? ডাইন দিকে, না বাঁও দিকে ?"

লোকটার বাঙাল কথা শুনে অবাক হয়ে মানিক বলল, "আমি জানি না তো।"

"আমি য্যান্ শুনেছিলাম পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে ডাইন দিকে।" লোকটা বিড়বিড় করে উঠল। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "হ। ডাইন দিকে।"

মানিকের কোনও ধারণা ছিল না। ডান দিকে না বাঁ দিকে। রাস্তাটা যে পাড়ের কাছে এসে বেঁকে গেছে তাও সে এই প্রথম শুনল। লোকটা আর কোনও কথা বলল না। হয়তো পাড়ের কাছাকাছি এসে গেছে বলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। বেপরোয়া ভঙ্গিতে ডান দিকে পা দিল। আর তৎক্ষণাৎ সেই রোমহর্ষক কাণ্ডটা ঘটে গেল। লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল জলের নীচের চোরাবালিতে। আধ-হাঁটু জল থেকে একেবারে ভুস্ করে কোমর-সমান জলে। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল মানিক। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তার। মনে মনে পরিষ্কার বুঝতে পারল চোখ খুলে আর সে লোকটাকে দেখতে পাবে না।

বোধহয় সবসুদ্ধ সে মিনিটখানেক চোখ বুজে ছিল। তারপর লোকটার আতঙ্কিত-গলা শুনতে পেল। "হায় আল্লা ! রাস্তাটা বাঁও দিকে ছিল। তুমি চক্ষু বুইজা রইল্যা ক্যান ? আমি মরি নাই। আমারে একটু হেল্প করো।" মানিক চেয়ে দেখল লোকটা একেবারে স্থিরভাবে কোমর-জলে দাঁড়িয়ে আছে। ভুস্ করে তলায়নি। মুখ-চোখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে। তাকে চোখ মেলতে দেখে লোকটা বলল, "একখান্ বাঁশ আগাইয়া দিতে পারো ?"

"বাঁশ ?"

"হ-হ, বাঁশ। যার ওপর তুমি খাড়াইয়া আছ।"

ঠিক কী করতে হবে বুঝতে না পেরে মানিক বলল, "আমি কি ছুটে গিয়ে বড় কাউকে ডেকে আনব ? বাড়িতে পিসেমশাই নেই, কিন্তু অনাথদা, বলাইদা আছে। আমাদের চাকর। ডাকব ?"

"আল্লা, আল্লা ! এই বুড়ো ছাওয়ালডা কয় কী ! অত টাইম নাই রে ছ্যামড়া। এইখানে পুরা বালি নাই, পাঁক আছে। তাই অখনও হান্ধাই নাই। কিন্তু দেরি করলে···। জোয়ান পোলা ! একখানা বাঁশ তুইলা আনতে পারবা না ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব।" ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল মানিক।

"তয় আনো। আইনা বাঁশের এক-মাথা জলে-ডোবা রাস্তাটায় দিয়া অন্য মাথা পাড়ে রাখ। বাঁশটা য্যান্ আমার গায়ের কাছে থাকে। আমি ভর দিয়া উঠুম।"

লোকটা যে সোজা বাংলাদেশ থেকে আসছে, এ-বিষয়ে কোনও

সন্দেহ ছিল না মানিকের। এ-তল্লাটে এমন নির্ভেজাল বাঙাল ভাষায় কাউকে কথা বলতে শোনেনি সে। তার বাবা মা পিসিমা পিসেমশাইও বাঙাল দেশের লোক। বাঙাল ভাষা শোনা যায় কখনও-সখনও তাঁদের মুখে। কিন্তু সে এমন নির্ভেজাল না। তাঁদের ভাষায় বাঙাল শব্দ বেশি থাকে না। থাকে শুধু একটা অদ্ভুত সুর। ভাষাতত্ত্বের এই জটিল ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময় পেল না মানিক। একখানা কাঁচা বাঁশ তুলে বাঁশের পাহাড় থেকে নীচে ফেলতে সে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেল। সেই বাঁশ লোকটার নির্দেশমতো ঠিক জায়গায় রাখতে আর একপ্রস্থ ঘাম বেরিয়ে গেল তার। কিন্তু কাজ শেষ হল না। বাঁশের ওপর দু-হাতের ভর চাপিয়ে লোকটা বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, "উঁহু। একখানায় হব না। আর একখান্ লও। এখন আর মরুমনা রে ভাইডি। ধীরেসুস্থে আর একখান্ নামাও।" ফলে আবার পাহাড়ে উঠে তাকে আর একখানা বাঁশ নামাতে হল। কাঁচা বাঁশ এত ভারী হয়,তার কোনও ধারণা ছিল না। তারপর সেই বাঁশ আগের বাঁশের পাশাপাশি রাখলে লোকটা বলে উঠল, "যাক্। পইড়া গিয়া ভাবলাম পৃথিবীর ভাত-পানি বুঝি শ্যাষ হইল। এখন দ্যাখ্‌তেছি হয় নাই।"

লোকটা তার বন্দুক পিঠের দিকে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বন্দুকের নলটা কারখানার চিমনির মতন, তার মাথার ওপর উঁচু হয়ে রইল। সেই অবস্থায় দু-খানা বাঁশের ওপর হাতের ভর রেখে সে তার শরীরটাকে ওপরে তুলে আনল। কাজটা ভয়ানক নিপুণভাবে করল সে। অতবড় গাঁট্টাগোট্টা শরীর, কিন্তু এমন নিঃশব্দে উঠে এল যে, মানিকের মনে হল একটা হালকা বেড়াল এসে বসল বাঁশের ওপর। শেষে কোমর উঁচু করে হাত ও পায়ের ভর রেখে লোকটা যখন ভিজে জামাপ্যান্ট পরে পাড়ে এল, তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে গেছে। দূরের কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। চারদিক থেকে অবিরাম ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

খুব ভাল লাগছিল মানিকের। একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে বলে সেই আনন্দে সে একেবারে ভরপুর হয়েছিল। সে আশা করেছিল লোকটা পাড়ে উঠে ভীষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তার আশা এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়তো লোকটা তাই করত। কিন্তু বাদ সাধল তার পিসেমশাইয়ের চাকর অনাথ। খিড়কির দরজা থেকে হাট-ফেরত মানুষের গলায় চেঁচিয়ে হঠাৎ ডেকে উঠল তাকে। "মানিক রে! এই মানিক, অন্ধকার হয়ে গেছে, খেয়াল নেই নাকি।"

সে সাড়া দিতে যাবে, ঠিক তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল লোকটা। তাকে বাঁ হাত দিয়ে টেনে তার ভিজে গায়ের ওপর চেপে ধরে হিংস্র গলায় বলে উঠল, "খবর্দার কথা কবি না। কথা কইছিস কি চাকু দিয়া কাইটা ফ্যালামু।" বলেই কোমর থেকে খাপসুদ্ধু একটা ছুরি বার করল। খাপটা ফেলে দিয়ে ছুরিটা উঁচিয়ে ধরল তার বুকের ওপর। "আমার নাম খোকা মিঞা। এই নাম শুনছিস কোনও দিন? লোকে আর মিঞা কয় না। কয় খোকা ডাকাত।"

মানিক কথা বলবে কি তার গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ। শুকনো গলায় ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। বুকের মধ্যে দুমদাম ঢেঁকির পাড় পড়ছিল। এমন আকস্মিক বিপদের জন্যে কোনওরকম প্রস্তুতি ছিল না, তাই কীরকম হকচকিয়ে গেল সে। অবশ্য বুদ্ধি হারাল না। লোকটার অবাধ্য হওয়া যে বিপজ্জনক তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল। এই মুহূর্তে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। কেন না, খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে টর্চ মারলেও দেখা যাবে না তাদের। মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে কাঁচা বাঁশের পাহাড়।

লোকটা এর পর যা করল তা আরও অদ্ভুত। প্যান্টের পকেট থেকে ভিজে নাইলনের দড়ি বার করে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার দু-পাও বাঁধল সেই দড়ি দিয়ে। রুমাল দিয়ে বাঁধল তার মুখ। ভিজে রুমালের গন্ধে হঠাৎ বমি উঠে এল মানিকের। কিন্তু বমি হল না। বদলে কান্না পেয়ে গেল তার। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। লোকটা অবশ্য নির্বিকার হিংস্র গলায় বলল, "বেশি টাইম লাগবে না। খুব জোর আধঘণ্টা। কমেও হইতে পারে। সাপ-খোপ নাই তো? যদি না থাহে, তাইলে ভাল। মামি দেহি তোর পিসেমশাইয়ের আইরন চেস্‌টে কী পাই। অনেক মেহনত করছি আজ। মরতে মরতে বাইচা গেছি। কিছু না পাইলে তোরে জিন্দা রাইখা যামু না।" হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশের পাহাড়ের ওপর উঠে গেল লোকটা।

মানিক উপুড় হয়ে ছিল। কাজেই বাঁশের পাহাড়ের ওপর উঠতে লোকটাকে সে দেখল না। শব্দে শুধু অনুমান করে নিল। এখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এই অন্ধকার মাঠে শুয়ে অনুমানই তার একমাত্র ভরসা। কী হচ্ছে না হচ্ছে সমস্তই তাকে অনুমান করে নিতে হবে। সে অনুমান করল তার সাড়া না পেয়ে অনাথদা নিশ্চয়ই পিসিমাকে গিয়ে বলেছে, 'না মা। মানিক বাড়ির পেছনে নেই।' তারপর পিসিমা তাকে নিশ্চয়ই অন্য জায়গায় খুঁজতে বলেছে। সে তাই খুঁজছে। আর খিড়কির দরজা হয়তো খোলাই পড়ে আছে। পিসেমশাই নেই। বলাইদাও আছে কি না কে জানে। যদি কেউ না থাকে, যদি পিসিমা একলা থাকে, একেবারে একলা, তা হলে? তা হলে যে কী হবে তা আর অনুমান করার সাহস পেল না মানিক। লোকটা ভয়ানক নিষ্ঠুর। যে প্রাণে বাঁচাল তাকেই যদি এভাবে ছুরি উঁচিয়ে অন্ধকার মাঠে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখতে পারে, তা হলে পিসিমাকে গুলি করতে একটুও আটকাবে না তার। দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি থেকে একটা ভয়ার্ত চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। কে যেন "ডাকাত, ডাকাত" বলে চেঁচিয়ে উঠল দু'বার। পরক্ষণেই বন্দুকের শব্দ এবং তারপর নিশ্ছিদ্র নীরবতা। আর কোথাও কোনও শব্দ থাকল না। যেন স্বপ্ন দেখে একবার মোটে গোঙানির শব্দ করে বাড়িটা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু তার চারপাশে জেগে থাকল অবিরাম ঝিঁঝির ডাক।

ছটফট করে উঠল মানিক। কিছু একটা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। গল্পের বইতে পড়েছে এইসব বিপদের মুহূর্তে ছোট ছেলেরা কত সব কাণ্ড করে। কিন্তু তার মাথায় কিছুই এল না। শুধু মাটিতে রগড়ে রগড়ে মুখের ওপর বাঁধা রুমালটাকে গলায় নামিয়ে আনল। মুখ আলগা হয়েছে। এখন সে চেঁচাতে পারে। কিন্তু সে বুঝতে পারল বাড়ির পেছন দিকের বিশাল জলাভূমির মধ্যে শুয়ে চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। বাড়ির লোক ছাড়া কেউ শুনতে পাবে না। খুব হতাশ হয়ে পড়ল সে। এবার নিজের জন্য ভয় করতে লাগল তার। মনে হল পাশ দিয়ে কারা যেন সরসর করে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল অন্ধকার জলাভূমি থেকে দুটো হাত উঠে এসে তাকে টেনে নামিয়ে নেবে এক্ষুনি। জলের নীচের চোরাবালিতে সে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে ভেবে ভয়ে তার দমবন্ধ হয়ে এল।

কতক্ষণ এইভাবে শুয়ে ছিল, সে জানে না। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, না ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাও জানে না সে। প্রথমে একঝাঁক আলো এসে পড়েছিল তার ওপর। বাঁশের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কেউ যেন টর্চের আলো ফেলল। তারপর তার

মনে হল, কেউ যেন লাফিয়ে নেমে এসে তার বাঁধন খুলে দিচ্ছে। সেই বলাইদার গলা শুনতে পেল। "হায় ভগবান! তুমি এখানে! তোমার জন্যে সারা গ্রাম চষে ফেলা হল!"

তার হুঁশ ফিরে এসেছিল। সে ঝটপট উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "ডাকাতটা কই বলাইদা। তোমরা কি ডাকাতটাকে ধরে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে উঠোনের মাঝখানে একটা চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে আসছি। বাবু বলেছেন থানায়-টানায় দেবেন না। আচ্ছা করে চাবকাবেন। তারপর গলায় লোহা বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন জলায়। অনাথ চাবুক আনতে ওপরে গেছে। তোমাকে কে বাঁধল?"

"কে আবার? ডাকাতটা। জলার দিকে টর্চটা মারো। দুটো বাঁশ দেখতে পাচ্ছ? ও জলা পার হয়ে আসছিল। চোরাবালিতে পড়ে যেতে ওই বাঁশ নামিয়ে ওকে বাঁচালুম। আর ও কিনা পাড়ে উঠেই···। কীভাবে ধরা হল ওকে বলাইদা? কে ধরল?"

"আমি ধরলুম।"

"তুমি! একা!"

"হ্যাঁগো, একা। আমি বাড়ি ছিলুম না। বিড়ি কিনতে বাজারে গেছলুম। অনাথ আর মা ছিল। বন্দুক দিয়ে দেখিয়ে ও বেটা মা'কে আর অনাথকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল। মা'কে দিয়ে জোর করে সিন্দুক খুলিয়ে টাকা আর গয়নাগাটি যখন কাপড়ে বাঁধছে তখন আমি ফিরে এলুম। ভগবান বাঁচিয়েছেন যে,কাউকে না দেখে আমি নীচ থেকে 'অনাথ অনাথ' বলে চেঁচাইনি। কী মনে করে সোজা ওপরে উঠে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে ওই কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। চেঁচামেচি না করে চুপচাপ ফিরে এসে সিঁড়ির রেলিঙের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে উল্টো দিকের দেওয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে বসে রইলুম। বেটা যদি হারিকেন নিয়ে না নামে তাহলে নির্ঘাত পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলব বেটাকে। একটু হাঁদাই আছে। আলোসুদ্ধু ওদের ঘরের মধ্যে শেকল তুলে বেটা অন্ধকারে এগিয়ে এল। ভূত একটা। যেই দরজার শেকল দেওয়া ওরাই অমনি ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে 'ডাকাত, ডাকাত' বলে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল। ব্যস্। লোকটা পড়িমড়ি করে ছুটে এসে দড়িতে পা আটকে সিঁড়ির ওপর চিতপটাং। তিন-চারটে সিঁড়ি একসঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে সে হুলুস্থুলু কাণ্ড। ততক্ষণে লোকজন ছুটে আসতে লেগেছে। বাবুও।"

লোকটার রুমালটা গলা থেকে খুলতে খুলতে মানিক বলল, "পিসেমশাইও ঠিক তখনই ফিরে এলেন?"

"তবে আর বলছি কী? আর কথা নয়। চলো, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চাবুক মারা দেখতে হবে না? তোমার জন্যেও তো চিন্তায় আছে সকলে।"

উঠোনভর্তি লোকজন। পিসিমা আর অনাথদার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে সবাই। অনেকগুলি হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল লোকটাকে। ঠিক উঠোনের মাঝখানে বসে আছে। চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। পিসেমশাই দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাতে চাবুক। চাবুক তুলে প্রথমে একবার বাতাসে আঘাত করলেন পিসেমশাই। এটা প্র্যাকটিস হল। এবারে মারবেন লোকটাকে। ভীষণ উত্তেজিত বোধ করল মানিক। পিসেমশাই চাবুক তুললেন, কিন্তু মারা হল না। হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, "আরে! কেডা ও? সরুপাবাদের হরবিলাস না?"

থমকে গিয়ে পিসেমশাই বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি হরবিলাস। তুই কে?"

"আমি? আমারে তুই চিনলি না হরবিলাস? আমি সেকেণ্ড মাস্টার সোলেমান মিঞার পোলা খোকা। খোকা মিঞা। আমরা একসাথে পড়ছি। মনে পড়ে?"

পিসেমশাই একটুক্ষণ অবাক হয়ে থাকলেন। তারপর হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেলে বললেন, "তুই খোকা? আমাগো সোলেমান চাচার ছেলে খোকা?"

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো ডুকরে কেঁদে উঠে লোকটা বলল, "হ, হ। আমি খোকা। আমি সেই খোকা। আল্লা! শ্যাষে আমি কিনা তোর বাড়িতে ডাকাতি করবার আইছি। মার। তুই আমারে মার। চাব্‌কাইয়া মাইরা ফ্যাল। লেখাপড়া শিখি নাই যে চাকরি করুম। টাকাপয়সা নাই যে বিজনেস্ করুম। তাই ডাকাতি ধরছি। কিন্তু কোথায় করুম ডাকাতি? গেরামে কি আর

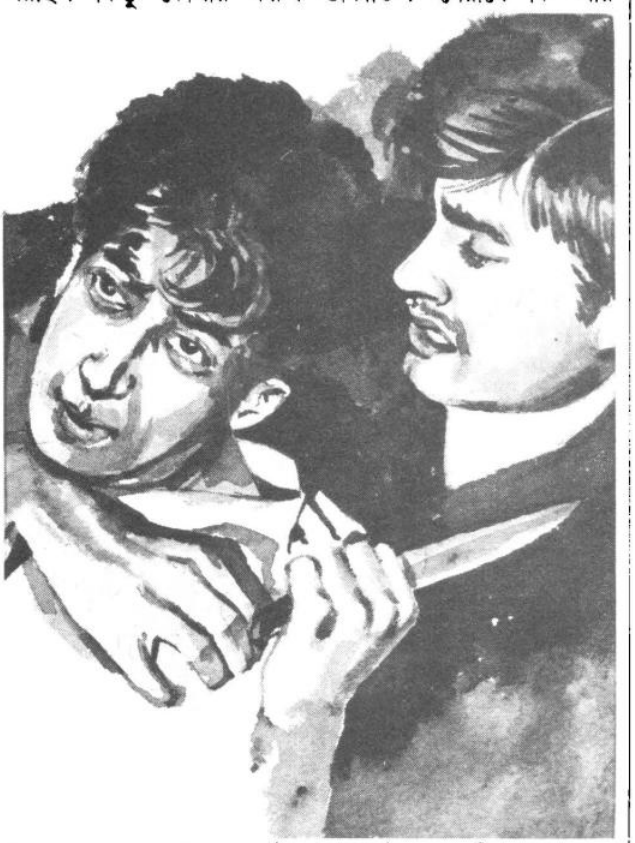

পয়সাঅলা মানুষ আছে? সেই গেরাম নাই রে হরবিলাস। তোরা চইলা আসার পর খাঁ-খাঁ করে গেরামগুলি। তাই ডাকাতি করতে ইণ্ডিয়ায় আইছি। কিন্তু আইলাম কিনা একেবারে তোর বাড়ি। আল্লা!"

একটু বেশি রাতে আকাশে কোনা-ভাঙা একটা মলিন চাঁদ উঠল। সমস্ত বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল ডাকাতের পরিচর্যায়। কিন্তু পিসেমশাইয়ের গ্রাম সরুপাবাদের কথা মানিক ভুলতে পারল না। পিসেমশাইরা চলে আসায় খাঁ-খাঁ করা সেই গ্রামটাকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। তার বাবার গ্রামও তো তা হলে ওইরকম খাঁ-খাঁ করে! খবরের কাগজের সেই কথাটা মনে পড়ল মানিকের। শিকড়ের সন্ধানে। সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে ঠিক করে ফেলল আর একটু বড় হলে সে শিকড়ের সন্ধানে ওইসব গ্রামে যাবে।

ছবি : অনুপ রায়

নিমকের মর্যাদা

প্রভাকর মাঝি

ইতিহাস থেকে গল্প বলছি,
কিন্তু এ জেনো গল্প নয়,
নির্মম এক সরল সত্য ।
গৌড়বঙ্গে এক সময়,
কল্প-কথাকে ছাপিয়ে উঠত
শক্তি এবং দুঃসাহস ।
তার সাথে ন্যায়-নীতিবোধ মিলে
রাজা আর প্রজা সবকে বশ
করেছিল ইস্‌মাইল স্বগুণে ।
আম-দরবারে প্রতিষ্ঠিত ।
সুলতান তাকে ইনাম পাঠান,
জনগণ প্রেম-কুশল দিত ।
রুক্‌নুদ্দিন গৌড়-পতির
বিশ্বাস ছিল ওপরে তার,
বন্ধুর পরে ন্যস্ত করেন
সৈন্যের পরিচালনা-ভার ।
এবং যা হয় একের কীর্তি,
অন্যের কাছে তা হলাহল
রাগে গর্‌গর্‌ করে উঠত যে
হিংসুটে সভাসদের দল ।
বসাল গোপন শলা : মানে, ভাবা—
হেনস্থা হবে কী করে তার,
কোনও কিছুতেই দৃকপাত নেই,
বীর সৈনিক নির্বিকার ।
যে আছে নিজের অন্তরে খাঁটি,
বাইরেতে তার কিসের ভয় ?
হাঁড়িমুখো ওমরাহ্‌দের মাঝে
একটি জীবন হিরণ্ময় ।
জীবন চলে না সরলরেখায়
মাঝে-মাঝে টালমাটাল হবে
কামতাপুরের কামেশ্বরকে
রুখতে লড়াইয়ে নামল যবে
ইস্‌মাইলের সৈন্যরা—মুখে
রণ-হুঙ্কার ধুন্ধুমার ;
রুক্‌নুদ্দিন নিশ্চিত হন
যোগ্যজনকে দিলেন ভার ।
সন্তোষের সে-কুরুক্ষেত্রে
দারুণ লড়াই দু'দল করে—
রণে ন্যায়-নীতি কিছু বদলালে
জয় এসে জেত মুঠোর পরে,
কামতাপুরের নির্ঘাত হার ।
খোলসা করেই বলি সে-কথা,
বিরুদ্ধ-দল-চর চেয়েছিল
জানাতে তাদের দুর্বলতা ।
সেনাপতি তাকে তিন তুড়ি দিয়ে
ফিরিয়ে দিয়েছে তৎক্ষণাৎ,
এভাবে যুদ্ধ জয় করা চেয়ে
এই দেহটাই যাক নিপাত ।
বিবেকী ইস্‌মাইলের পক্ষে
কূটনীতি কোনো নীতিই নয়—
ফলে যা হবার হল, অর্থাৎ
মেনে নিতে হল সে-পরাজয় ।

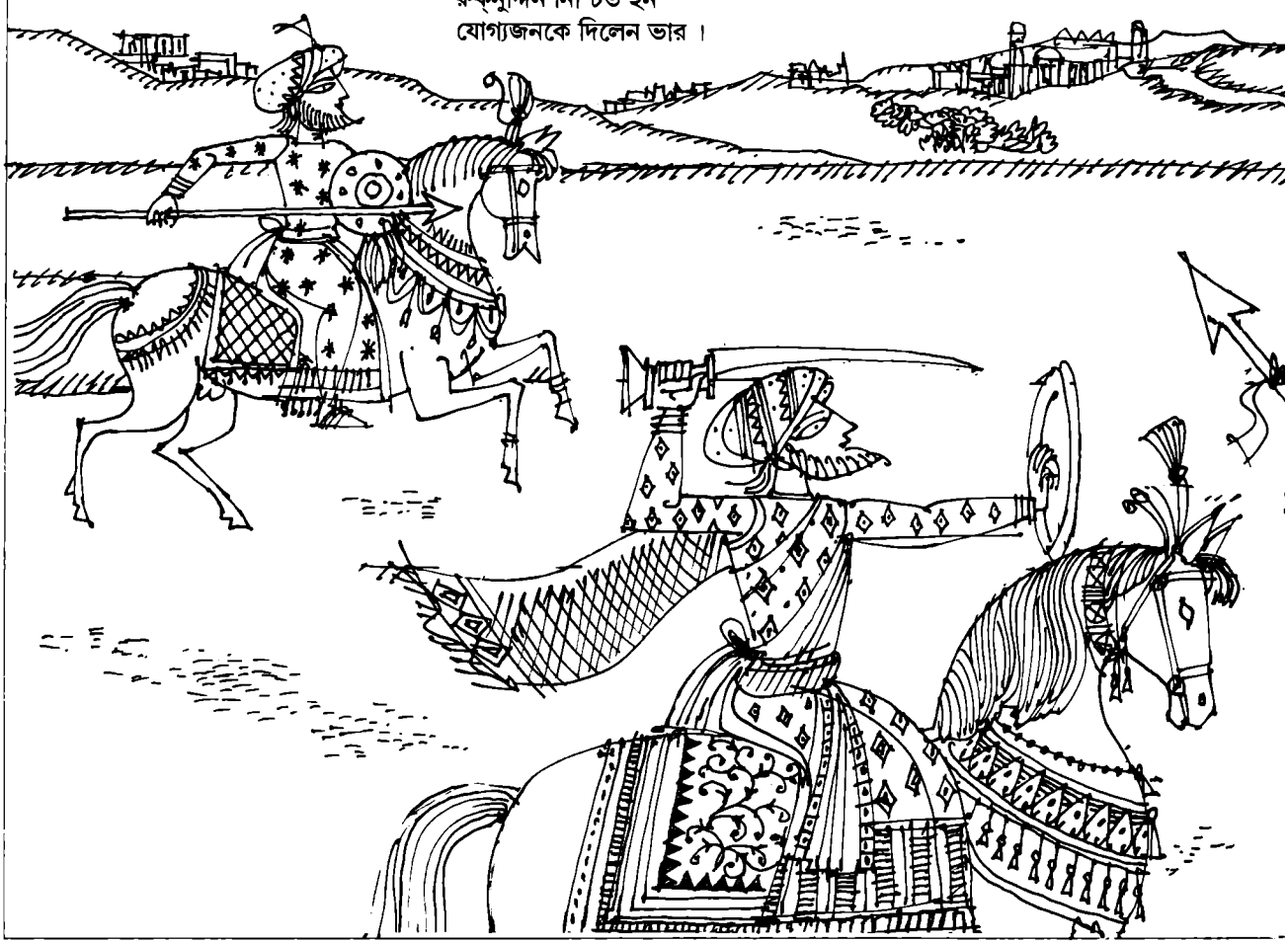

হেরেও জয়ী সে, ন্যায় হারায়নি,
পরাজয়ে ফেটে পড়েনি ক্রোধে,
বিজয়ী কামেশ্বর বশ হল
ইস্‌মাইলের ধর্মবোধে ।
কেননা তিনিই পাঠিয়েছিলেন
গোপনে গুপ্তচর দু'জন,
বাজিয়ে দেখতে ইস্‌মাইলের
বিখ্যাত ন্যায়-নীতি কেমন !
তিনি বললেন, যে-সুলতানের
সেনাপতি বীর ইস্‌মাইল,
তাঁর সাথে কোনো বৈরিতা নয়
তাঁর সাথে চাই প্রাণের মিল ।
কামতাপুরের কামেশ্বরের
মৈত্রীতে মুখে কথা না-সরে,
রুক্‌নুদ্দিন সেনানীর চোখে
আনন্দাশ্রু পড়ল ঝরে ।
এখানেই ইতি হয়ে গেলে এই
বিষাদ-মধুর ঘটনাটার
কী ভালই হত ! যা হবার নয়,
মিথ্যে কেন যে তা বলে আর
বিব্রত করা । তার চেয়ে মূল
কথাতে ঝটিতি এগিয়ে যাই,
জীবন চলে না সরলরেখায়,
এর চেয়ে বড় সত্য নাই ।
উড়ো চিঠি গেল সুলতান-কাছে
ষড়্ করে প্রিয় সেনানী তাঁর
কামেশ্বরের সঙ্গেতে মিলে
মসনদ কেড়ে নেবে এবার ।
রুক্‌নুদ্দিন বিপন্ন—তাঁর
সহজ বুদ্ধি লোপ হঠাৎ,
কী করতে গিয়ে কী যে করলেন
চক্রীর চালে কিস্তিমাত ।
ঘোড়-সওয়ারেরা পরোয়ানা নিয়ে
দ্রুত গেল সন্তোষের দিকে,
সুলতান নিজে প্রিয় সুহৃদের
চরম দণ্ড সেটিতে লিখে
পাঠিয়ে দিলেন । তখন সূর্যে
রক্তের ছাপ । পাখির গানে
ছয়লাপ মাঠ । রহস্য ফাঁস ।
কী করে যে সেনাপতির কানে
পৌঁছল কথা ! মুহূর্ত চুপ ।
অমল প্রভাতে সব বিষাদ
ভুলে গিয়ে বীর সৈনিক হাঁকে,
খড়্গ ওঠাও হে জল্লাদ,
নিমকের মর্যাদা রাখি এসো ।
সঙ্গীরা তাকে থামাতে চায় ।
তার এক জবাব—যা গেছে হারিয়ে,
তা নিয়ে কখনো বাঁচা কি যায় ?

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

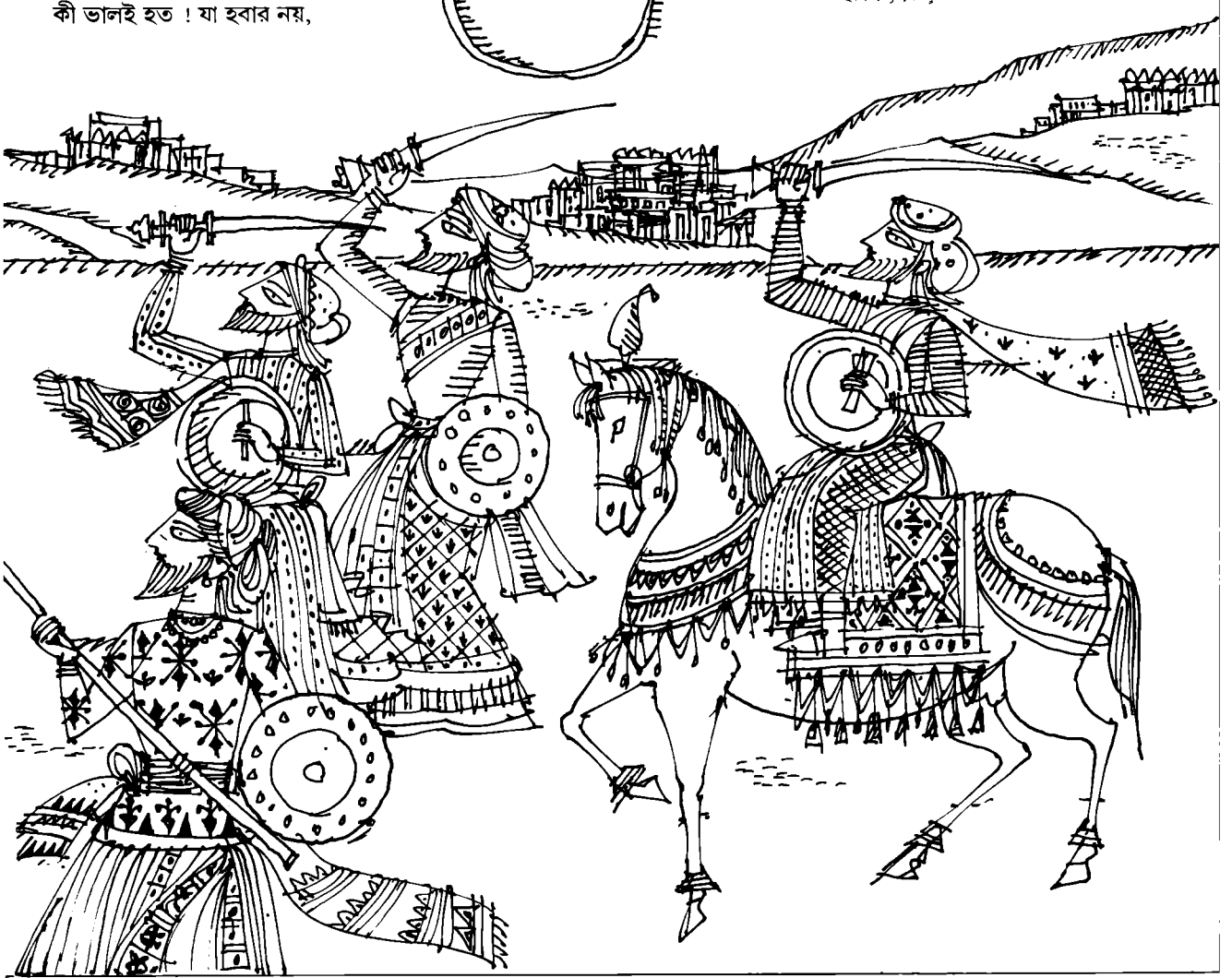

টফির রাজা দিল এক্লেয়ার্স উপহার
হৃদয় জুড়ে যার চকোলেট মজাদার !

Parry's

চকোলেট এক্লেয়ার্স

বাইরে থেকে দেখতে টফি,
মুখে দিলেই মজা একি! স্বাদেভরা
প্যারী'জ চকোলেট খেয়ে দেখো দেখি।

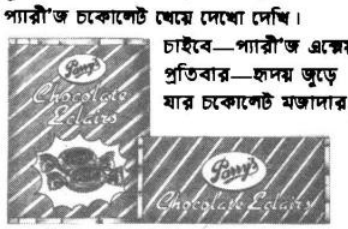

চাইবে—প্যারী'জ এক্লেয়ার্স
প্রতিবার—হৃদয় জুড়ে
যার চকোলেট মজাদার!

প্যারী'জ-এর জিভে-জল-আনা নানান উপহার:

ক্যারামিল্ক•ট্রাই মি
চকোলেট এক্লেয়ার্স
চকোলেয়ার্স
কোকোনাট ক্রীম
ললিপপ্স•গোল্ডেন বন্‌বন্

Parry's

গত ৭০ বছরেরও বেশি
টফির দুনিয়ায় সবচেয়ে সেরা নাম!

PCL 2137

নীলমূর্তি রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু তার কলেজের দুই বন্ধু জোজো আর অরিন্দমের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল বারুইপুর। সেখানে জোজোর পিসেমশাই অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। এই অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুকে অনেক কাল ধরে চেনেন, কিন্তু কাকাবাবুর ওপর তাঁর দারুণ রাগ। কী একটা ব্যাপারের জন্য তিনি কাকাবাবুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। এদিকে একদিন কাকাবাবুর নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল সন্তুকে। তারপর কাকাবাবুর খোঁজ করতে-করতে সন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে উঠে পড়ল একটা ট্রেনে। সেখানে কাকাবাবুর বদলে দেখতে পেল জোজোকে। ওদিকে অংশুমান চৌধুরীও কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছেন অন্য এক ট্রেনে। একসময়ে ওরা এসে পৌঁছল সম্বলপুরে। তারপর…

স্নান করে এবং খাওয়া-দাওয়া সেরে কাকাবাবু ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তাঁর, কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। স্টেশান থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই বাড়িটায় পৌঁছবার পর কাকাবাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাকাবাবু তখনই বলেছিলেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাই।

আসবার পথে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে কাকাবাবু দু' জোড়া করে প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জি ইত্যাদি কিনে এনেছেন। তাঁর গায়ে এখন নতুন পোশাকের গন্ধ। ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন। জীবনে তিনি অনেক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক দেখেছেন, অনেক বিপদে পড়েছেন, অনেকবার খুনে-ডাকাতদের হাতে বন্দী হয়েছেন, কিন্তু ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত লোকেরা তাঁকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেছে, এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। এরা সম্বলপুর স্টেশানে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে পর্যন্ত, যেন তিনি একজন সম্মানিত অতিথি। অথচ ঘুমের ওষুধ, ইঞ্জেকশান দিয়ে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা হালকা করে দেখছিলেন। এখন তাঁর মনে মনে রাগ জমছে। অংশু চৌধুরীর পাগলামি তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তবে, অংশু চৌধুরীর সঙ্গে এখানকার যারা হাত মিলিয়েছে, তাদেরও একবার ভাল করে দেখা দরকার। সন্তুকেই বা এরা কোথায় রেখেছে ?

কাকাবাবু দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে একটা টানা বারান্দা, পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ঘর। বারান্দার রেলিংয়ের ওপরে গ্রিল লাগানো, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা। এরা কোনও পাহারার ব্যবস্থা রাখেনি। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এরা ভাল করেই জানে যে, সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে কাকাবাবু একা-একা চলে যাবেন না।

বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা আসতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন সিঁড়ির পাশের একটি ঘরের দরজা খোলা। সেখানে বসে আছে অসীম পটনায়ক, আর কাকাবাবুর পূর্ব পরিচিত মাধব রাও। অসীম পটনায়কের গায়ে এখনও নীল সাফারি সুট, মাধব রাও পরে আছে পাজামা আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। মাধব রাওয়ের বয়েস ষাটের বেশি হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ শরীর, নাকের নীচে মোটা গোঁফ।

কাকাবাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। মাধব রাও খাতির করে বলল, "আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই ডিসটার্ব করিনি। ভালমতন বিশ্রাম হয়েছে তো !"

অসীম পটনায়ক বলল, "আসুন স্যার, ভেতরে এসে বসুন। আমাদের আজকের সন্ধেবেলার মিটিংটা ক্যানসেল হয়ে গেছে। পরে আর একদিন হবে। মিঃ অংশু চৌধুরীও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।"

কাকাবাবু এই ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা, তা দেখে কাকাবাবুর চা-তেষ্টা পেল, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি এক-দৃষ্টিতে মাধব রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মাধব রাওয়ের ঠোঁটে একটা লম্বা চুরুট। কিছুদিন আগে মাধব রাও অন্য একজন ভদ্রলোককে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাকাবাবু ওকে চুরুট খেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর সামনে। আজ মাধব রাও চুরুট নামাল না মুখ থেকে, ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মাধব রাও, আপনি একসময় দিল্লিতে সরকারি চাকরি করতেন, তাই না ?"

মাধব রাও মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক আপনার মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতাম, এখন রিটায়ার করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "রিটায়ার করার পর এইসব ইল্‌লিগ্যাল কাজ শুরু করেছেন ? আপনার নামে অভিযোগ জানালে আপনার পেনশন বন্ধ হয়ে যাবে !"

দারুণ অবাক হয়ে মাধব রাও বলল, "ইল্‌লিগ্যাল কাজ ? আপনি বলছেন কী ? আই অ্যাম স্ট্রিক্টলি অন দা সাইড অব ল।"

"কিডন্যাপিং, অ্যাবডাকশন, এ সব বেআইনি কাজ নয় ? আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা জোর করে ধরে এনেছেন !"

এবারে অসীম পটনায়ক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে ? আপনার তো স্যার সম্বলপুরে একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা। আপনি নিজে আসতে রাজি হয়েছেন !"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "আমি কোনওদিন কোনও পাবলিক মিটিংয়ে যাই না। এখানকার কোনও মিটিংয়ের কথাও আমি আগে শুনিনি। আমাকে আনা হয়েছে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে কিংবা অজ্ঞান করে। আর সন্তুকে কীভাবে আনা হয়েছে তা আমি এখনও জানি না। তারও সম্বলপুরে আসবার কোনও কারণ নেই !"

মাধব রাও বলল, "আপনি রেগে যাচ্ছেন মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি

সব কথা আগে শুনুন। আপনাকে গোড়া থেকে খুলে বলছি, সব শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের কোনও দোষ নেই। তার আগে একটু চা খাওয়া যাক। আপনি চা খাবেন তো, না কফি আনাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "চা হলেই চলবে। আগে আপনি কী বলতে চান, সেটাই শুনি !"

একটা ট্রে-তে টি পট, কাপ, ছাঁকনি ইত্যাদি সব সাজানো রয়েছে। পট থেকে কয়েকটা কাপে চা ঢালতে-ঢালতে মাধব রাও বলল, "আমার বন্ধু অনন্ত পটনায়ক একটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন, তিনি থাকলে তাঁর মুখ থেকেই সব শুনতেন। যাই হোক, আমিই বলছি। আমি আর অনন্তবাবু কলকাতায় আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম, মনে আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়ে। আপনারা আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে-প্রস্তাবে আমি ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক কি না ?"

মাধব রাও একটু হেসে বলল, "হ্যাঁ, সেদিনও আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বলা যায়। তা আপনার বাড়ি, আপনার যদি কোনও লোকের কথা পছন্দ না হয়, তা হলে তো চলে যেতে বলতেই পারেন। তাতে আমরা কিছু মনে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করেছিলুম, একবার অন্তত সম্বলপুর থেকে ঘুরে যেতে, তাতেও আপনি রাজি হননি।"

"সেইজন্যই আমাকে জোর করে ধরে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন ?"

"আরে ছি-ছি, আপনার মতন লোককে জোর করে ধরে আনতে পারি কখনও ? সে-রকম চিন্তা আমরা মনেও কখনও স্থান দিইনি। আপনি রিফিউজ করার পর আমরা আরও দু'একজনের কাছে যাই। তাদের মধ্যে মিঃ অংশুমান চৌধুরী কাজটা করতে রাজি হন। কিন্তু তিনি একটা শর্ত দেন। তাঁর কাজে আপনাকেও পার্টনার করে নিতে হবে। আমরা বললুম, সেটা তো সম্ভব নয়, আপনি রাজি হবেন না। তো, তিনি বললেন, সে দায়িত্ব তিনিই নেবেন। তিনিই আপনাকে সম্বলপুরে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন। কী করে তিনি আনবেন, তা আমরা কিছুই জানি না। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা বলে আপনাকে রাজি করানো হয়েছে।"

"মাধব রাও, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"রায়চৌধুরীবাবু, আপনি যে-কোনও শপথ করতে বলুন। আমি সেই শপথ নিয়ে বলব যে, আপনাকে জোর করে ধরে আনার কথা আমরা চিন্তাও করিনি, কোনও ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা।"

অসীম পটনায়ক বলল, "স্যার, আমরা নাম-করা ফ্যামিলি এখানকার। আমাদের বাড়িতে কারুকে জোর করে আটকে রাখব, এ তো অতি লজ্জার কথা ! আপনি একজন সম্মানিত অতিথি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর আমার ভাইপো সন্তু, সে এখানে এল কী করে ?"

মাধব রাও বলল, "অংশুমানবাবুই বলেছিলেন যে, দুটি ছোকরাও এই সঙ্গে আসবে। তবে, তাদের মধ্যে একজন আপনার ভাইপো কি না তা আমরা জানব কী করে ?"

"দুটি ছোকরা মানে ? কত বয়েস তাদের ?"

"এই আঠেরো-উনিশ হবে। কলেজের ছোকরা মনে হয়। অংশুবাবু কেন তাদের আনিয়েছেন, তাও আমরা জানি না।"

"সেই ছেলে দুটি কোথায় ?"

"তারা আছে অন্য বাড়িতে। তাদের চার্জও আমরা নিইনি। অংশুবাবুর চেনা লোক তাদের ভার নিয়েছে।"

"অংশুবাবু ভেবেছেন কী ? তিনি যা খুশি তাই-ই করবেন ? ডাকুন অংশুবাবুকে।"

"তাঁকে তো এখন ডাকা যাবে না। স্টেশানে পড়ে গিয়ে উনি কোমরে চোট পেয়েছেন, মনেও একটা শক পেয়েছেন। তাই ওঁর নিজের ডাক্তার ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।"

"মাধব রাও, আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে জানতাম। এই অংশু চৌধুরী আপনাদের কী সাহায্য করবে ? যে-লোক একটা বেড়ালের বাচ্চা দেখে ভয় পায়, সেই লোক যাবে জঙ্গলের মধ্যে একটা মূর্তি উদ্ধার করতে ?"

মাধব রাও গোঁফে তা দিতে-দিতে নিঃশব্দে হাসল। চুরুটটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, "আমাদের বরাবরই ধারণা, আপনিই একমাত্র আমাদের সাহায্য করতে পারেন। অংশু চৌধুরী আপনাকে এখানে আসতে রাজি করাবেন শুনেই আমরা তাঁর সব কথা মেনে নিয়েছি।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা মূর্তিচুরির মতন জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন, আপনার লজ্জা করে না ? আমি কিছুতেই আপনাদের প্রস্তাবে রাজি হব না। আমি আজ রাতেই কলকাতার ট্রেন ধরব, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দিন আমার কাছে।"

অসীম পটনায়ক বলল, "স্যার, হিরাকুদ ড্যাম দেখতে যাবেন না ? সম্বলপুর এসে হিরাকুদ না দেখে কেউ ফিরে যায় না। আর আমাদের সেই মিটিংটা হবে পরশুদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন। আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাঁকে সব কথা খুলে বলব।"

অসীম পটনায়ক বলল, "ট্যাক্সির দরকার কী, আমাদের বাড়ির গাড়ি আছে, তাতে আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারবেন।"

মাধব রাও বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের নামে আর একটা মিথ্যে দোষ দিলেন। আমরা আপনাকে কোনও মূর্তি চুরি করার কথা একবারও বলিনি, আমরা আপনাকে অনুরোধ করেছি, একটা চুরি-যাওয়া মূর্তি উদ্ধার করে দিতে। সেটা কি অপরাধ ? আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব ? আপনি এ-কাজ করতে রাজি হোন বা না হোন, এ বাড়ির মূর্তির কালেকশানটা একবার দেখবেন ? একটু দেখুন না, কতক্ষণই বা লাগবে ? তারপর আপনি না হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাবেন।"

কাকাবাবু অগত্যা রাজি হলেন। পুরনো মূর্তি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আছে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চলুন !"

বাড়িটি পুরনো আমলের। দেখলেই বোঝা যায় বেশ শৌখিন

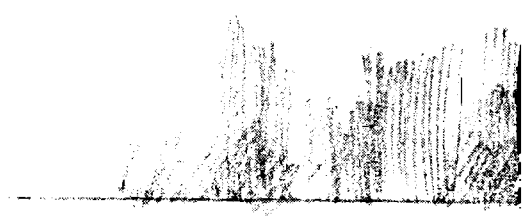

লোকের বাড়ি। তবে এখন এ-বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। এই পরিবারের মেয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এখন থাকে ভুবনেশ্বরের অন্য একটি বাড়িতে।

একতলার সিঁড়ির নীচে খানিকটা অন্ধকার-মতন জায়গা। তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে অসীম পটনায়ক একটা লুকনো দরজা খুলল চাবি দিয়ে। মাধব রাও কাকাবাবুকে বলল, "আসুন, আপনার আর একটু কষ্ট হবে, সিঁড়ি দিয়ে আরও নামতে হবে, আমাদের স্ট্যাচু কালেকশানের ঘরটা মাটির নীচে।"

মাটির নীচের ঘর শুনেই কাকাবাবুর খটকা লাগল। মাধব রাও

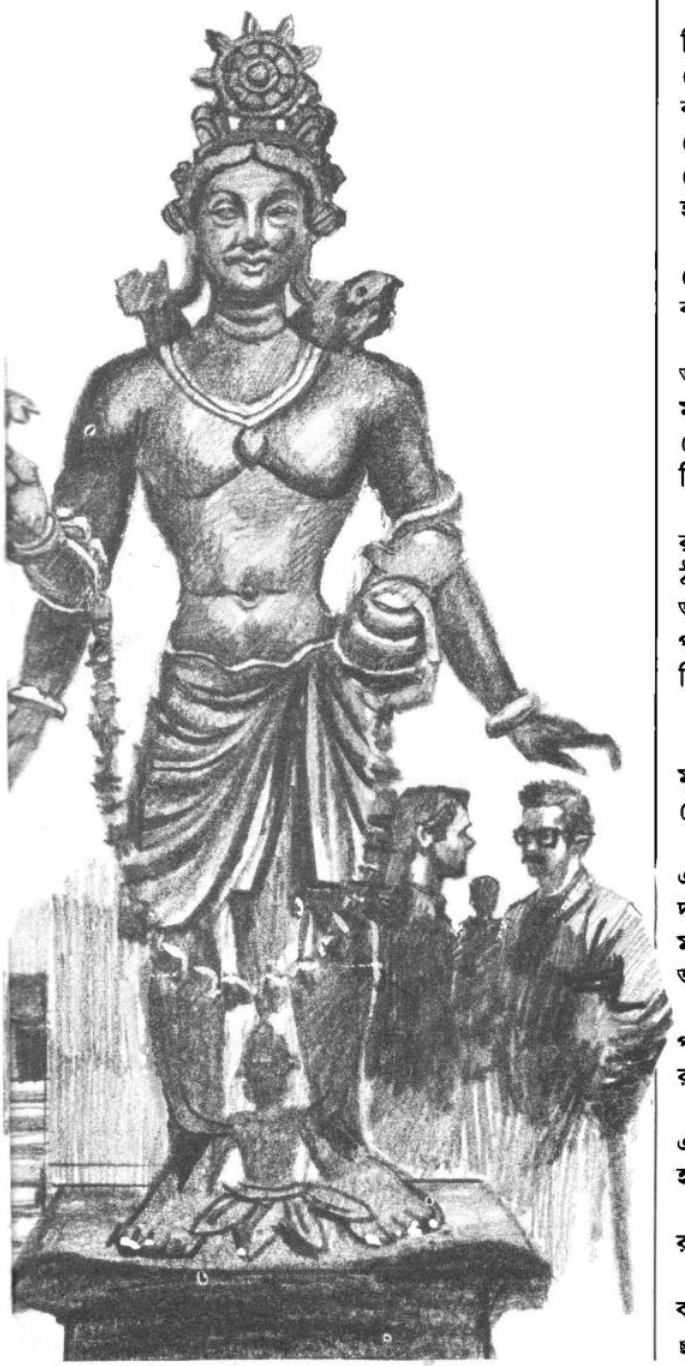

এতক্ষণ যা বলল তা সবই যদি মিথ্যে হয়, তা হলে এবারে ওরা তাঁকে মাটির নীচের ঘরে নিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারে। ওদের দু'জনের সঙ্গে কাকাবাবু গায়ের জোরে পারবেন না, তা ছাড়া মাধব রাওয়ের কাছে রিভলভার থাকা খুবই সম্ভব। কাকাবাবুর কাছে কিছুই নেই।

তবু তাঁকে যেতেই হবে। এখন আর যাব না বলা যায় না। তিনি মাধব রাওয়ের পেছন-পেছন চললেন। অসীম আগেই নেমে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চমৎকার নিয়ন আলোর ব্যবস্থা আছে, এমনকী, পাখাও আছে। ঘরটি বেশ বড়, তাতে বেশ কিছু ছবি এবং গোটা কুড়ি-পঁচিশ মূর্তি সাজানো।

মাধব রাও বলল, "অনন্তবাবু থাকলে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমিও কিছু-কিছু জানি। এই যে মূর্তিগুলি দেখছেন, এগুলো আগে ওপরেই থাকত। অনন্তবাবুর বাবার শখের কালেকশান। এ-বাড়ির ছাদে একটা ঠাকুরঘর আছে, একসময় সেখানে পুজোও হত। এর মধ্য থেকে সবচেয়ে দামি মূর্তিটাই চুরি গেছে। তারপর থেকে অন্য মূর্তিগুলো এই ঘরে এনে সাবধানে রাখা হয়েছে। এই যে এদিকটায় আসুন!"

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের বেদীর ওপর দুটি ছোট-ছোট নীল রঙের নারীমূর্তি রয়েছে। বেদীর দু'পাশে মূর্তি দুটি বসানো, মাঝখানটা ফাঁকা।

মাধব রাও ডাকলেও কাকাবাবু চট করে সেদিকে গেলেন না। অন্য মূর্তিগুলি যত্ন করে দেখতে লাগলেন। কয়েকটি বেশ পুরনো মনে হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে যে-রকম মূর্তি আছে, অনেকটা সেই ধাঁচের। কাকাবাবু দু'একটা মূর্তির গা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কিছু পরীক্ষা করলেন। তারপর চলে এলেন মাধব রাওয়ের কাছে।

মাধব রাও বলল, "এই যে দুটি নীল মূর্তি দেখছেন, এ দুটি হল রাধা আর লক্ষ্মীর। এর মাঝখানে একটা ছিল বিষ্ণুমূর্তি। ওপরের ঠাকুরঘরে সেই মূর্তিটিই পুজো করা হত। সেই মূর্তিটি চুরি গেছে, অবশ্য অনেককাল আগেই চুরি হয়েছে, কিন্তু এখন সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে। মূর্তিটা কিন্তু বেশ বড়। টারকোয়াজের মূর্তি, এক হিসেবে সেটা অমূল্য। সেটার একটা ছবি আছে না, অসীম?"

অসীম বলল, "হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল, দেখছি।"

অসীম নিচু হয়ে ছবিটা খুঁজতে লাগল, কাকাবাবু ছোট একটা নীল মূর্তি হাতে তুলে নিলেন, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বেদীটার তলা থেকে অসীম ছবিটা তুলে আনল। সেটা একটা হাতে-আঁকা ছবি। সেটা বিষ্ণুমূর্তির ছবি বলে চেনা যায় না। দাঁড়ানো অবস্থায় একজন পুরুষ, তার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গাম বুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট। ভুবনেশ্বরে এরকম একটা সূর্যমূর্তি আছে।

কাকাবাবু ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে যেতেই, সিঁড়িতে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন নেমে আসছে। অসীম বলল, "কে?" মাধব রাও পকেটে হাত দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো লম্বা ছিপছিপে একজন মানুষ, মাথায় তার একটাও চুল নেই, চোখে কালো চশমা। অংশুমান চৌধুরী। তাঁর হাতে একটা বড় কাগজের বাক্স।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখে উনি কী বুঝবেন?"

কাগজের বাক্সটা খুলে তিনি বড় একটা নীল রঙের পুরুষ-মূর্তি বার করে উঁচু করে ধরে বললেন, "এই দেখুন সেই আসল মূর্তি!"

ছবি : অনুপ রায়

(ক্রমশ)

শিশুদের বন্ধু আমজাদ

আশিস চট্টোপাধ্যায়

রাজপুত্তুরের মতো চেহারা ! তবে কি পক্ষীরাজ চড়েন না ? নিটোল দু'টি হাত ঘোড়ার রাশ না ধরে সরোদের তার আঁকড়ে রাখে। তবে, ঘোড়ার চলায় যে-গতি, যে-ছন্দ—টগবগ টগবগ, তার প্রতিধ্বনি আছে তাঁর সরোদে। এবার যদি ধাঁধার ঢঙে জিজ্ঞেস করি, কে বলো তো ? জানি সবাই মিলে বলে উঠবে : আমজাদ আলি খাঁ। একেবারে একশোয় একশো নম্বর। খুশি তো ? আজকের গপ্পো এই ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁকেই নিয়ে। কিন্তু কেন ? উনি তো আর ছোটদের লোক নন—বিরাট মাপের মানুষ, বিশাল তাঁর প্রতিভা, বিশ্বজোড়া নাম। ওঁর বাজনা শুনে যাঁরা 'কেয়াবাত' বলেন, তাঁরা তো সব নামী-দামি, জ্ঞানী-গুণী মানুষ। ছোটরা কি ওঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে ? পারে, বাপু, পারে ! আর তোমরা তা জানতেও পারবে। আমি তো এই খবরটাই তোমাদের জন্যে চুপিচুপি জোগাড় করে এনেছি। এবার তা চাউর করে দিচ্ছি।

ব্যাপারটা কী হল বলি শোনো। অনেকদিনের চেনা একটা রেকর্ডের দোকানে গেছি। এটা-সেটা রেকর্ড নাড়াচাড়া করে দেখছি। হঠাৎ দোকানের মালিক এসে নিজেই আমার হাতে একটা লংপ্লেয়িং রেকর্ডের ডবল অ্যালবাম তুলে দিয়ে বললেন, এটা দেখেছেন ? রেকর্ডের এপিঠ-ওপিঠ উল্‌টে দেখি মাথার দিকে বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা 'Amjad's Sadod sings with the children.' । ভারী অবাক লাগল। কৌতূহল হল। ভাবলুম, তাই তো, এত বড় ওস্তাদ বাচ্চাদের নিয়ে ভাবেন তা হলে ! রেকর্ডখানা নিলুম। বাড়ি এনে বাজাতেই একেবারে তাক লেগে গেল। দেখি একগাদা বাচ্চা কত অবলীলায় অমন এক ওস্তাদের বাজনার সঙ্গে সুর-তাল-লয় ঠিক রেখে গান গাইছে। কখনও বা আমজাদ একাই সরোদ বাজিয়ে মাতিয়ে রাখছেন। এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। আর গান ও সুরেরও কত না বাহার : রঘুপতি রাঘব রাজারাম, হিন্দুস্তান হামারা হ্যায় যেমন একদিকে, তেমনি আবার ডো এ ডিয়ার, কি ওল্ড্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ! আর একটা সুখবর দিই। রেকর্ডের খুদে শিল্পীদের ভিড়ে আমজাদের নিজের দুই ছেলে, ন'বছরের আমান এবং সাত বছরের আয়ানও আছে। শুনতে শুনতেই মনের মধ্যে একটা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। ভাবলুম, ওঁকে একদিন পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করব, মশাই, মতলবটা কী ? সুযোগও পেয়ে গেলাম। ইডেন হিন্দু হস্টেলের শতবার্ষিকী উৎসবে আমজাদ বাজাতে এসেছিলেন। সেখানেই দেখা। মনের কথাটা বলেই ফেললুম। ছোট্ট এবং মিষ্টি হাসি হেসে আমজাদ বললেন, 'কাল সকালে চলে আসুন। সব বলব।'

তারপর ? তারপর গিয়ে দেখি ঘরের মেঝেয় তিনটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। একটির কোলে মাপসই ছোট্ট একটি সরোদ ; অন্য দুজন মুখে সা-রে-গা-মা বলছে। আর মধ্যমণি হয়ে হাসি-হাসি মুখে বসে আছেন আমজাদ। তালিম চলছে। বসে বসে দেখতে খুব মজা লাগছিল। খানিক বাদে বাচ্চাদের ছুটি মিলতে আমাদের গপ্পো শুরু হল। আমজাদকে নানা প্রশ্ন করলুম :

ছোটবেলা থেকে গানবাজনা, শিল্পকলা ইত্যাদির সঙ্গে শিশুর পরিচয় করে দেবার প্রয়োজন আছে বইকী। তবে আজকের যুগে একটা শিশু তার পড়াশোনার চাপ সামলে গানবাজনার ব্যাপারে কতটাই বা মন দিতে পারবে ?

আমজাদ : পরীক্ষার দিনেও ওরা কমিক্‌স পড়া, ভিডিও দেখার অবসর পায়। পনেরো মিনিট রিয়াজ করার সময় হয় না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? ভালবাসা থাকলে সবই হয়। এমন অনেক বাচ্চাকেই তো দেখছি, যারা রেডিও বা টেপ রেকর্ডারে গান শুনতে শুনতে অঙ্ক কষছে।

প্রশ্ন : কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জটিল ব্যাকরণ বুঝে তার রস উপভোগ করা তো সহজসাধ্য নয়···

আমজাদ : ব্যাকরণ বুঝতে হবে ঠিকই। তবে তার সময় আছে। আগে সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা জাগাতে হবে।

প্রশ্ন : কীভাবে ?

আমজাদ : এ-ব্যাপারে প্রথমেই বাবা-মাকে দায়িত্ব নিতে হবে, তারপর ইস্কুল-কলেজ।

প্রশ্ন : আজকের মা-বাবারা অনেকেই চাকুরে। তাঁদের বাচ্চার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দেবার সময় কোথায় ? তা ছাড়া মা-বাবারা যে নিজেরা গানবাজনা জানবেনই এমন তো হয় না ?

আমজাদ : ঠিক কথা। তবে যাঁদের অন্তত

অর্থসামর্থ্য আছে, তাঁরা তো ছেলে-মেয়েদের ভাল-ভাল গানবাজনার রেকর্ড কি ক্যাসেট কিনে দিতে পারেন ? ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বসে মাঝে-মাঝে অবসর সময়ে সেগুলো বাজাতে পারেন। বাচ্চাদের নিয়ে রেডিও, টিভিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। পারেন তাদের ভাল গান-বাজনার আসরে নিয়ে যেতে।

প্রশ্ন : আর এ-সব কিছুই যদি না পারেন, তো অন্তত একজন গানবাজনা কি নাচের শিক্ষক রাখতে পারেন, তাই না ?

আমজাদ : হ্যাঁ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে। আগে আগে ছিল 'গুরুজি', এখন হয়েছে 'মাস্টারজি' !

প্রশ্ন : মানে ?

আমজাদ : মানে আর কী ! আগে ছাত্র গুরুর বাড়িতেই থাকা-খাওয়া করে দাঁতে দাঁত দিয়ে গানবাজনার সাধনা করে চলত। এখন সাইকেলে কি বাসে চেপে গুরুকেই ছাত্রের বাড়ি এসে তালিম দিতে হয়। যেদিন-যেদিন

তালিম, সেদিন-সেদিন টাকা। মানে, নগদ বিদায়।

প্রশ্ন : অর্থাৎ ?

আমজাদ : সোজা হিসেব। ধরা যাক, ইস্কুলের ছুটিতে ছাত্র বাইরে গেছে। অতএব সে তখন আর তালিম নিচ্ছে না। এর অর্থ মাস্টারজিও আর 'পার লেস্ন' তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন : এভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা হতে পারে না ?

আমজাদ : হয়ই না তো ! অবস্থার উন্নতি হতে পারে ইস্কুল-কলেজের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : যেমন ?

আমজাদ : যেমন প্রথমেই প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষাপর্ষদ বা সরকারকে নাচ, গানবাজনা আবশ্যক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি তো গত কুড়ি বছর একনাগাড়ে চেষ্টা করে চলেছি। এরপর ; বলা বাহুল্য, প্রতিটি ইস্কুলে গানবাজনা-নাচের জন্যে আলাদা আলাদা এবং যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন : এখন যেমন একই শিক্ষককে গান শেখাতে হয়, তবলা শেখাতে হয়, সে-রকম ব্যাপার নয় ?

আমজাদ : খাঁটি কথা। সব বিষয়ের জন্যে একাধিক শিক্ষক, গানবাজনার জন্যে সবেধন একটি ! এমন একটা বিদ্‌ঘুটে

ব্যবস্থায় কী ফল হয়েছে শুনুন ! কিছুদিন আগে ইউনিসেফ তাঁদের চল্লিশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে আমায় বাচ্চাদের নিয়ে একটা কনসার্ট করতে বলেন। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না, তামাম দিল্লির ইস্কুলে-ইস্কুলে ঘুরে আমি জনা-কুড়ির বেশি ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করতে পারিনি, যারা ভারতীয় গানবাজনার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জানে বা উৎসাহ করে মহলা দিতে এগিয়ে আসবে !

প্রশ্ন : আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কত জনের দরকার ছিল ?

আমজাদ : তা জনা-পঞ্চাশ। এখন আর অবশ্য বয়সের সীমা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না।

প্রশ্ন : পঞ্চাশের জায়গায় কুড়ি, সত্যিই দুঃখের !

আমজাদ : তবু আমি আশাবাদী। আমি জানি, এ-দুরবস্থা কখনও চলতে পারে না। আমরা যদি সবাই মিলে একযোগে চেষ্টা করি, তা হলে তার সুফল একদিন না একদিন ফলবেই। তা ছাড়া স্কুল-কলেজে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে গানবাজনা ও নাচের আন্তরিক চর্চা শুরু হলে, নানাভাবেই লাভ হবে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ায় সাদামাটা, তাদের অনেকেই হয়তো সঙ্গীতে সফল হতে পারে। গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়েদের চাকরির সুযোগও বাড়বে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ছোটদের ভারতীয় সঙ্গীতের বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারে বড় বড় ওস্তাদদের কি কোনও কর্তব্য নেই ?

আমজাদ : আলবত আছে। তাঁরা যদি যে-যাঁর গুমর নিয়ে চুড়োয় বসে ভাবেন যে, ছোটদের জন্যে কিছু করা মানে পণ্ডশ্রম, তা হলে ভুল করবেন। ছোটদের যে কী অসামান্য সম্ভাবনা, তা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি। তাদের দেখতে হবে , শুনতে হবে, তাদের সঙ্গে বসতে হবে, তবেই তো জানা যাবে কার ভেতর কী কতটুকু আছে। শিশুরা তো তৈরি, কেবল পথ চিনিয়ে দেবার লোক দরকার।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় না, বড় শিল্পীরা হয়তো ভাবেন, ফিল্ম, টিভি, ভিডিওর মাধ্যমে শস্তা দরের হিন্দি গান আর পশ্চিমের পপ মিউজিক আজকের শিশুদের এমনভাবে দখল করে রেখেছে যে, অন্য কিছু করতে যাওয়া সম্ভব নয় ?

আমজাদ : তা বলি কী করে ! শস্তা গানবাজনা বেশ জাঁকিয়ে চলছে বটে, তবে পাশাপাশি ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কেও ছোটদের মধ্যে বেশ একটা সচেতনতা

জাগছে। অসংখ্য স্কুল-কলেজে আমার বাজাবার ডাক আসে। এই তো সেদিন দার্জিলিঙের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেন্ট পল্‌স-এ বাজিয়ে এলাম। আগে তো ওসব জায়গায় কেবল রক্ মিউজিক হত।

প্রশ্ন : এটা খুবই স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। এই ব্যাপারটাকেই আরও ব্যাপক করে তোলা যায় মাঝে-মাঝে শুধুমাত্র শিশুদের নিয়েই গানবাজনার আসর করে।

আমজাদ : হ্যাঁ, তবে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

আমজাদ : উজ্জ্বল। বললাম না, আমি আশাবাদী !

প্রশ্ন : আপনার আশা সংক্রামক হোক, এটুকুই কেবল আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে পারি !

আমজাদ : এই যে 'দুয়া' বা 'প্রার্থনা'র কথা বললেন, এটা শুনে আমার বাবার কথা, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

প্রশ্ন : বলুন না সে-কথা। আপনার বাবা, ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ তো কিংবদন্তীর পুরুষ। তাঁর কথা শুনতে কার না ইচ্ছে হয় ?

আমজাদ : বাবা একটা কথা বলতেন, গান-বাজনা-নাচ সবই জানবে ঈশ্বরের সেবার জন্যে করছ। সেই পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তিনি যেন তোমায় অহঙ্কারী না করেন। তোমার সব অপূর্ণতাকে যেন তিনি পরম স্নেহে মার্জনা করে নেন।

প্রশ্ন : চমৎকার ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার বাবা কি আপনাকে তালিম দেবার সময় ঈশ্বরের মতো ক্ষমাহীন, স্নেহপরায়ণ হতেন ?

আমজাদ : স্নেহ ছিল অবশ্যই। তবে ক্ষমার ভাগটা কিছু কম ছিল। দু'একটা কথা বললেই আপনি স্নেহ ও ক্ষমার তফাত বুঝবেন। ধরুন, উনি একটা রাগ শেখালেন। বাজাচ্ছি। যতক্ষণ না ষোলো আনা শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ রেহাই নেই। এখানে ক্ষমার অভাব। আবার এমনও হয়েছে, জেদ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিয়াজ করে চলেছি, আব্বা এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন : 'থক গয়ে হো।' ক্লান্ত হয়ে গেছিস, শুয়ে পড়। এখানে শুধুই স্নেহ। আব্বাকে আমি গানবাজনা নিয়ে প্রশ্ন করে-করে বড্ড জ্বালাতাম। তবে কখনও উনি অধৈর্য হতেন না। আসলে উনি তো কেবল আমার বাবা ছিলেন না, ছিলেন আমার গুরুও।

প্রশ্ন : বাবার কাছে কি কেবল সরোদই শিখেছেন ?

আমজাদ : না, গানও। বলতেন গলায় সুর না এলে তা হাতে আসবে কী করে ?

প্রশ্ন : আপনাকে পড়াশোনা করাবার জন্যে বাবার কোনও ইচ্ছে ছিল না ?

আমজাদ : সত্যি কথা বলতে কী, তেমন কোনও ইচ্ছে ছিল না। বাজনা ছাড়া আর যারই চর্চা করি না কেন, তা হল সময়ের অপচয়। তবে উনি বুঝতেন যে, আধুনিক যুগে কিছু পুথিগত বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। তাই আমাকে উনি নিজেই দিল্লির খুব নামজাদা স্কুল, মডার্ন স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমার লেখাপড়া ওখানেই।

প্রশ্ন : গানবাজনা, লেখাপড়া বাদে ছেলেবেলায় আপনার আর কী কী ভাল লাগত ?

আমজাদ : ফুটবল, সিনেমা। ক্রিকেট-ব্যাট জীবনে মাত্র একবার ধরেছি। প্রথম বল গোলার মতো ছুটে আসছে দেখেই ব্যাট ফেলে চোঁচা দৌড়। ভয় হয়েছিল হাতে চোট লেগে গেলে সরোদের ছুটি হয়ে যাবে। যেমন মাঞ্জা সুতোয় আঙুল কেটে যাবার আশঙ্কায় ঘুড়ি ওড়াতেও ভয় পেতাম। তাই লাটাই ধরেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হতো।

প্রশ্ন : আর কোনও ভয় ছিল ?

আমজাদ : সত্যি বলছি, ভয়ের সিনেমা দেখলে বাড়িতে একলা শুতে গা ছমছম করত।

প্রশ্ন : ইস্কুলে কোন কোন বিষয় ভাল লাগত ?

আমজাদ : অঙ্ক ছাড়া বাকি সব।

প্রশ্ন : এতক্ষণ যা বললেন, সব কিন্তু ছাপার অক্ষরে আনন্দমেলায় বার করে দেব। তখন আমায় মিরজাফর বলা চলবে না। ঠিক তো ?

আমজাদ জোরে হেসে উঠলেন, অনেকটা তাঁর হাতের ঝালার মতো। আর আমারও নটে গাছটি মুড়োল !

ফোটো : বিবেক দাস

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম শুভেন্দুবিকাশ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ঠিক দু'বছর বাদে শুভেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হল। দু'বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। দু'বছর আগে হিন্দু স্কুল থেকে মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হয়েছিল সে। তখন সে মোট নম্বর পেয়েছিল ৮০৭।

এ-বছর হিন্দু স্কুলের শুভেন্দুবিকাশ আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মোট ৮৯১ পেয়েছে। এবার আর দ্বিতীয় নয়, হয়েছে প্রথম। দু'বছরে সে আরও বড় হয়েছে। চেহারায় এবং মনে।

আমি যখন শুভেন্দুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বাড়িতে সবাই আছেন। কিন্তু শুভেন্দু নেই। ও অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল।

ডাঃ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান শুভেন্দুবিকাশ। তার ছোটভাই দিব্যেন্দুবিকাশও হিন্দুতে ক্লাস নাইনে পড়ে। আর ছোট বোন অপরাজিতা টাকি স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্রী।

উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টে শুভেন্দু ফার্স্ট হতে পারেনি। ফার্স্ট হয়েছিল তাদের ক্লাসের কৌশিক দাশগুপ্ত। টেস্টে শুভেন্দুর মোট নম্বর ছিল ৭১৪।

শুভেন্দুর এটাই বৈশিষ্ট্য। ফাইনাল পরীক্ষার আগে সে কখনওই শীর্ষস্থান পায় না। অথচ আসল পরীক্ষায় দেখা যায় সে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে।

আমরা মুখোমুখি বসলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি আশা করেছিলে যে ফার্স্ট হবে ?"

শুভেন্দু হেসে ফেলল। বলল, "এর কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। তবে ফার্স্ট হব না ভাবিনি। আশা করেছিলাম ৯১০ থেকে ৯২০ পাব।" জয়েন্টের পরীক্ষা আমার ভাল হয়নি। আমার সমস্ত চেষ্টা ছিল উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার জন্য।"

শুভেন্দুর কাছে জানতে চাইলাম সে কীভাবে পড়াশোনা করেছে।

শুভেন্দু বলল, "জানেন, টেক্সট্ বই ছাড়া অজস্র রেফারেন্স বই পড়েছি। লিখেছি। পরীক্ষার আগের মুহূর্তেও ঘড়ি ধরে প্রশ্নোত্তর লিখেছি।

"প্রথমে বাংলার কথা বলি। প্রতিটি গদ্য ও পদ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। 'আরণ্যক' গদ্যাংশ পড়ার সময় কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি' বইটা পড়েছি। ওখানে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে অনেক নতুন কথা পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের 'নৈশ অভিযান' পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে 'শ্রীকান্ত' বইটির সব ক'টি খণ্ড পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' পড়ার জন্য শিবরাম চক্রবর্তীর লেখাও পড়েছি।

"তবে এই প্রসঙ্গে আর-একটি বইয়ের কথা বলব। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য'। এই বইটি থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর লিখতে

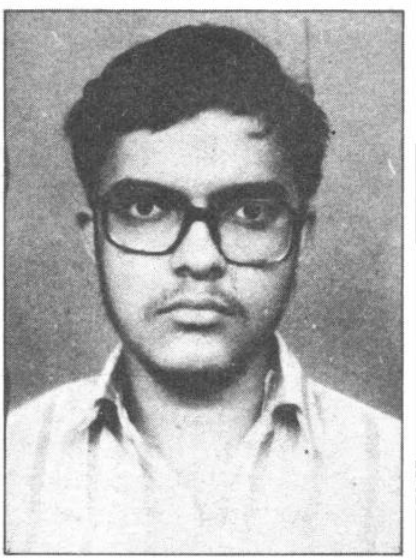

সাহায্য পেয়েছি। তা ছাড়া অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিটি খণ্ড পড়েছি।

"ইংরেজিও এই একইভাবে।

"রচনা লেখার ব্যাপারে কোনওরকম মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় নিইনি। আমার মনে হয় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজির যে সিলেবাস আছে তাতে আমাদের ভাষাশিক্ষাই হয়, সাহিত্যবোধ জাগে না। বাংলা ব্যাকরণে বামনদেব চক্রবর্তীর বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। ফিজিক্সে দত্ত-পাল-চৌধুরীর বই, অজয় চক্রবর্তীর বই ছাড়াও পড়েছি রেসনিক হ্যালিডের বই। কেমিস্ট্রিতে পোদ্দারের বই, রঞ্জিত দাসের বই ছাড়াও ভাল্ অ্যাণ্ড ভালের অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়েছি। অঙ্কে মাইতি-ভট্টাচার্য, দাস-মুখার্জির বই। আমার ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল বায়োলজি। এতে সান্যাল-চ্যাটার্জির বই পড়েছি। আর পড়েছি সি· সি· চ্যাটার্জির 'হিউম্যান ফিজিওলজি'।"

একটানা কথা বলে শুভেন্দু থামল।

জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কী পড়ছ ?"

শুভেন্দু বলল, "পড়ছিলাম তো খড়্গপুর আই· আই· টি·'তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তবে ডাক্তারিতেও চান্স পেয়েছি। ডাক্তারিই পড়ব ভাবছি।"

"আগেই ডাক্তারি পড়লে না কেন ? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আই· আই· টি·'তে গেলে কেন ?"

আমার প্রশ্নে শুভেন্দু লজ্জা পেল। মনে হল ও যেন কিছু গোপন করছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, "মাধ্যমিকে ফার্স্ট হইনি। দুঃখ ছিল। তারপর জয়েন্টে যখন ডাক্তারিতে চান্স পেলাম তখন সেই দুঃখকে যেন নতুন করে টের পেলাম। জয়েন্টে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেয়েছি। তাই কলকাতা থেকে একটু দূরে চলে গেলাম। মনে-মনে সঙ্কল্প করলাম, যদি উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট হই, তবে কলকাতায় ফিরব। ডাক্তারি পড়ব।"

"এবার তো ফার্স্ট হলে। খুব আনন্দ হচ্ছে ? এই মুহূর্তে কাদের কথা মনে পড়ছে ?"

"হ্যাঁ, আনন্দ হচ্ছে। আমি যে ফার্স্ট হলাম সে কৃতিত্ব শুধু তো আমার একার নয়। মা-বাবা-কাকারা তো আছেনই। আর আছেন আমার দাদু ত্রিপুরাচরণ স্মৃতিতীর্থ। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পাঁচড়া গ্রামে আমাদের আদিবাড়িতে উনি থাকেন। আমি আমার হিন্দু স্কুলের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ওই স্কুলের মাস্টারমশাইরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। হেডমাস্টারমশাই শ্রী পরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছেও আমি ঋণী। তবে স্কুলের বাইরেও আমি তিনজন মাস্টারমশাইয়ের কথা বলব, যাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। জঙ্গীপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য এবং আড়িয়াদহ কালাচাঁদ ইন্সটিটিউশন-এর ইংরেজির শিক্ষক শ্রী নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ।"

"আচ্ছা শুভেন্দু, বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও।"

শুভেন্দু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, সাহিত্যিক।

"খেলাধুলো পছন্দ করো ?"

"হ্যাঁ। আমার প্রিয় দল মোহনবাগান। রাত জেগে বিশ্বকাপ দেখেছি।"

ডেরাকাটা সামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : ইস্কুলের ফাংশানে মজার সব কাণ্ড। বেঁটে আর লম্বু নিতুকে নিয়ে পালিয়েছিল। সুকু, কমল ভৌমিক এবং ডি· এম· ওদের ধরে ফেলেন। লম্বু আসলে গোয়েন্দা-লেখক সুদর্শন। বেঁটে পালাল, ডি· এম'ও চলে গেলেন। সুদর্শনের হার্ট অ্যাটাক হল। ডক্টর মুখার্জি টিয়াসাঁকোর আলম সাহেবের ডেরার কুলুঙ্গি থেকে সাপের বিষের শিশি নিয়ে হাসপাতালে ফিরলেন। কমল ভৌমিক ডক্টর মুখার্জির বাড়িতে খবর দিতে চললেন। পথে শিউপূজন ও নাগরা নামে দু'জন লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধল। বাড়ি ফেরার পথে ডক্টর মুখার্জি কমল ভৌমিককে গাড়িতে তুলে নিলেন। বাড়িতে ডক্টর মুখার্জির স্ত্রী রাজ্যেশ্বরী রান্না করে রেখেছিলেন। খাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর হরেনদা হাজির হলেন। নিতুকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপর···

কমল ভৌমিকের হাঁক শুনে, রুকু, সুকু, রাজ্যেশ্বরী, ডাক্তারবাবু সবাই ছুটে এসেছেন। হরেনদা একটা চেয়ারে ফ্যালফ্যালে মুখ করে বসে আছেন। নিতু একপাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে। আর কমল ভৌমিক যেন স্টেজে উঠেছেন। এক্ষুনি নতুন একটা খেলা শুরু হবে, এই রকম একটা ভাব।

কমল ভৌমিক রুকু আর সুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এক মগ জল আর ভোঁতা একটা ক্ষুর আনতে পারো ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ও হো, সকাল থেকে আপনার দাড়ি কামানো হয়নি, আমি খেয়াল করিনি ! একসকিউজ মি ! ক্ষুর কী হবে, আমার নতুন সেভিংসেট আছে !"

"ব্লেড দিয়ে তো আর মাথা কামানো যাবে না ?"

"আপনি ন্যাড়া হবেন ?"

"ন্যাড়া হব না, ন্যাড়া করব !"

"কাকে ন্যাড়া করবেন ?"

"এই মহামান্য ভদ্রলোককে !"

"ন্যাড়া করবেন কেন ?"

"আপনি জানেন, নিজেদের হাতে পেয়ে এই মাথামোটা ভুঁড়িদাস ভদ্রলোক এই বাচ্চা ছেলেটার, যে নাকি ওর ভাগনে, এই শীতে মাথাটা কামিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

কমল ভৌমিক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। মুখ-চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। ঘরময় পায়চারি করছেন আর বলছেন, "জানেন, জোর করে ধরে কারও চুল কামিয়ে দেওয়া একটা কত বড় অপমান। কত বড় ইনসাল্ট। সেই মুহূর্তে এই নিরীহ ছেলেটার মনের অবস্থা কী হয়েছিল আপনারা ভাবুন। আমরা আমাদের পাড়ায় একবার একটা চোরকে ধরে স্রেফ ন্যাড়া করে ছেড়ে দিয়েছিলুম।"

হরেনদা, হাউহাউ করে বললেন, "ও চোর ! আমার দেড় হাজার টাকা খোয়া গেছে।"

"ও যদি নিয়েই থাকে, টাকাটা রেখেছে কোথায় ?"

"চোর কি নিজের কাছে চোরাই মাল রাখে, পাচার করে দিয়েছে !"

নিতু কান্নাজড়ানো গলায় চিৎকার করে বললে, "মিথ্যে কথা ! টাকা আমি নিইনি। চোর আমি না, চোর আমার মামা !"

"কী বললি ?" হরেনদা ঘুসি পাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে তেড়েমেড়ে উঠতে গেলেন। মোটা বেমক্কা শরীর। কোমরে বাত, আবার ধপাস করে বসে পড়লেন। বসেই বললেন, "একটা একটা করে তোর সব ক'টা দাঁত আমি কাঁচা উপড়ে নোব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "তাই নাকি ?"

নিতু মরিয়া। সে তখন বলতে শুরু করেছে, "আমি নিজে দেখেছি, মামাকে বিছানার তলা থেকে নিয়ে নিতে। আমি ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলুম। মামা ভেবেছিলেন আমি ঘুমোচ্ছি। আমি তখন জেগেই ছিলুম।"

হরেনদা বললেন, "মিথ্যে কথা ! নিজের টাকা কেউ নিজে চুরি করে ?"

কমল ভৌমিক বললেন, "টাকাটা আপনি আপনার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। ওই টাকার ওপর আপনার কোনও অধিকার ছিল না, তাই আপনি চুরির পথ ধরেছিলেন। নিজের পাপ এখন এই নিরীহ ছেলেটার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন ?"

"হঠাৎ এর ওপর আপনার এত দরদ কেন ? মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। এ আমার ভাগনে, না আপনার ভাগনে ?"

"আপনার ঘোড়ার ডিম। আপনি দয়া করে এখান থেকে সরে পড়ুন। ক্রমশই আমার রাগ বাড়ছে।"

"জানোয়ারটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তারপর কী দাওয়াই দিতে হবে আমার জানা আছে !"

"আপনার দাওয়াই আবার আমার হাতে !"

কমল ভৌমিক সুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার সেই শিশিটা আনো তো !"

"কাকু, কোন শিশিটা ?"

"ওই যে গো, যেটার মধ্যে তুমি কাঁকড়া বিছে ধরে রেখেছ। আর রুকু তুমি সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দাও !"

"কেন কাকু ?"

"এটা আমাকে মুচিপাড়া থানার ও·সি· শিখিয়েছিলেন। অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের পুলিশি কায়দা। হরেনবাবুকে চিত

করে ফেলবো, ফেলে ভুঁড়ির ওপর কাঁকড়া বিছেটাকে ফেলে পাঞ্জাবিটা টেনে নামিয়ে দোব। লাগ ভেলকি লাগ।"

কমল ভৌমিক প্রেমদাতা নিতাইয়ের মতো নাচতে যাবেন, নাচা হল না। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির গেটে। চৌবের গলা, "ডাক্তারসাব, গুরুজি, আপ সব কাঁহা গিয়া!"

চৌবে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। পেছন পেছন এল চৌবের কালো অ্যালশেসিয়ান। বিশাল তাগড়া চেহারা। আধ হাত লম্বা জিভ সামনে লকলক করছে। মাথাটা নিচু হয়ে আছে মাটির দিকে। নাক ফোঁসফোঁস করছে। চৌবের চোখ পড়ল হরেনদার ওপর। চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। গোরিলার মতো ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

"আরে হোরেনবাবু যে।"

চৌবে ইচ্ছে করেই গোরিলার মতো সামনের দিকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে এগোতে লাগলেন হরেনদার দিকে। চৌবেকে দেখে হরেনদা কেমন যেন হয়ে গেলেন। ভুঁড়ি চুপসে গেছে। মুখ ঝুলে গেছে। চোখ ছোট হয়ে গেছে।

চৌবে আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হোরেনবাবু নিজেকে খুব চালাক ভাবো! হোরেনবাবু? ভেবেছিলে আর দেখা হবে না! জালি নোটের কারবার কতদিন ধরে চলছে! হোরেনবাবু, রোজ রাতে ভৈরব পাহাড়ের দিকে কেন যাওয়া হয়! কী আছে সেখানে?"

হরেনদা চেয়ার ছেড়ে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করছেন। চৌবে খপ করে বুকের কাছে পাঞ্জাবিটা খামচে ধরলেন, "ভাগছেন কোথায়? চৌবের চোখে ধুলো দিয়ে কেউ পালাতে পারে না!"

ডাক্তার মুখার্জি এতক্ষণ পাশের ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। একগাদা বই পেড়েছেন তাক থেকে। আফ্রিকার অসুখ স্লিপিং সিকনেস সম্পর্কে আরও কিছু জানা দরকার। সুদর্শনকে বাঁচাতে হবে। সরল, আধপাগলা, ভবঘুরে একটা মানুষ। বাইরের ঘরে গোলমাল শুনে বই ফেলে চলে এলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ সব কী হচ্ছে? চৌবেজি এটা ঠিক হচ্ছে না! এ বাড়ির পবিত্রতা আপনি নষ্ট করবেন না!"

"ডাক্তারসাব! এ ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। আমি আপনার ফোনটা ইউস করছি ডাকতারসাব।" চৌবে হরেনকে ছেড়ে ফোন তুললেন। "পুলিশ!"

কমল ভৌমিক হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে-হাসতে বললেন, "জানতুম, জানতুম, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হরেনবাবু নিতাইকে ধরতে এসেছিলেন। যাক কিছুদিন ঘুরে আসুন।"

হরেনদা দেয়াল ঘেঁষে মেঝের ওপর থেবড়ে বসে পড়েছেন।

মুখ-চোখ কেমন হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী, ব্যাপার কী, থানা-পুলিশের কী হল ? কী করেছেন কী হরেনবাবু !"

ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে চৌবে বললেন, "নোট জালের কারবার করেছেন !"

হরেনবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা !"

"মিথ্যে কথা ?" চৌবে এক দাবড়ানি দিলেন। "আপনি আমার কাছ থেকে একটা গোরু কিনেছিলেন। কিনেছিলেন কি না ?"

"হ্যাঁ।"

"বিলিতি জার্সি গোরু !"

"হ্যাঁ।"

"ছ' হাজার টাকা দাম চেয়েছিলুম, আপনি চার হাজারে রফা করেছিলেন ? দু' হাজার, দু' হাজার, দু' কিস্তিতে দেবার কথা !"

"দু' হাজার দিয়েছি !"

"সেই দু' হাজার টাকাই জাল ! কোত্থেকে পেয়েছেন আপনি ওই নোট ?"

হরেনদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "প্রমাণ কী, যে আমি আপনাকে জাল নোট দিয়েছি ? মিথ্যে কথা !"

"ঘণ্টাখানেক পরেই আপনি বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল ? হোরেনবাবু বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যান। পেমেন্ট যখন করেছিলেন, তখন আমি নোটের নম্বর লিখিয়ে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলুম। সেই কাগজটা আছে ! আর পুলিশ আসছে, দোকান আর বাড়িটা সার্চ করাই, তারপর সত্য-মিথ্যার বিচার হোবে হোরেনবাবু !"

হরেনদা যেখানে বসেছেন, তার থেকে হাত দুয়েক দূরে কমল ভৌমিক মেঝের ওপর থেবড়ে বসলেন। চৌবে বসে আছেন টেলিফোন যেখানে, সেইখানে। ডাক্তারবাবু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মানিপ্ল্যান্টের পাতা চকচকে করছেন। রুকু, সুকু, নিতু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

কমল ভৌমিক অনেকক্ষণ ধরে হরেনবাবুর মুখ দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, "আপনি এতটা খারাপ ! নোট জাল করার মতো খারাপ ! মনে তো হয় না ! ছোটখাটো অপরাধ, ছিঁচকে চুরি, করতে পারেন ! স্ত্রীর জমানো টাকা খাটের তলা থেকে সরিয়ে ভাগনের ঘাড়ে চাপাতে পারেন। তা বলে নোট জাল ! না-না চৌবে, এ তুমি কী বলছ ?"

"আমি আর কী বলব গুরুজি ! আমাকে যে-টাকা উনি পেমেন্ট করেছেন, সেই টাকা নকলি টাকা।"

পুলিশ এসে গেল। একজন নয়, একদল। গ্যাটম্যাট করে ঢুকে এল ঘরে। অফিসার বললেন, "চৌবেসাব, কোথায় সেই জালিয়াত ?"

হরেনবাবু পুলিশ দেখে ঠিক ছোট ছেলের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেন।

অফিসার বললেন, "এ কেয়া ? এতনা বড়া আদমি। রোতা ! রোলা দিয়া কিঁউ।"

চৌবে বললেন, "প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদলেই কি পুলিশ ছেড়ে দেবে ?"

হরেনদা ভেউ ভেউ করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, পুলিশবাবু, টাকাটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। আর পেয়েছিলুম বলেই গোরু কিনতে গিয়েছিলুম।"

কমল ভৌমিক বললেন, "ঝেড়ে কাসুন না মশাই। কাসছেন না বলেই তো কাফ মিকশ্চার আসছে তেড়ে।"

ডাক্তার মুখার্জি মানিপ্ল্যান্ট ছেড়ে এগিয়ে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাকে আমি অনেক দিন ধরেই চিনি। আপনার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনি। আপনি বেশি কথা বলেন। বোকা বোকা ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে বেশ ধূর্ত, বিষয়ী। স্বার্থপর। তা বলে আপনি নোট জাল করবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।"

চেয়ার টেনে ডাক্তারবাবু বসলেন। পুলিশ অফিসার ডাক্তারবাবুকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। তিনি আর একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলেন। হাতের রুলটাকে মাঝে-মাঝে নাচাচ্ছেন। অফিসার বললেন, "বলুন, বলুন, সত্য উদ্ঘাটন করুন। সত্য হল সূর্য। সেই সূর্যের আলোতে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাক !"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই কাব্যিক পরিবেশে বেশ কবিতার মতো করে কবুল করে ফেলুন, কোথা থেকে পেলেন হাজার হাজার টাকার নোটের তাড়া ?"

"পেয়েছি গর্ত থেকে।"

পুলিশ অফিসার হা-হা করে হাসলেন, "গর্তে সাপ থাকে, গর্তে ইঁদুর থাকে, গর্তে আজকাল টাকাও থাকে !"

"বিশ্বাস করুন, যে জায়গায় উইলিয়ামসনের ভাঙা বাড়িটা রয়েছে, ওইখানে কারা মাটি আর পাথর কেটে তুলে নিয়ে যাবার ফলে বেশ বড় একটা গর্ত হয়েছে। সেই গর্তে জন্মেছে অনেক আগাছা। তার সেই আগাছার মধ্যে পড়েছিল একটা স্যুটকেস। সেই স্যুটকেসে থাকে থাকে সাজানো ছিল নোট।"

অফিসার বললেন, "এখন মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ওই উইলিয়ামসনের পোড়ো বাড়ির গর্তে আপনি কেন গিয়েছিলেন ?"

কমল ভৌমিক বললেন, "ভাল প্রশ্ন। অবশ্যই জানা দরকার, কেন আপনি গিয়েছিলেন ?"

হরেনদা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন চুপ করে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "উত্তর দিন ! উত্তর দিন !"

হরেনদা মুখটাকে করুণ করে বললেন, "লজ্জা করছে !"

"এতে লজ্জার কী আছে ? লজ্জার কী আছে ?"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনি না পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা কিসের ?"

হরেনদা বললেন, "যেতে যেতে হঠাৎ পেটটা কেমন করে উঠল। তারপরই বুঝতে পারছেন, তারপর···।"

অফিসার বললেন, "অ বড় বাইরে। আই সি, আই সি ! পেলেন পেলেন, টাকাগুলো যদি আসল হত ! যাক তা হলে চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই !"

হরেনদা বললেন, "কোথায় যাব ?"

"কেন, থানায় ! একটু ঘানিটানি ঘুরিয়ে ভুঁড়ি কমিয়ে ফিরে আসবেন।"

চৌবে বললেন, "জায়গাটা একবার দেখে আসা দরকার। হোরেনবাবুর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আশেপাশে কোথাও জালি নোট তৈরি হচ্ছে। সেই আস্তানাটা ভাঙতে হবে।"

হরেনদা বললেন, "এ হল নেপিয়ারের কাজ। নেপিয়ার আমাকে জিপ চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।"

অফিসার বললেন, "তাই নাকি ? তা হলে তো আমাদের ফিল্ডে নামতে হবে। তা হলে চলুন উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোয় যাই। তা হরেনবাবু, টাকাটা যখন পেলেন তখন থানায় জমা দিলেন না কেন ?"

হরেনদা মাথা চুলকে বললেন, "লোভ। আমার বউয়ের লোভ।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

স্পাইডারম্যান
লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা : ফ্লোরো ডেরি
স্বাভাবিক এক কলেজ ছাত্র কি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ও গোপন পরিচয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, নাকি···বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ?
জানো তো ? বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে । ভাবতে ভাল লাগে যে, ওদের সাহায্য করছি ।
আচ্ছা, তোমরা না হয় আমার মতো দেওয়ালে হাঁটতে পারো না, কিন্তু মাদক থেকে তোমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারো ।
হ্যাঁ, মাকড়সামানুষ
ঠিক কথা, জাল বোনার জাদুকর !
কলাকৌশল দেখানোটাও মজার ব্যাপার । তবে সেটা তো ভাল কিছুর জন্যই । যেমন মাকড়সামানুষের পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ···
গাড়ির নীচে ময়লা সাফ করার কাজে সাহায্য করব !
মাকড়সা মানুষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ
তোমার মাকড়সামানুষকে নিয়ে প্রচার দারুণ সাড়া জাগিয়েছে !
শহরকে নিরাপদ রাখতে আসুন মাকড়সামানুষকে সাহায্য করি ।
অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে সে হচ্ছে দারুণ এক মডেল ।
তবে কিছু লোক ব্যাপারটাকে ঠিক ভালচোখে দেখছিল না···
বাচ্চারা, সবাই স্কুলে থাকো !
হিরোরা, স্কুল ছেড়ে যায় না !
মাকড়সামানুষ ! বিচারপতি ওয়াটসনের এটা একটা ফন্দি !
ওয়াটসন ! এই একটা লোকই আমার বিরোধিতা করার স্পর্ধা রাখে । মাকড়সামানুষকে কাজে লাগানোর জন্য সে বাহবা পাচ্ছে !
তবে আমি জানি, মাকড়সামানুষের ব্যাপারটা দিয়েই কীভাবে ওদের ঘায়েল করতে হয় ।
মাকড়সামানুষ, সাবধান !

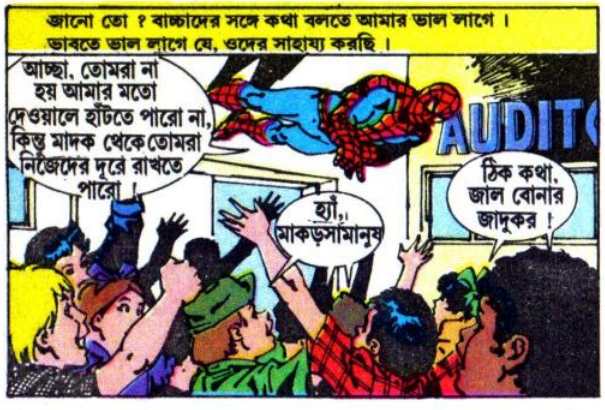

স্পাইডারম্যান

তেজস্ক্রিয় মাকড়সার কামড় খেয়ে পিটার পার্কার অমিত শক্তির অধিকারী। কামড় খেয়েই সে হয়ে উঠেছে···

লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা: জোরে ডেবি

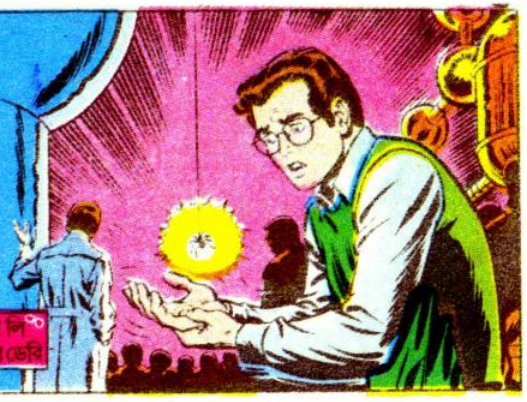

মেরি জেনকে ছেড়ে এসে খুবই খারাপ লাগছিল···

তবে হয়তো আমিই একা অসুখী হই···

কিন্তু নতুন একটা সমস্যার মেঘ জমছিল, আরও বিপজ্জনক সমস্যা···

হাওয়ার্ড ডাল্টন হেজ-এর লোক শহরের সন্দেহজনক প্রতিটি লোকের মধ্যে ঘুরছে···

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গভীর জঙ্গলের পিগমি-সমাজ

'পিগমি' কাদের বলে জানো নিশ্চয় ? ছোট মাপের মানুষ এরা, মাথায় বিশেষ উঁচু হয় না। সব দেশের মানুষদের মধ্যেই কিছু-না-কিছু খাটো-মাপের লোক আমাদের চোখে পড়ে, তবে তাদের 'পিগমি' শ্রেণীর মানুষ ভাবা ঠিক নয়। 'পিগমি' বলতে আসলে সেই জনসমাজের মানুষ বোঝায়, যে-সমাজের সব মানুষই খাটো-মাপের। সেই রকমের জনসমাজ বা গোষ্ঠী আফ্রিকা আর এশিয়ার কোনও-কোনও এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার পিগমি বা বামনরা হল নেগ্রিলো গোষ্ঠীর মানুষ। কঙ্গো অববাহিকার ইতুরি অরণ্য, বুরুণ্ডি, ক্যামেরুন, গাবন আর রোয়াণ্ডায় এদের বসতি। দৈর্ঘ্যে এরা চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি থেকে চার ফুট আট ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পিগমি-সমাজে যে এক-আধজন মানুষ পাঁচ ফুটের কাছাকাছি পৌঁছয়, তাকে তো সবাই রীতিমত ঢ্যাঙাই বলবে। আফ্রিকার পিগমিরা না পোষে জন্তু, না করে চাষবাস, কোনওক্রমে একটা মাথা গুঁজবার আশ্রয় বানিয়ে নিয়ে শিকার ক'রে, কিংবা মাছ ধ'রে, কিংবা গাছের ফলমূল খেয়ে তারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তীর-ধনুকের ব্যবহারে এরা বেশ পটু, অনেকের তীরের ফলায় আবার বিষও মাখানো থাকে। তা ছাড়া বর্শা ছুঁড়েও এরা জন্তু-জানোয়ার মারে।

পিগমিরা থাকে ছোট-ছোট দলে। দলের যে সর্দার, তাকে মান্য করে সবাই। জঙ্গল ছেড়ে পিগমিরা পারতপক্ষে বার হয় না। তবে মাঝে-মাঝে তো লবণ কিংবা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনবার জন্যে বাইরের জগতে আসতেই হয়। মাংস, ফলমূল ইত্যাদির বিনিময়ে তারা সে-সব জিনিস জোগাড় করে।

এশিয়ার পিগমিরা হল নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষ। মালয়, সুমাত্রা, নিউ গিনি, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আর ফিলিপিনসে তাদের দেখা মেলে। তবে, যেমন আফ্রিকার পিগমিরা, তেমনি এশিয়ার পিগমিরাও বড়-একটা বাইরের জগতে আসতে চায় না। গভীর জঙ্গলেই তাদের জীবন কেটে যায়। তোমরা তো 'অরণ্যদেব' পড়ো, সেখানে যে পিগমিদের কথা আছে, তারা কিন্তু এশিয়ার অধিবাসী নয়, আফ্রিকার অরণ্যবাসী খাটো-মাপের মানুষ

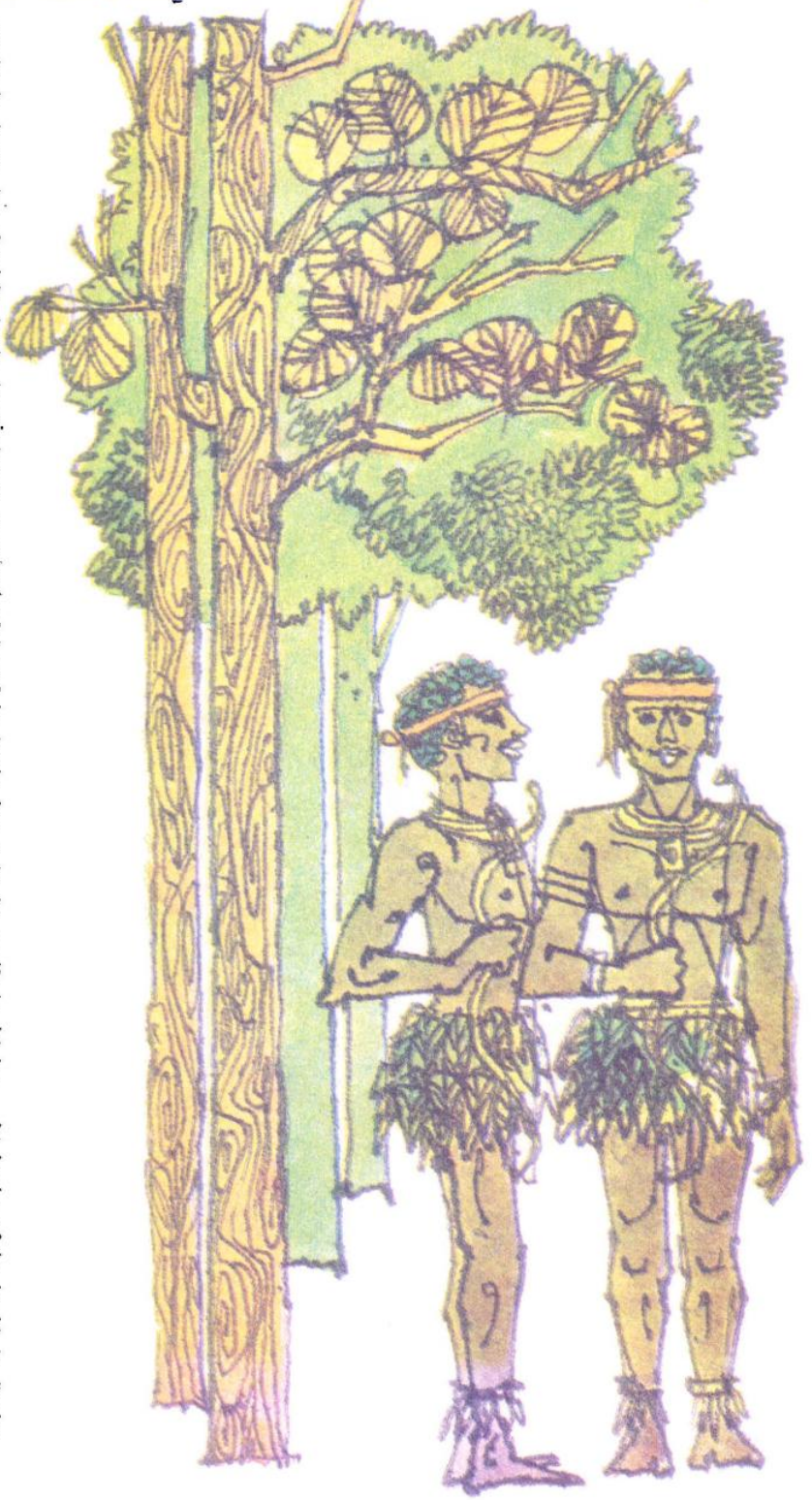

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মাঠের রাজা

দুলেন্দ্র ভৌমিক

শ্যামল প্যান্ট পরতে পরতে বলল, "আজই তো আসল খেলা। ঠাকুর-ঠাকুর করে যদি একটা পয়েন্ট কাড়তে পারি, তা হলে গোটা টিমকে আমি বিরিয়ানি খাওয়াব। বাবা বলেছে, যা টাকা লাগে দেব।"

অতনু চেয়ার থেকে উঠে নিজের বুটে ফিতে পরাতে পরাতে বলল, "অংশুদাকে একজোড়া বুট ম্যানেজ করে দিতে বলেছিলাম। দেব-দেব করে দিলই না। এই বুট আর চলছে না। তোর বিরিয়ানির দামে একজোড়া বুট হবে?"

যুব সম্মিলনীর গোলকিপার বিশু টেন্টের পেছন দিয়ে ভেতরে

ঢুকে বলল, "ওদের টেন্টে ফার্নান্ডেজ আর জগজিৎ এল গাড়ি করে। প্রত্যেকের জন্যে নতুন তোয়ালে।"

অতনু বুটের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে বিশুর দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিতে-নিতে বলল, "মহমেডানের দিন যেমন খেপে উঠেছিলি, আজ সেই রকম খেলতে হবে। আমি নেমে-উঠে খেলব, উজ্জ্বলও তাই করবে। শুধু সজলের নামবার দরকার নেই। সজলের পা থেকে গোল চাই। মরে যাই সেও ভাল, কিন্তু ব্লু স্টারকে সহজে পয়েন্ট নিতে দেব না। আঠার মতন লেগে থাকবে সবাই। যাতে গোলে ভাল শট নেবার স্পেস না পায়। শ্যামল আর পিন্টু, বক্সের মধ্যে একদম ফাঁক থাকতে দিবি না। বিপদ দেখলে দু'জনে মিলে একজনকে আটকাবি।"

উজ্জ্বল তৈরি হয়ে টেন্টের বাইরে এল। গ্যালারিতে লোক বসতে শুরু করে দিয়েছে। অধিকাংশই ব্লু স্টারের সমর্থক। উজ্জ্বল আস্তে আস্তে শরীর ঘামাতে আরম্ভ করল। তার রক্তের মধ্যে এখনও বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। মা বলেছেন, আজ দর্শকদের মধ্যে আরও একজন থাকবেন—তিনি তোদের বাবা। আসবার সময় কপালে ফুল ছুঁইয়ে মা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "মনে রাখিস, ফুটবল তোদের কাছে মা। আজকের খেলাই হবে তোদের বাবার স্মৃতির প্রতি তোদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা।"

নিজের টেন্টের বেড়ার পাশ থেকে ব্লু স্টারের টেন্টের লনটা অনেকখানি দেখা যায়। যুব সম্মিলনীর সব খেলোয়াড়ই ভিড় করে ওপাশের লনে ব্লু স্টারের খেলোয়াড়দের দেখছে। জগজিৎ আর ফার্নান্ডেজের দিকেই সবার নজর। উজ্জ্বল একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওঁদের দেখল। তার মধ্যে একটা কঠিন জেদ জন্ম নিচ্ছে। সুশীলদা বলেন, খেলার আগে একটা জেদ চাই। ডগ্‌ড ডিটারমিনেশন, তার ভেতরে সেই ডগ্‌ড ডিটারমিনেশন স্পষ্ট হচ্ছে। বুকের মধ্যে এখন দুটো ছবি। ষাট দশকের একজন হাফ, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে বসেছেন গ্যালারির এক কোণে। তাঁর চোখ বাইশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে শুধু দু'জনকে দেখছে। আর সেই গ্যালারিতে সাদা থান পরে বসে আছেন আরও একজন। তাদের মা।

টেন্টের ভেতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে অংশু হালদার বেরিয়ে এসে ইশারায় অতনুকে ডাকলেন। উজ্জ্বল দূর থেকে লক্ষ করল কোনও একটা বিষয়ে অংশুদার সঙ্গে অতনুর তর্ক হচ্ছে। অংশুদা ওকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু অতনু মানতে চাইছে না। উজ্জ্বল কৌতূহলী হল। জগিং থামিয়ে দিয়ে সে এক-পা দু-পা করে এগোতে লাগল। অতনু অংশুদার কাছ থেকে ছিটকে সরে এসে হাতের ইশারায় উজ্জ্বল, শ্যামল আর বিশুকে ডাকল। অতনুর পেছন-পেছন অংশুদাও এগিয়ে এসেছেন। তাঁর মুখটা ম্লান দেখাচ্ছে।

ওরা কাছে যেতেই অতনু চড়া গলায় অংশুদাকে বলল, "আমি তো একা খেলব না, এরাও খেলবে। এদের বলুন।"

শ্যামল বলল, "কী ব্যাপার?"

অংশুদার মুখটা অসহায়। উজ্জ্বল লক্ষ করল, অংশু হালদারের থুতনিতে এখনও সেই কাটা দাগটা থেকে গেছে। বাঁ দিকের ভুর ওপরেও একটা স্পষ্ট ক্ষত-চিহ্ন। উজ্জ্বল জানে, বাঙ্গালোরে সন্তোষ ট্রফির খেলাতে লড়াই করতে গিয়ে এই আঘাতগুলো একদিন তিনি হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। সেই অংশু যুব সম্মিলনীর ছেলেদের সামনে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে ঘামতে-ঘামতে বললেন, "আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি এসব চাই না। কিন্তু আমার দলের কর্তারা চাইছেন।"

শ্যামল কঠোর গলায় প্রশ্ন করল, "কর্তারা কী চাইছেন?"

অংশু হালদার থুতনির কাটা দাগে হাত বুলিয়ে বললেন, "কর্তারা চাইছেন ব্লু স্টারকে দুটো পয়েন্ট দিতে।"

উজ্জ্বল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে বলল, "এতে দেওয়ার প্রশ্ন কেন আসছে অংশুদা? খেলায় জিতলে দুটো পয়েন্ট তো পাবেই।"

অংশু হালদার সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "ব্লু স্টার আর যুব সম্মিলনীর মধ্যে সম্পর্কটা তো তোমরা জানো। দুটোই অবনী দত্তর টিম। এই খেলা থেকে পুরো পয়েন্ট পেয়ে গেলে বাকি তিনটে খেলা অবনী দত্ত গটআপ করবে। সে-ব্যবস্থাও বোধহয় হয়ে গেছে। তা হলে এ-বছর লিগটা ব্লু স্টারের ঘরে যাবে। তাই আমাদের মাঠে নেমে গোল দেবার দরকার নেই। গেমটা ছেড়ে দিতে হবে।"

শ্যামল হঠাৎ গা থেকে জার্সি খুলে ফেলে বলল, "তা হলে মাঠে টিম নামাবার দরকার নেই। ওয়াক-ওভার দিয়ে দিন। ব্লু স্টারের কোনও রিস্ক থাকবে না।"

অংশু হালদার বিপন্ন মুখে ওদের দিকে তাকালেন। উজ্জ্বল একটু এগিয়ে এসে বলল, "ব্লু স্টার কি ভাবছে ওরা আমাদের সঙ্গে জিততে পারবে না? ওরা তো জিতেও যেতে পারে, আর সেটাই তো স্বাভাবিক।"

অংশু হালদার ওদের সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "খেলা তো দেখছি। বাটা আর খিদিরপুরের কাছে হারতে হারতে ড্র করেছে। মহমেডান আর ইস্টবেঙ্গলের দিন তোমরা যেমন খেলেছ তেমন খেললে ব্লু স্টার হেরেও যেতে পারে। অবনী দত্ত জানে, এই খেলাটাতে তোমরা জান লড়িয়ে খেলবে। যদি একটা পয়েন্টও চলে যায়, তা হলেই ব্লু স্টার লিগের দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়বে। টেন্টে আগুন জ্বলবে। আজকের পরেই অবনী দত্ত সবাইকে নতুন বুট কিনে দেবে। তোমরা এবার ভেবে দ্যাখো।"

অতনু গম্ভীর হয়ে ছিল। তার মুখ চাপা রাগে থমথম করছে। শ্যামল বুটের ফিতে খুলতে আরম্ভ করেছে। বিশুও শ্যামলের দেখাদেখি গায়ের জার্সি খুলে ফেলল। যুব সম্মিলনীর আরও দু' তিনজন খেলোয়াড় এখন অংশু হালদারের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে।

উজ্জ্বল অতনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হবে এখন?"

অতনু কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, "তোরা ভেবে দ্যাখ তোরা কী করবি?"

উজ্জ্বল একটু ভাবল। অংশু হালদারের হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বলল, "অংশুদা, আপনি আমাদের কোচ, আমাদের গুরু। আপনার সেসব দিনের খেলা আমরা দেখিনি। কিন্তু শুনেছি, জীবন বাজি রেখে আপনি খেলতেন। বাঙ্গালোরের সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনাল আর মহীশূরের সঙ্গে আপনার ফাইনাল খেলার গল্প আমাদের এখনও প্রেরণা দেয়। আমাদের ভেতরেও একটা স্বপ্ন আছে। আপনিই সেসব স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। আপনি ফুটবলের দিব্যি দিয়ে আর আপনার কপালের ওই কাটা দাগটার উপর হাত রেখে যা আদেশ করবেন, আমরা তাই করব। অংশুদা, মনে রাখবেন, আপনি আমাদের আদর্শ।"

আবেগে উজ্জ্বলের গলা ভিজে এল। অংশু হালদার বিপন্ন মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বাঁ হাতে কপালের কাটা দাগটায় হাত রাখলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে ঝলসে উঠল বাঙ্গালোরের কান্তিরঙা স্টেডিয়াম। দর্শকদের দীর্ঘ করতালি ধ্বনি। পাখির মতো শূন্যে সেকেন্ড বারের দিকে উড়ে যাচ্ছেন তিনি।

অংশু হালদার হাত নামালেন। উজ্জ্বলের কাঁধে হাত রেখে ওকে বুকের কাছে টানতে-টানতে বললেন, "বড্ড ছোটলোক হয়ে যাচ্ছি। এভাবে ফুটবল বাঁচবে না। অথচ, আমি অসহায়। ভাগ্যে যা আছে হবে। তোমরা মাঠে নামো। জান লড়িয়ে দাও।"

অংশু হালদার শ্যামলের কাছে এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, "জার্সি পরে নে। রাগ করিস না। তোদের উত্তেজনাটা বুঝি। তবুও কর্তাদের হুকুম শুনে এসব বলতে হয়। তোরা ক্ষমা করে দিস।"

অংশুদার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। শ্যামল নিচু হয়ে অংশুদার পা জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনি আমাদের কাছে অনেক বড় ফুটবলার। আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। আজকে মাঠে আপনার মান রেখে আমরা নিজেদের নিঙড়ে দেব।"

শ্যামলের দেখাদেখি সবাই যখন অংশুদার পায়ে হাত ছোঁয়াল, তখন অংশুদার চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

।। নয় ।।

খেলা শুরু হবার দু' মিনিটের মধ্যেই ফার্নান্ডেজের বাড়ানো থ্রু ধরে নিয়ে জগজিৎ সিং ঝড়ের মতো ধেয়ে এল যুব সম্মিলনীর সীমানায়। টাচলাইনের ধার ঘেঁষে জগজিৎ দৌড়চ্ছে। কর্নার কিকের জায়গায় গিয়ে সে বল নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই দেখল, তার সামনে পিন্টু। জগজিৎ উঁচু করে বল ফেলল বক্সের মাথায়। তার লক্ষ্য দীপক শেঠ। কিন্তু দীপকের সামনে জোঁকের মতো লেগে আছে শ্যামল। এক হাত পেছনেই উজ্জ্বল। বলটা উড়ে এসে গোলের সামনে পড়ছিল। কিন্তু গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। ব্লু স্টারের গৌতম উজ্জ্বলের কোনাকুনি দঁড়িয়ে। বক্সের মধ্যে বিপদ ঘনিয়ে উঠছে টের পেয়েই অতনু বলের নাগাল পেতে লাফিয়ে উঠল। একই সঙ্গে লাফিয়েছে দীপক শেঠ। উজ্জ্বল চকিতে সরে গেল গৌতমের দিকে। দীপক শেঠ আলতো করে বল নামিয়ে দিয়েছে গৌতমের পায়ে। গৌতম সেই বলে পা ঠেকাবার আগেই আচমকা লাফিয়ে উঠে উজ্জ্বল সেই বল ধরে নিয়ে সাইড লাইনের বাইরে পাঠিয়ে দিল। এই মুহূর্তে বল ধরে ঘোরাবার বা কাউকে দেবার সময় ছিল না। বিপদ কেটে যেতেই যুব সম্মিলনী টের পেল জগজিৎকে বল নিয়ে এতটা এগোতে দেওয়া বোকামি হয়েছে। প্রথম থেকেই ট্যাকল করতে পারলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হত না।

অতনু দৌড়ে গিয়ে উজ্জ্বলকে বলে দিল, "কানাই ফেল করছে। তুই ওর দিকটা ম্যানেজ কর। জগজিৎকে আটকাতে না পারলে বিপদ হবে।"

এরপর খেলাটা মাঝমাঠে আটকে রইল খানিকক্ষণ। ব্লু স্টারের ছেলেরা সেন্টার-লাইনের এপারে বল নিয়ে উঠে এল না। যুব সম্মিলনীর ছেলেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। বারো মিনিটের মাথায় নিতাই বল ঠেলল উজ্জ্বলকে। উজ্জ্বল সেই বল ধরে সামনে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকপাস করল শ্যামলকে। উজ্জ্বল বল ঠেলে দিয়েই সেন্টার লাইনের কাছে সরে গেছে। ব্লু স্টারের সুভাষ সমাজদার শ্যামলের কাছে ছুটে আসবার আগেই সে বল বাড়াল উজ্জ্বলের উদ্দেশে। উজ্জ্বলের পাঁচ হাত সামনে ফার্নান্ডেজ। উজ্জ্বল বল নিয়ে আরও ডান দিকে, সাইড-লাইনের দিকে ছুটে গেল। তার সামনে এখন অনেকটা ফাঁকা জমি। ফার্নান্ডেজ সাইড-লাইনের দিকে ছুটে আসছে লম্বা লম্বা পায়ে। উজ্জ্বলের বুকের ভেতর থেকে মা কথা বলে উঠলেন, "আজ দর্শকদের মধ্যে আরও একজন থাকবেন— তিনি তোদের বাবা।" উজ্জ্বল মরিয়া হয়ে গতি বাড়াল। ছুটে-আসা ফার্নান্ডেজ পা বাড়িয়েছিল বলের নাগাল পাবার জন্য। উজ্জ্বল বল নিয়ে তাকে টপকে যেতেই গ্যালারি থেকে কে একজন শিঙা বাজিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, "উজ্জ্বল, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।"

ব্লু স্টারের আগুয়ান স্টপার সমর দত্তর মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে বল পাঠাল বক্সের দিকে। বক্সের মধ্যে যুব'র চারজন খেলোয়াড়। শ্যামল বুকে করে বল ধরেই তার বাঁ পাশে দাঁড়ানো অতনুকে ঠেলে দিল। যুব সম্মিলনীর গ্যালারি থেকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে জনা-পাঁচেক লোক। অতনু ক্ষণমাত্র দেরি না করে ব্লু স্টারের রাইট স্টপার হামিদের বাঁ দিক দিয়ে নিখুঁত নিশানায় বল বাড়াল সজলকে। সজল তৈরি ছিল। অতনুর পাঠানো বল তার পায়ের নাগালে আসতেই বল ধরে চরকির মতো ঘুরে গিয়ে ডান পায়ে মাটিঘেঁষা শট নিল। ভারতের সেরা গোলকিপার সুনীল ভাবতেই পারেনি পুঁচকে ছেলেটা মুহূর্তে ঘুরে গিয়ে ফার্স্ট বারের পরিবর্তে সেকেন্ড বারে শট নেবে। গোলকিপার ঝাঁপাল। কিন্তু বল সেকেণ্ড বারে ধাক্কা খেয়ে ততক্ষণে টাচ-লাইনের বাইরে চলে গেছে। ব্লু স্টারের সমর্থকরা গ্যালারিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বল বাইরে যেতেই তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার গ্যালারিতে বসে পড়ল।

সজল নিজের কপালে ঘুসি মারতে মারতে যখন ফিরে আসছিল তখন সবুজ গ্যালারি থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, "সজল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। বি স্টেডি।"

সজল গ্যালারির দিকে তাকাল। গলাটা তার চেনাচেনা মনে হচ্ছে। ঠিক এর পরেই ব্লু স্টার আক্রমণে উঠে এসেছিল। অনেকটা দূর থেকে দীপক শেঠ আচমকা শট করেছিল গোলে। বিশু সময়মতো লাফিয়ে উঠে সেই বল ধরে ফেলে। ব্লু স্টারের সমর্থকরা প্রায় গোল বলে চিৎকার করে উঠেতে যাচ্ছিল। কিন্তু শব্দটা ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেল। আবার খানিকক্ষণের জন্য খেলাটাকে মাঝমাঠ আর নিজেদের সীমানায় আটকে রাখল ব্লু স্টার। যুব'র ছেলেরা সেন্টার লাইনে উঠে এসেছে। সজল ওদের হাফ-লাইনের কাছে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আঠারো মিনিটের মাথায় সুনীল দে'র ছুঁড়ে দেওয়া বল ফার্নান্ডেজ ধরবার আগেই পাখির মতো ছুটে এসে সজল ধরে নিল। বল নিয়ে সজল ছুটে যাচ্ছিল বিপক্ষ দলের সীমানায়। যুব'র জনা-ছয়েক খেলোয়াড় তখন ব্লু স্টারের সীমানার চারদিকে ছড়ানো। সজল চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় ব্লু স্টারের সুভাষ সমাজদারকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকবার মুখেই সুভাষ পেছন থেকে পা বাড়িয়ে সজলকে উলটে ফেলল। সজল মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েই শুনল গোটা গ্যালারি জুড়ে চিৎকার হচ্ছে। ব্লু স্টারের সাদা গ্যালারি থেকেই কেউ একজন চিৎকার করে বলল, "তোর ছেলের বয়সী রে, তাকে লেঙ্গি মারলি?"

ফাউল কিক নিল শ্যামল। সোনা গোলে না পাঠিয়ে বল তুলে দিয়েছিল উজ্জ্বলকে। উজ্জ্বল সেই বল ভলি করে গোলে পাঠাল। ফার্স্ট বারের কোণ দিয়ে বল গোলে যাচ্ছিল। সুনীল দে লাফিয়ে উঠে অনায়াসে সেই বল ধরে ফেলল।

হাফ-টাইমে গ্যালারি থেকে সুশীলদা নেমে এসে বললেন, "সুনীলকে উঁচুতে বল পাঠিয়ে গোল করা মুশকিল। বলের ফ্লাইট ভাল বুঝতে পারে। ওকে গড়ানো শটে গোল করতে হবে। নীচের বলে ও একটু উইক আছে। তোরা ফার্নান্ডেজকে খেলতে দিচ্ছিস কেন? দু'জনকে পুলিশম্যান করে দে ওর পেছনে। ফার্নান্ডেজকে রুখতে পারলেই ব্লু স্টার বল নিয়ে তোদের বক্সে আসতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রাখবি, ফার্নান্ডেজ বল পেলে কখনও দীপককে দেবে না। ওদের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। ও বল বাড়াবে জগজিৎকে। জগজিৎ ভাল প্লেয়ার, কিন্তু ডান পায়ে শট নেই। ওকে বাঁ পায়ে শট নিতে দিলেই বিপদ হতে পারে। ব্লু স্টার যখন উঠে আসছে তখন বারবার দেখছি গৌতমকে তোরা বিনা পাহারায় রাখছিস। ছেলেটা কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ গোল দিয়ে ফেলে।"

সুশীলদার কথাগুলো উজ্জ্বল আর সজলের সঙ্গে-সঙ্গে শ্যামল,

অতনু আর নিতাইও শুনছিল। অংশুদাকে ধারেকাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হাফ-টাইমের পর যখন ওরা মাঠে নামতে যাচ্ছে তখন পাইপ মুখে অবনী দত্ত এলেন। ছেলেদের দিকে কড়া চোখে দেখে নিয়ে বললেন, "তোমাদের কোচ কোথায় ? কোচ ?"

অতনু উত্তর দিল, "এদিকেই কোথাও আছেন। দেখতে পাচ্ছি না।"

অবনী দত্ত ধমকের সুরে বললেন, "অংশু তোমাদের কিছু বলেনি ? তোমাদের ক্যাপ্টেন কে ?"

অতনু মৃদু গলায় জবাব দিল, "আজ্ঞে আমি।"

অবনী দত্ত অতনুকে দেখে নিয়ে বললেন, "ও, হ্যাঁ, তুমিই তো অতনু। অংশু মাঠে নামবার আগে তোমাদের কিছু বলেনি ?"

অতনু বলল, "বলেছেন।"

অবনী দত্ত অতনুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "অংশু যেটা বলেছে, এবার সেটা করতে হবে। তোমাদের খেলা খুব ভাল হচ্ছে। খুব এনজয় করছি। তবে খেলাটাই তো সব নয়। টিমকে বাঁচানোর প্রশ্নও আছে। ব্লু স্টার এক অর্থে তোমাদের দাদার মতো। আগামী দিনে তোমরাই তো ব্লু স্টারের প্লেয়ার। ব্লু স্টার চ্যাম্পিয়ান হলে তোমাদেরই গৌরব। যাও, মাঠে নেমে পড়ো। অংশু যেমন বলেছে তেমন খেলবে।"

অবনী দত্ত চলে গেলেন। অতনু আগুন-চোখে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকাল। নিজের দলের খেলোয়াড়দের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতনু বলল, "আমরা আমাদের কোচের নির্দেশ মেনে চলব। কোচ তো বলেছেন, জান লড়িয়ে দাও।"

সবাই মনে-মনে শপথ উচ্চারণের মতো বলে উঠল, "জান লড়িয়ে দাও।"

হাফ-টাইমের পর নিজেদের নিংড়ে দেবার প্রতিজ্ঞায় যুব সম্মিলনীর ছেলেরা এককাট্টা হয়ে উঠল। খেলা শুরু হবার আগে উজ্জ্বল গ্যালারির দিকে তাকিয়ে দেখল, মা হাত নাড়ছেন। উজ্জ্বলের বুক ভরে উঠল। তার মনে হল, এ-জীবনে এখন পর্যন্ত মা'কে সে কখনও সুখী করতে পারেনি। তার দুঃখী মা শুধুমাত্র একটি আশায় বুক বেঁধে এখনও মুখে রক্ত তুলে তাদের দু' ভাইয়ের মুখের খাবার আর সাধ্যমতো স্বাচ্ছন্দ্য জুটিয়ে যাচ্ছেন। আজ সেই দিন, যেদিন নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও মা'কে সে যথার্থ সুখী এবং গর্বিত করে তুলতে পারে। মা'র বন্ধু মনীষামাসির বড় ছেলে যেবার হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হল, কাগজে ছবি বার হল, সেদিন সেই মনীষামাসির মুখে যে সুখ আর গর্বের রামধনু-রঙ ফুটে উঠতে দেখেছিল, সে রকম সুখের ছবি তার দুঃখী মায়ের মুখে দেখতে উজ্জ্বলের বড় সাধ ছিল। আজ মাঠের মধ্যে থেকে সেই সুখ আর গর্ব মায়ের কাছে অঞ্জলির মতো নিবেদন করতে পারে উজ্জ্বল।

খেলা শুরু হতেই যুব সম্মিলনী প্রথম ফাউল কিক পেয়ে গেল মাঝমাঠ থেকে। শ্যামল গড়ানো শটে অতনুকে বল দিতে চেয়েছিল কিন্তু বল ব্লু স্টারের খেলোয়াড়ের পায়ে জমা হয়ে গেল। ব্লু স্টার বল পেলেই খেলাটাকে স্লো করে দিচ্ছে। নিজেদের সীমানার মধ্যেই খেলাটাকে গুটিয়ে রাখছে। নিজেদের মধ্যে ছোট-ছোট পাসে বল দেওয়া-নেওয়া করছে। উজ্জ্বলের মনে হল, সুশীলদার কথাই হয়তো ঠিক। নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করতে করতে যুব সম্মিলনীর ছেলেদের নিজেদের সীমানার বাইরে টেনে আনবে লোভ দেখিয়ে। ডিফেন্সের আঁটোসাটো বাঁধন আলগা হতেই আচমকা বল নিয়ে হানা দেবে যুব সম্মিলনীর গোলে। নয়তো ওরা বোধহয় জেনে গেছে খেলাটা গটআপ করা আছে সুতরাং অনর্থক পরিশ্রম করে লাভ নেই।

উজ্জ্বল পিছিয়ে এসে অতনু আর নিতাইকে উঠে যেতে বলল।

খেলাটা ওদের সীমানা থেকে বার করে আনা দরকার। দ্বিতীয়ার্ধের চোদ্দ মিনিটে গৌতম আর অতনুর মধ্যে বল কাড়াকাড়ির লড়াইতে শেষ পর্যন্ত অতনু বল পেয়ে গেল। অতনু বল নিয়ে উঠে যাচ্ছিল। উজ্জ্বল আর প্রভাস ততক্ষণে ফার্নান্ডেজকে প্রায় বন্দী করে রেখেছে। অতনু বুদ্ধি করে বল ঠেলে দিল ফার্নান্ডেজের পেছনে দাঁড়ানো প্রভাসকে। ফার্নান্ডেজ ঘুরে দাঁড়াতেই বল পৌঁছে গেল উজ্জ্বলের পায়ে। শ্যামল ততক্ষণে ছুটে এসে প্রভাসের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ফার্নান্ডেজ পাহারায়। জগজিৎ অনেকটা নেমে এসে উজ্জ্বলকে ট্যাকল করার চেষ্টা করল। উজ্জ্বল জগজিৎকে কাটিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সত্তর কেজি ওজনের জগজিৎ পেছন থেকে উজ্জ্বলকে এমনভাবে ব্যাক-পুশ করল, যাতে পঞ্চাশ কেজির উজ্জ্বলের পক্ষে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া ছাড়া গতি রইল না। ব্যাপারটা এমন দৃষ্টিকটু হল যে, সাদা গ্যালারি থেকেও দর্শকরা চিৎকার করে গালমন্দ দিতে লাগল জগজিৎকে। যুব সম্মিলনীর গ্যালারিতে সামান্য কয়েকজন লোক। সেখান থেকেও বিদ্রূপ-মেশানো চিৎকার উঠল। গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ফাউল কিক নিল। সেই কিক থেকে গোলটা এল অভাবিতভাবে। উজ্জ্বলের লম্বা শট ব্লু স্টারের বলাই পালের পাশ দিয়ে নিতাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। বলাই পা বাড়িয়ে বলটা ক্লিয়ার করতে গিয়ে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। বল ওর পা ছুঁয়ে নিশানা বদলে অতনুর কাছে যেতেই হামিদের বাঁ পাশে বলটা ফেলল। হামিদ আর সজলের মাঝখানে বল পড়ছে। দু'জনেই বলের থেকে সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে। ব্লু স্টারের গোলের মুখে অমন অনেক খেলোয়াড়ের ভিড়। সজল ছুটে আসা হামিদের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। সজল ছুটে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা লম্বা লাফ দিয়ে বলের সামনে পড়েই সজোরে শট নিল। বল মাটি কামড়ে ডান দিকের পোস্টের গা ঘেঁষে যখন গোলে ঢুকে যাচ্ছে, ব্লু স্টারের গোলকিপার তখন জটলার মধ্যে থেকে বলের উদ্দেশে লম্বা ডাইভ দিয়েছিল। বল ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। ব্লু স্টারের এবং যুব'র অনেকেই তখন বুঝতে পারেনি গোল হয়েছে কি না। লাইন্সম্যান পতাকা নেড়ে সঙ্কেত করতেই রেফারি গোলের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। যুব'র সমস্ত খেলোয়াড় আনন্দে আর উত্তেজনায় ছুটে আসছে সজলের দিকে। বিশু গোল ছেড়ে অনেকটা ছুটে এসে সজলকে জাপটে ধরল। যুব'র গ্যালারি থেকে একটা ভেঁপু বাজছে। চকোলেট বোমা ফাটানোর শব্দও শোনা গেল। উজ্জ্বল ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, "গ্যালারিতে মা'কে দ্যাখ।"

মা দাঁড়িয়ে উঠে হাত নাড়ছেন। দুরন্ত হাওয়ায় তাঁর সাদা আঁচল উড়ছে শরতের কাশবনের মতো অমল শুভ্রতা নিয়ে। সুশীলদা দু' হাত তুলে গ্যালারির ওপর নাচছেন।

চোদ্দ মিনিটে গোল খাওয়ার পর ব্লু স্টার যখন সেন্টার করবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে, তখন সাদা গ্যালারি থেকে ইটের টুকরো এসে পড়ল ব্লু স্টারের সীমানায়। খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে দীপক শেঠ গৌতমকে বল দিয়েছিল। গৌতমের পা থেকে অতনু বল কেড়ে নিয়ে সজলের উদ্দেশে লম্বা পাস দিয়েছিল। কিন্তু নিশানা ঠিক না থাকায় বল মাঠের বাইরে চলে গেল। থ্রো করবার জন্য হামিদ যখন সাইডলাইনে দাঁড়িয়েছে, তখন গ্যালারির ওপর থেকে তার মাথায় একপাটি হাওয়াই চপ্পল পড়ল। হামিদ মাথা গরম করে ফেলল। ফলে সে ফাউল থ্রো করতেই সাদা গ্যালারি থেকে সমস্বরে 'হো-হো' চিৎকার উঠল। বাকি একুশ মিনিট চলল গোল শোধ দেওয়া আর গোল না খাওয়ার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সাদা গ্যালারি থেকে যত বিদ্রূপ আর গালাগালি হতে লাগল, ব্লু স্টারের ছেলেরা ততই মেজাজ হারিয়ে এলোমেলো খেলতে শুরু করে দিল। প্রভাসের পাহারা এড়িয়ে ফার্নান্ডেজ বল ধরে একবার এগোতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু উজ্জ্বল ছোঁ মেরে তার পা থেকে বল কেড়ে নিতেই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ফার্নান্ডেজ উজ্জ্বলের বুকে ঘুসি চালাল। দু' হাতে বুক চেপে আহত বিস্ময়ে উজ্জ্বল ফার্নান্ডেজের দিকে তাকাল। মনে-মনে বলল, 'কাগজে তোমার রঙিন ছবি দেখে তোমার মতো লিঙ্কম্যান হবার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এই কি সেই তুমি! তোমার এই ঘুসি আমার বুকে লাগেনি, কিন্তু বুকের মধ্যে থেকে তোমার ছবিটাকে মুছে দিয়েছে।'

খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে প্রথম কর্নার পেল যুব সম্মিলনী। অতনু কর্নার কিক করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী ভেবে নিজে না গিয়ে উজ্জ্বলকে পাঠাল। উজ্জ্বল উঁচু করে বক্সের মাথায় বল না ফেলে মাঠের প্রায় তিন ফুট উঁচু দিয়ে বল দিল প্রথম বারে দাঁড়ানো নিতাইকে। নিতাই আর হামিদ পাশপাশি দাঁড়ানো। নিতাই এবং হামিদ দু'জনেই শূন্য পা তুলল। বলটা হামিদের বুটের তলায় লেগে ফিরে যেতেই উজ্জ্বল ছুটে এসে সেই ফিরতি বলে আচমকা শট করল। ব্লু স্টারের সুনীল সেকেণ্ড বার থেকে ছুটে এসে শূন্যে লাফাল। বল তার বাঁ হাতের আঙুল ছুঁয়ে তীব্র গতিতে গোলে ঢুকে যেতেই দুম-দাম পটকা ফাটতে লাগল যুব সম্মিলনীর গ্যালারিতে। উজ্জ্বলকে জড়িয়ে ধরে অতনু যখন চুমু খাচ্ছিল, উজ্জ্বল তার সতীর্থদের মাথা ডিঙিয়ে চারপাশের গ্যালারির দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবল, আজ আরও একজন খেলা দেখছেন। তিনি কোথায়? আজ একটিবার, এক লহমার জন্য ষাট দশকের সেই হতভাগ্য হাফটিতে যদি দেখতে পেতাম।

বাকি তিন মিনিটের খেলাটা সুখের হল না। যুব সম্মিলনীর গোলের ওপর ইট পড়তে লাগল। সম্পূর্ণ অকারণে দীপক শেঠ বল ছেড়ে দিয়ে পা চালাল উজ্জ্বলের উদ্দেশে। সজলের জার্সি টেনে কনুয়ের ধাক্কায় তাকে উলটে ফেলল হামিদ। সজল উঠে দাঁড়াল মুখে হাত চাপা দিয়ে; তার নাক ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। অতনু আর গৌতমের মধ্যে এক দফা হাতাহাতি হয়ে গেল। পতাকা নেমে যাওয়ার পরই ব্লু স্টারের গ্যালারি থেকে লোক নেমে যেতে শুরু করেছিল। খেলা যখন শেষ হল তখন সাদা গ্যালারির দর্শকরা দল বেঁধে নামতে নামতে ব্লু স্টারের খেলোয়াড়দের উদ্দেশে নানারকম আওয়াজ দিতে লাগল।

সুশীলদা গ্যালারি থেকে নেমে বরফ নিয়ে ছুটে এসেছিলেন সজলের জন্য। ওরা জিতে গিয়ে টেন্টে এসে দেখল টেন্ট ফাঁকা। অংশুদাকে এখনও ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না। যুব সম্মিলনীর কর্মকর্তাদের শীতল উপেক্ষা ওদের বুকে শেলের মতো বিঁধল। মনে হল, ওরা যেন বিশ্রীভাবে হেরে টেন্টে ফিরে এসেছে। ওদের মালি বংশীকেই শুধু বেজায় খুশি দেখাচ্ছিল। সে বালতি করে জল আর তোয়ালে নিয়ে এসে সজলের ঠোঁটের ওপর থেকে রক্তের দাগ মুছে দিচ্ছিল। টেন্টের এই ঝিমধরা ভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল উৎপলের আসার সঙ্গে-সঙ্গে। হৈমকে নিয়ে সে টেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে গা থেকে জামা খুলে সেই জামাতে আগুন ধরিয়ে মশালের মতো মাথার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে লাগল। উজ্জ্বল উঠে এসে মা'কে বলল, "মা, কেমন লাগল তোমার?"

হৈম ছেলের মাথায় হাত রেখে অস্ফুটে বললেন, "আজ আমি জিতেছি।"

টেন্টের বাইরে এসে অতনু বলল, "তোরা তো শিয়ালদা যাবি?"

উজ্জ্বল জবাব দেবার আগেই উৎপল বলে উঠল, "আমরা বাবুঘাট থেকে চলে যাব।"

অতনু শালকিয়াতে থাকে। উজ্জ্বলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, "আমি! আমি লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে হেঁটে মেরে দেব। পকেটে আট

আনা পয়সা, মিনি হবে না।"

হৈম নিজের ব্যাগ থেকে দুটো টাকা বার করে অতনুকে দিয়ে বললেন, "তুমি মিনিতেই চলে যাও। আমি তো তোমারও মায়ের মতো।"

অতনু চোখ তুলে হৈমকে দেখল। কথা বলতে পারল না। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বলল, "আজ চলি। কাল টেন্টে আসিস।"

শ্যামলের বাবা এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে। তারাতলায় ওদের ছোট একটা কারখানা আছে। শ্যামল গৌতম আর প্রভাসকে ওদের গাড়িতে তুলে নিল। সজল বলল, "শ্যামলদা, বিরিয়ানি কী হল?"

শ্যামল ওর বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর বাবা সজলের পিঠে হাত রেখে বললেন, "আগামী রবিবার আমার বাড়িতে তোমাদের সবার নেমন্তন্ন। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।"

আস্তে-আস্তে সবাই চলে যাওয়ার পরে ময়দানের ধূসর অন্ধকার পেরিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে হৈম উৎপলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "পাগল ছেলেটার কাণ্ড দেখ। গায়ের জামা পুড়িয়ে কেমন দিব্যি যাচ্ছে।"

উৎপলের পোশাকটা তখন দেখবার মতো। পরনে প্যান্ট, পায়ে নর্থস্টার জুতো, মাথায় একটা কাগজের ঠোঙা টুপির মতো পরা, কাঁধে ঝুলছে চামড়ার ব্যাগ, মুখে দক্ষিণেশ্বর থেকে কেনা ভেঁপু, আর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, অথচ গায়ে জামা নেই। উদোম গায়ে এমন চেহারার একটা ছেলের দিকে পথ-চলতি সবাই ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছিল।

সুশীলদা বাবুঘাট পর্যন্ত এগিয়ে এসে ওদের বাসে তুলে দিয়ে বললেন, "আজকের খেলার সুফল তোরা আগামী বছর পাবি। তবে মনে রাখিস, আজকের খেলাই কিন্তু শেষ নয়। ভাল প্লেয়ার হতে হলে এর থেকে হাজার গুণ ভাল খেলতে হবে। তার জন্যে রোজ প্র্যাকটিস চাই, রোজ।"

সুশীলদা ফিরে যাবার আগে আপনমনেই বললেন "অংশুটা হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেল কেন?"

॥ দশ ॥

ব্লু স্টারের সঙ্গে ভাল খেলার সুফল পেতে বেশি দেরি হল না। দু'দিন পরেই রাজস্থানের সঙ্গে খেলা। উজ্জ্বল আর সজল টেন্টে পৌঁছতেই অতনু এসে খবর দিল, "রাজস্থানের সঙ্গে যুব সম্মিলনীর খেলার প্লেয়ার লিস্টে অতনু, শ্যামল, বিশু, নিতাই, উজ্জ্বল আর সজলের নাম নেই। অংশুদার জায়গায় এখন কোচ করছেন জগা দত্ত।"

উজ্জ্বল বলল, "এরকম হল কেন?"

অতনু ময়দান থেকে একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় পিষতে পিষতে উত্তর দিল, "আমরা নাকি টিমের ডিসিপ্লিন ভেঙেছি। কর্মকর্তাদের অপমান করেছি।"

উজ্জ্বল অবাক গলায় বলল, "সে কী! এসব আমরা কবে করলাম?"

অতনু হাতের ঘাসগুলো মুঠো খুলে ফেলে দিয়ে বলল, "করেছি। ব্লু স্টারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলে ডিসিপ্লিন ভাঙা হত না। আমরাও প্লেয়ারলিস্টে থেকে যেতাম। গটআপ গেম না খেলার শাস্তিটাই এভাবে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।"

উজ্জ্বল ম্লান চোখে টেন্টের দিকে তাকাল। খেলবে বলে বিশু তৈরি হয়ে এসেছিল। এখন পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে সে টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। জগা দত্ত তাকেও ড্রেস করতে নিষেধ করেছেন।

ফাঁকা গ্যালারিতে বসে খেলাটা দেখল ওরা। ওদের হাত-পা

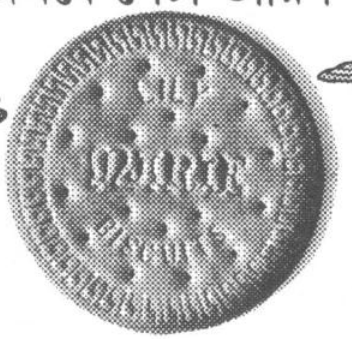

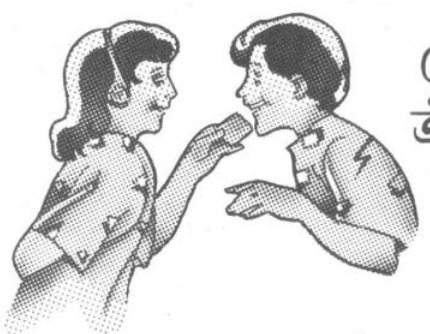

গিন্নী বলেন
চায়ের সঙ্গে চলবে নাকি মারী ?
কর্তা বলেন লিলি হলে
জমবে সেটা ভারি ।
কেমন মজা কুড়মুড় মুড়
ক্রীমক্র্যাকারে জেলি
দারুণ মজা সন্দেহ নেই
হলে সেটা লিলি ।
এসে গেছে লিলি বিস্কুট
টাটকা তাজা
দারুণ মজা
লিলি বিস্কিট
LILY
BISCUITS
LB-6391

ছটফট করতে লাগল। অতনু বেঞ্চিতে ঘুসি মেরে বলল, "ইচ্ছে করে টিমটাকে ডোবাচ্ছে। আমরা এই খেলা থেকেও পয়েন্ট পেতাম।"

রাজস্থানের কাছে দু' গোলে হেরে গিয়ে টেন্টে ফিরল যুব সম্মিলনী। প্রভাস আর নির্মল টেন্টে ঢুকবার আগে ওদের দিকে করুণ চোখে তাকাল। একটা অপমানবোধে আক্রান্ত হয়ে উজ্জ্বলের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। অতনুকে টেনে এনে বলল, "চল, আমরা সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলি।"

অতনু বলল, "কোনও লাভ নেই। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।"

উজ্জ্বল অসহায় গলায় বলল, "তা হলে ?"

অতনু একটু ভেবে বলে উঠল "চল, সুশীলদার কাছে যাই। যদি কোনও উপায় পাওয়া যায়।"

সুশীলদাকে ভেটারেন্সের টেন্টে পাওয়া গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল, সুশীলদার পাশে, টেবিলে মাথা রেখে বসে আছেন তাদের অংশুদা। ওরা টেন্টের দরজা ডিঙিয়ে ডাকল, "অংশুদা।"

বিদ্যুৎ-গতিতে মুখ তুললেন অংশুদা। তাঁর চোখের দৃষ্টি ম্লান। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, এসময় এই জায়গাতে অংশুদা তাদের আশা করেননি।

সুশীলদা ডাকলেন, "আয়, ভেতরে এসে বোস।"

ওরা অংশু হালদারের পেছনে সার দিয়ে বেঞ্চিতে বসল। সুশীলদা খাতায় কিছু একটা লিখছিলেন। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, "আজ রাজস্থানের সঙ্গে তোদের খেলা ছিল না ?"

অতনু ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

অংশুদা আড়াআড়িভাবে ঘুরে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "রেজাল্ট কী হল ?"

অতনু উত্তর দিল, "দু' গোলে যুব হেরেছে।"

অংশুদা টেন্টের দরজা দিয়ে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা কি খেলেছিলি, নাকি তোদের বাদ দিয়ে টিম নামিয়েছে ?"

এবার উজ্জ্বল জবাব দিল। তার গলায় চাপা আবেগ আর বুকের মধ্যে তীব্র একটা অপমানবোধ জেগে আছে। সে বলল, "আমরা ছ'জন বাদ পড়েছি। প্লেয়ারলিস্টে আমাদের কারও নাম নেই।"

অংশু হালদার বিষণ্ণ গলায় বললেন, "জানতাম এই রকমই হবে। মনে হচ্ছে, লিগের বাকি খেলাগুলোও তোদের ছ'জনকে বাদ দিয়ে টিম তৈরি করবে।"

উজ্জ্বলের বুকের মধ্যে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। যুব সম্মিলনীর সঙ্গে মোহনবাগানের খেলাটা এখনও বাকি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে পারাটাও যে উজ্জ্বলের অনেকদিনের স্বপ্ন। ওই দিন নিশ্চয়ই মোহনবাগানের গ্যালারিতে শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামীদের মতো মোহনবাগানের অনেক বড়-বড় ফুটবলার হাজির থাকবেন খেলা দেখতে। লিগ টেবিলের এই অবস্থায় মোহনবাগানের কাছে খেলাটার গুরুত্ব অনেকখানি। ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন উজ্জ্বল যেমন বলরাম, সুকুমার সমাজপতি আর সুভাষ ভৌমিককে দেখেছিল দর্শক-আসনে। তেমনই ভেবেছিল, মোহনবাগানের কর্মকর্তাদের আসনে বসে থাকবেন শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, রুনু গুহঠাকুরতার মতো খেলোয়াড়রা। জীবনে কখনও ওদের সঙ্গে খেলতে পারবে না, তবু সেদিনের সেই খেলাই হবে ওঁদের উদ্দেশে ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি। খেলা দেখতে দেখতে চুনী গোস্বামীর কি মনে পড়বে, একদিন এক পড়ন্ত বিকেলে কালীঘাট-মাঠে এই ছেলেটির পিঠে হাত রেখেই তিনি বলেছিলেন, 'ওয়েল ডান, দারুণ খেলেছ, তোমার খেলা হবে।'

কতদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছে মোহনবাগান মাঠে সবুজ-মেরুন জার্সির বিরুদ্ধে সে লড়াই করছে। তার বাড়ানো বল সুব্রত ভট্টাচার্যের নাগাল পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে সজলের পায়ে। বিদেশ বসুর দুরন্ত গতিকে থামিয়ে দিয়ে তার পা থেকে ছোঁ মেরে বল তুলে নিয়ে তীরের গতিতে মোহনবাগান সীমানার দিকে ছুটে যাচ্ছে উজ্জ্বল।

খেলা শেষ হতেই মাঠের মধ্যে ছুটে এসেছেন শৈলেন মান্না। উজ্জ্বলকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করছেন, "তোমার নাম কী ?"

উজ্জ্বলের চোখ ভিজে আসছিল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, "আমাদের অন্যায়টা কোথায় ?"

অংশুদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, "আমি ঠিক জানি না। ওদের মতলবের নাগাল পাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।"

উজ্জ্বল কাতর গলায় বলল, "আসছে শনিবার মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা। ওই খেলাটাতেও চান্স দেবে না ?"

অংশুদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বললেন, "আমি জানতাম, আমি সেদিনই জানতাম এরকম হবে। লিগ এবং শিল্ড দুটোতেই তোদের বসিয়ে রাখবে। একটা টিমকে আর কয়েকটা ছেলেকে, যারা ভাল ফুটবল খেলতে চায়, তাদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে অবনী দত্ত। ওরা ভাল কোচ কিংবা ভাল ফুটবলার চায় না, ওরা চায় ওদের হুকুম মেনে চলবার মতো কিছু চাকরবাকর।"

নিজের কাজ শেষ করে সুশীলদা মুখ তুলে অংশুর দিকে চাইলেন। খাতাটা বন্ধ করতে-করতে বললেন, "অত উত্তেজনা ভাল নয় অংশু। তোমার ছেলেরা তোমার কাছে সান্ত্বনা পেতে এসেছে। ওদের বলে দাও যে, গটআপ গেম খেলতে পারোনি বলে তোমাকেও অবনী দত্ত বাদ দিয়ে জগা দত্তকে কোচ করেছে। তুমি তো অবনী দত্তকে সাফসাফ বলেই দিয়েছ।"

অংশুদা বেঞ্চিতে বসতে বসতে বললেন, "হ্যাঁ, আমি সাফসাফ বলে দিয়েছি, আমি আমার ছেলেদের গটআপ ম্যাচ খেলাতে পারব না। এইসব ছেলের মধ্যে একটা করে স্বপ্ন আছে, ফুটবলের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা আছে। আমি জেনেশুনে সেসব নষ্ট করতে পারব না।"

সুশীলদা গম্ভীর মুখে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই কথার জবাবে অবনী দত্ত কী বলেছেন জানিস ?"

উজ্জ্বলের মতো সবাই সুশীলদার মুখের দিকে তাকাল। সুশীলদা একটু ম্লান হাসলেন। হাসি থামিয়ে অংশু হালদারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, "ওই অংশু, তোদের কোচকে অবনী দত্ত বলেছেন, তোমার মতো কোচ গড়ের মাঠে নর্দমায় পাওয়া যায়। আর ওই ছোঁড়াগুলোর মতো খেলা আমি রাস্তার কুকুর-ছাগলকে দিয়েও খেলাতে পারি। ওদের ফুটবল খেলার শখ আমি মিটিয়ে দেব। গড়ের মাঠে আমাকে চটিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ খেলোয়াড় হতে পারেনি।"

উজ্জ্বল লক্ষ করল, অতনু আর শ্যামলের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। তার নিজের বুকের ভেতরটা কাঁপছে। মনের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্নটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ময়দানের অন্ধকার ঘন হয়ে ঢেকে দিতে চাইছে তাকে।

সুশীলদা আলমারি খুলে তার ভেতরে খাতাপত্র ঢুকিয়ে রাখলেন। অংশুদার বিষণ্ণ মুখে অপমানের ছায়াটা গাঢ় হয়ে ফুটে আছে। থুতনির কাটা দাগটা উজ্জ্বলের চোখে আজ বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিল। ওদের কারও মুখে কোনও কথা জোগাচ্ছিল না। হয়তো উজ্জ্বলের মতো ওরাও নিজেদের ভেতরের স্বপ্নটাকে মরে যেতে দেখে স্থির হয়ে ছিল।

খানিক পরে সুশীলদার পেছন-পেছন ওরা টেন্টের বাইরে এল। ময়দান জুড়ে বেদনার মতো গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটা গাড়ির ভেতর থেকে ট্রানজিস্টারে হিন্দি গান ভেসে আসছিল। উজ্জ্বলের চট করে মনে পড়ল, মা হয়তো খেলার খবর শুনতে মুক্তিমাসির ঘরে বসে আছেন। মাঠের বাইরে যে খেলা তার খবর রেডিও থেকে মা জানতে পারবেন না।

অনেকটা পথ একসঙ্গে হেঁটে আসবার পর অতনু জিজ্ঞেস করল, "আমরা তা হলে এখন কী করব অংশুদা?"

অংশু হালদার চট করে জবাব দিতে পারলেন না। সুশীল ভট্টাচার্যের মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তোদের তো অফিসিয়ালি কিছু বলেনি। তোরা যেমন যাস তেমনই রোজ টেন্টে যাবি। চান্স না দিলে চলে আসবি।"

বাড়ি ফিরে ওরা প্রথমে কোনও কথা বলল না। ওরা জানত, খেলায় হেরে গেলে মা খুব দুঃখ পান। হৈম ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, "তোরা মাঠে নামিসনি কেন?"

হৈমর জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনও রাগ ছিল না। উজ্জ্বল জবাব দিতে গিয়ে মা'র চোখের দিকে তাকাল। মা স্থির চোখে তাদের দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। উজ্জ্বল আসল ঘটনা না বলে জিজ্ঞেস করল, "মাঠে নামিনি এ-খবরটা কে দিল?"

হৈম চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, "উৎপল মাঠ থেকে ফিরে এসে বলে গেল তোরা নাকি আজকে খেলিসনি। তোদের নাম করে টেন্টে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঢুকতে পারেনি। পরে টিকিট কেটে খেলা দেখেছে।"

হৈম চলে যাচ্ছিল। উজ্জ্বল ডাকল, "মা।"

উজ্জ্বলের ডাকে ঘুরে দাঁড়ালেন হৈম। উজ্জ্বলের ঠোঁট কাঁপছে। বুকের মধ্যে জমে-থাকা অপমান তার গলার স্বর বুজিয়ে দিল।

হৈম অবাক চোখে ছেলের কাছে এগিয়ে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, "কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?"

মায়ের হাত পিঠের ওপর। সেই স্পর্শে উজ্জ্বলের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়ে কান্না বেরিয়ে এল। মা'র বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে উজ্জ্বল বলে উঠল, "আমাদের টিম থেকে বাদ দিয়েছে। আমাদের আর খেলতে দেবে না।"

হৈমর শরীর কঠিন হয়ে এল। বুকের ওপর থেকে ছেলের মুখ দু'হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাদ দিয়েছে কেন?"

উজ্জ্বল বলল, "ব্লু স্টারের সঙ্গে আমরা গটআপ গেম খেলিনি বলে। অংশুদাকেও বাতিল করে দিয়েছে।"

হৈমর চোখ জ্বলে উঠল। কঠোর গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "কে বাদ দিয়েছে?"

সজল তক্তপোশের ওপর থেকে নেমে বলল, "বাদ দেবার কর্তা একজন, সে অবনী দত্ত।"

অবনী দত্তের চেহারাটা মুহূর্তে মনে পড়ে গেল হৈমর। ওরকম নিপাট ভালমানুষের মতো চেহারার একজন মানুষ এরকম কাণ্ড কেন করবেন। হৈম উজ্জ্বলের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই কোথাও ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি নিজে যাব অবনী দত্তর কাছে। দেখি, সে কেমন করে তোদের ওপর অন্যায় করে।"

হৈমর স্থির বিশ্বাস ছিল, তিনি নিজে গিয়ে অবনী দত্তর সামনে দাঁড়ালে সব সমস্যা মিটে যাবে। মোহনবাগানের সঙ্গে যুব সম্মিলনীর খেলার আগেই যাওয়া দরকার। হৈম নিজেও জানেন, এই ম্যাচটা জিততে না পারলে মোহনবাগানের পক্ষেও লিগ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে। যদি ড্র হয় তা হলে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান সমান হয়ে যাবে। ব্লু স্টারের অবশ্য আর কোনও আশা নেই। এমন একটা খেলায় তাঁর ছেলেরা মাঠে না নেমে ঘরে বসে থাকবে এমনটা হৈম ভাবতে পারেন না।

টেন্টের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মালি এসে খবর দিল বড়বাবু ডাকছেন। হৈমর পেছন-পেছন উৎপলও গেল। উজ্জ্বল আর সজল বাইরে দাঁড়িয়ে। অবনী দত্ত মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কী ব্যাপার?"

তাঁর কথা বলার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল না তিনি হৈমকে চিনতে পেরেছেন কি না। হৈম হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, "বোধহয় চিনতে পারছেন না। আমি উজ্জ্বল-সজলের মা।"

অবনী দত্ত চোখ তুলে হৈমর মুখের দিকে তাকালেন। আগের মতোই বললেন, "ওঃ, তা হঠাৎ আমার কাছে কেন?"

হৈম অনুরোধের গলায় বললেন, "আমার ছেলেরা কী অন্যায় করেছে আমি জানি না। ওরা আমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছে না। আপনি ওদের গুরুজন, অভিভাবক। আপনি ক্ষমা না করলে ওরা কার কাছে যাবে?"

অবনী দত্ত পাইপ থেকে টোব্যাকো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "ওদের কি যাবার লোকের অভাব আছে? ওরা অংশু হালদারের কাছে যাক, না হয় সুশীল ভট্চাজ। তা না পারলে জাহান্নামে যাক। আমার কাছে কেন?"

হৈম অবনী দত্তর রূঢ় কণ্ঠস্বর আর কথা বলার অশোভন ভঙ্গিটা নিঃশব্দে হজম করে নিয়ে বললেন, "আমি তো আপনার কথামতো আপনার হাতেই ওদের দিয়েছিলাম। ওদের অপরাধটা ঠিক কোথায় সেটাই ধরতে পারছি না।"

অবনী দত্ত পাইপটা টেবিলের ওপর রেখে কড়া চোখে হৈমর দিকে তাকালেন। তারপর চড়া গলায় বললেন, "আপনার ছেলেরা লায়েক হয়ে গেছে। ঘেরা মাঠে দু'দিন খেলেই ভাবছে তারা এক-একজন দিকপাল হয়ে উঠেছে। দশ-বিশটা হুজুগে দর্শকের হাততালি আর বাহবা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে। ক্লাবের নির্দেশ মানছে না। নিজেদের খুশিমতো খেলছে। ওরকম ছেলে আমার দরকার নেই। দুষ্ট গোরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল।"

হৈম মনে-মনে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললেন, "ব্লু স্টারের সঙ্গেই ওরা লাস্ট খেলেছে। সেদিন তো ওরা ভালই খেলেছে। খবরের কাগজেও ওদের খেলার প্রশংসা করেছে। টিমও জিতেছে।"

অবনী দত্ত চোখের কোণ দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে হৈমর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি খেলাও বোঝেন নাকি?"

হৈমর সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "আমি তো সে-কথা বলিনি। আমি কাগজের কথা বলছিলাম।"

অবনী দত্ত প্রায় গর্জন করার ভঙ্গিতে বললেন, "কাগজওলারা খেলার কতটুকু বোঝে? হাতে কলম আছে, তাই লিখে যাচ্ছে।"

হৈমর মনে হল নিঃশব্দে সব মেনে নেওয়ার মধ্যে শুধু অপমান নয় লজ্জাও আছে। তাঁকে অসহায় ভেবে অবনী দত্ত নামক লোকটা ক্রমশ চড়া গলায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। লোকটাকে এতখানি বাড়তে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। হৈম মাথার ঘোমটাটা আরও একটু তুলে দিয়ে বললেন, "আমার ছেলেরা আপনাদের নির্দেশে ব্লু স্টারের সঙ্গে গটআপ গেম খেলেনি। এই না-খেলাটা যদি আপনার চোখে অন্যায় হয়, তা হলে এরকম অন্যায় ওরা হাজার বার করবে। কারণ, এটা ওদের মায়ের নির্দেশ। এর বাইরে যদি কোনও অন্যায় করে থাকে, তা হলে তার কথা বলুন।"

অবনী দত্ত বড়-বড় চোখে হৈমর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ যেন জ্বলছে। তিনি চাপা গলায় গর্জন তুলে বললেন, "আপনি

জানেন, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ?"

হৈম একটু হাসলেন। সে হাসিতে তাচ্ছিল্যটা এমন স্পষ্ট যে অবনী দত্তর চোখ এড়াল না। হৈম সহজ গলায় বললেন, "একজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই তো কথা বলতে এসেছিলাম। এতদিন যাকে শ্রদ্ধা করতাম একজন ফুটবল-দরদি হিসেবে। এখন দেখছি, সেই ধারণাটা আমার ঠিক নয়।"

অবনী দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "বেরিয়ে যান। আমি চাই না দরোয়ান দিয়ে একজন মহিলাকে বার করে দিতে। সেই অপ্রিয় কাজটা করতে বাধ্য করবেন না।"

হৈম কঠোর চোখে অবনী দত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফুটবল মাঠে গটআপ গেম করতে যাঁর আটকায় না, দরোয়ান ডাকতে তাঁর সঙ্কোচ হবার কথা নয়। তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, আজকের দিনটা আমি ভুলব না, আমার ছেলেদেরও ভুলতে দেব না।"

অবনী দত্ত তখন দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "গেট···গেট আউট।"

টেন্টের বাইরে আসতে আসতে অবনী দত্তকে শুনিয়ে উৎপল হৈমকে বলল, "মাসিমা, ভদ্রলোক বোধহয় রিটায়ার্ড ট্রাফিক পুলিশ। কতক্ষণ হাত তুলে দাঁড়িয়ে আমাদের বেরিয়ে যাবার রাস্তা দেখাচ্ছিল।"

সুশীলদা সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে মুখ তুলে তাকালেন উজ্জ্বল আর সজলের দিকে। ওদের মুখ দুঃখে আর অপমানে কালো হয়ে গেছে। হৈম হাঁটুতে মুখ রেখে পাথরের মতো বসে। সুশীল ভট্টাচার্যের চোখ জ্বলে উঠল। যৌবনের সেই অস্থিরতা আর উত্তেজনা তাঁর বুকের মধ্যে দামাল হাওয়ার মতো ছোটাছুটি করছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে বাইশ বছরের সুশীল ভট্টাচার্য। মুহূর্তে তাঁর শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে গেল।

চেয়ার থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুশীল ভট্টাচার্য। এগিয়ে এসে উজ্জ্বল আর সজলের কাঁধে থাবা দিয়ে শক্ত করে ধরে বললেন, "তোদের মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। অবনী দত্তর অপমানের বদলা নিতে হবে। স্ট্রাইকার, তোর লাস্ট ডিফেন্সে আঘাত হেনেছে অবনী দত্ত।"

সুশীল ভট্টাচার্য উজ্জ্বলের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে চাপা গলায় আবেগ জড়িয়ে বললেন, "লিঙ্কম্যান, এবার অ্যাটাক। অবনী দত্তর সীমানায় অ্যাটাক হানতে হবে, বি রেডি।"

ওদের শরীর কেঁপে উঠল। অপমান আর দুঃখবোধ মিলেমিশে একটা কঠিন চেহারা নিয়েছে। উজ্জ্বল শরীর শক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সুশীলদা, আমার যা-কিছু জোর সে খেলার মাঠে। আমি শুধু একবার মাঠে নামবার সুযোগ চাই। শুধু একটি বার দেখতে চাই অবনী দত্তকে।"

সুশীলদা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "সেই সুযোগ তোরা পাবি।"

উজ্জ্বল আর সজল অধৈর্য গলায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল, "কবে ?"

সুশীলদা উত্তর দিলেন, "সেপ্টেম্বরে। দুর্গাপুরে মহারাজা গোল্ড কাপে অবনী দত্তর মিতালি সংঘ গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ান। বেসরকারি টুর্নামেন্ট, তবুও বেনামে কলকাতার অনেক ক্লাব সেখানে খেলতে যায়। যুব আর ব্লু স্টারের খেলোয়াড় নিয়ে মিতালি গত দু'বারের মতো এবারও থার্ড টাইম চ্যাম্পিয়ান হয়ে রেকর্ড করতে চাইবে। এবার সেই কাপে আমরা নাম দেব। গোল্ড কাপ এবার মিতালিতে নয়, আসবে মণীন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবে।"

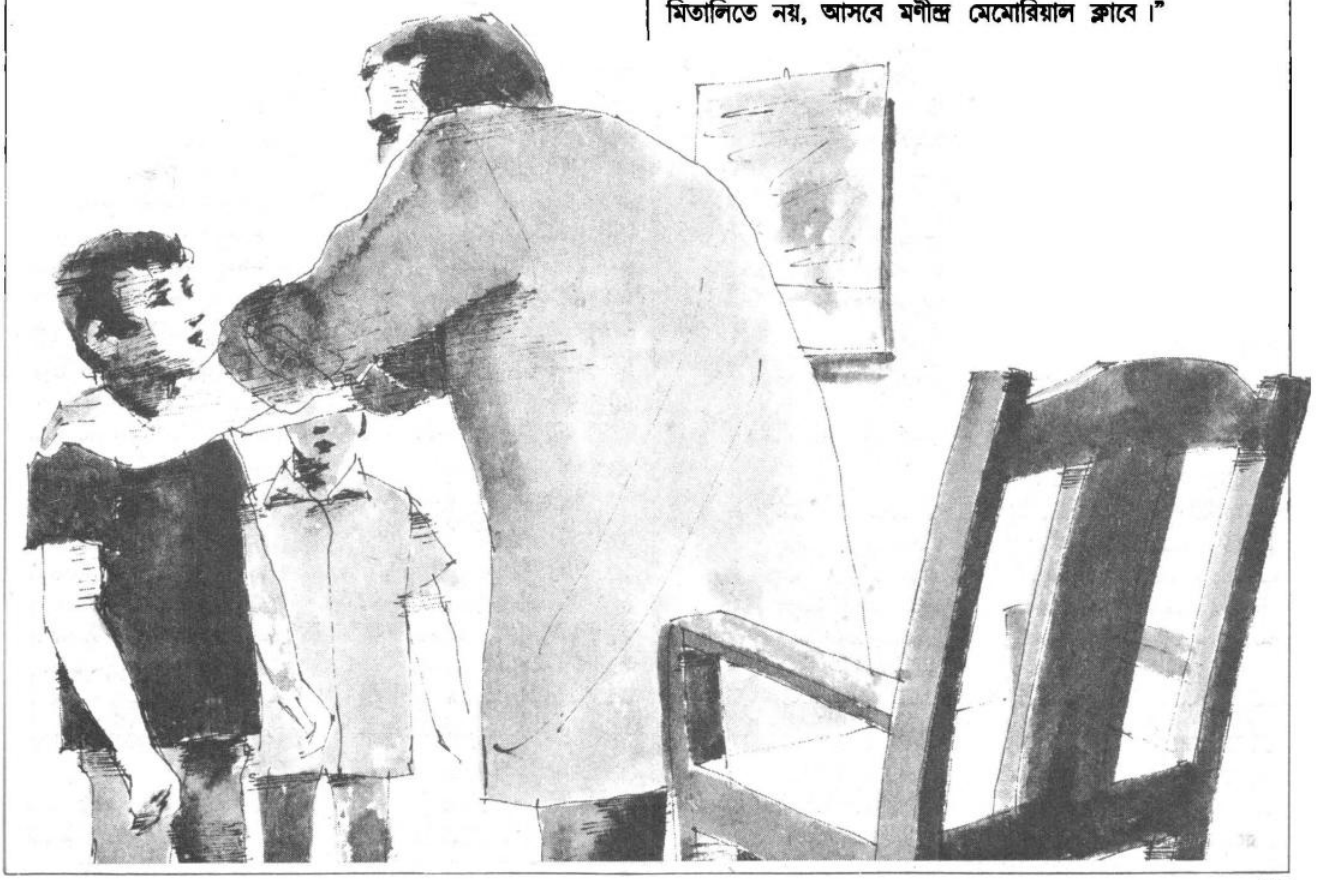

হৈম হঠাৎ চোখ তুলে সুশীল ভট্টাচার্যের দিকে তাকালেন। উজ্জ্বল দেখল, মা'র দৃষ্টি অস্বাভাবিক। তাঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। চোখের তারা আশ্চর্য রকমের স্থির হয়ে আছে। উজ্জ্বল মা'র কাছে গিয়ে অস্ফুটে ডাকল, "মা, মা গো।"

হৈম কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, "ঠাকুরপো, কী নাম বললেন?"

সুশীল ভট্টাচার্য চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। মণিদার নামে আমি নতুন ক্লাব করব। আজই কাগজপত্র সব তৈরি করে ফেলব। সকালে শিয়ালদার মাঠে আমি কোচ করব আর বিকেলে কালীঘাট মাঠে অংশু তোদের কোচ করবে। যুব'র বাদ যাওয়া ছ'জন থাকবে, বাকি ছেলে আমি জোগাড় করব। তোদের বাবার নামে ক্লাব করে সেই ক্লাব দিয়ে অবনী দত্তর মিতালি সংঘকে হারাতে পারলে বউদির অপমানের বদলা নেওয়া হবে। লিঙ্কম্যান, বি স্টেডি, এবার অ্যাটাকে যাওয়ার সময়। অ্যাটাক-অ্যাটাক অ্যাণ্ড অ্যাটাক, ইমিডিয়েটলি।"

সুশীলদা ওদের বুকের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। উজ্জ্বলের সারা শরীর জুড়ে থইথই করতে লাগল একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। তার সামনে অপমানিত মায়ের অন্ধকার মুখ। প্রতিপক্ষের গোলের নেট ফাটিয়ে সেই অন্ধকারকে মুছে দিতে হবে তাদের।

উজ্জ্বল দেখল মা'র চোখ বাবার ফোটোর দিকে। উজ্জ্বল আস্তে-আস্তে চোখ বুজে বুকের মধ্যে একজন সেন্টার-হাফকে খুঁজল। লাল আর সবুজ জার্সি পরা সেই সেন্টার-হাফটি এখন তার বুকের মধ্যে জগিং করছেন।

॥ এগারো ॥

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে পানাগড় স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে প্রথম খেলা পড়ল উজ্জ্বলদের। সবাই বেশি বয়সের খেলোয়াড়। হাফ-টাইমের পর দম হারিয়ে দলটা নেতিয়ে পড়ল। খুব সহজেই পানাগড় স্পোর্টিংকে তিন গোলে হারিয়ে সন্ধেবেলা ট্রেনে উঠল মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের ছেলেরা। সুশীলদা অতনুকেই দলের ক্যাপ্টেন করেছেন। প্রথম খেলায় যুব সহজে জিতে যাওয়ায় ওরা খোশমেজাজে ছিল। কিন্তু উজ্জ্বলের এই জয়ে কোনও শান্তি ছিল না। মিতালির খেলাটাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

রাত্রে বাড়ি ফিরে সে চমকে উঠল। মা'কে ঘিরে মুক্তিমাসি আর প্রতিবেশী কয়েকজন। উজ্জ্বলের গলার শব্দে মা আস্তে-আস্তে চোখ খুললেন। বোধহয় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই চোখের ইশারায় কিছু জানতে চাইলেন।

উজ্জ্বল মা'র পাশে বসে বলল, "আমরা তিন গোলে জিতেছি। দু'দিন বাদে কোয়ার্টার-ফাইনাল।"

মা চোখ বুজলেন। উজ্জ্বল হতভম্বের মতো মুক্তিমাসির দিকে তাকাল। মুক্তিমাসি বললেন, "বুকের মধ্যে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। কাল রাত থেকেই আবার জ্বর বেড়েছে। আজ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। নলিনীডাক্তার ঠিক বুঝতে পারছে না। বলছে, কলকাতার হাসপাতালে দেখাতে।"

সজল হৈমর পায়ের কাছে বসে ছিল। ভয় পেয়ে মা'র পা আঁকড়ে ধরল। উজ্জ্বল মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মেসোমশাইয়ের সাইকেলটা নিয়ে আমি একটু ঘুরে আসছি।"

মুক্তিমাসি কিছু বলতে যাবার আগেই সজল বলে উঠল, "কোথায় যাবি?"

উজ্জ্বল উত্তর দিল, "ঘোলায় গিয়ে উৎপলকে ধরি। ওর অনেক জানাশোনা আছে। ওদের ক্লাব থেকে যদি হাসপাতালে দেখানোর কোনও সোর্স পাওয়া যায়।"

ঘণ্টা-দুয়েক বাদে উজ্জ্বল ফিরে এল উৎপলকে নিয়ে। ওদের সঙ্গে ক্লাবের সেক্রেটারি অশোকবাবু। মিনুই ওর বাবাকে পাঠিয়েছে ওদের সঙ্গে।

অশোক রায় সব দেখেশুনে বললেন, "কাল সকালেই আমি আর·জি· কর হসপিটালে অ্যাডমিশন করিয়ে দেব। ওখানে আমার অনেক চেনাশোনা ডাক্তারবন্ধু আছে। শুধু একটা অ্যাম্বুলেন্স পেলে ভাল হয়।"

উৎপল হৈমর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবারে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "সে-ব্যবস্থা আমি করে নেব। আপনি হাসপাতালটা দেখুন।"

অশোক রায় ফিরে গেলেন। কিন্তু উৎপল থেকে গেল। খানিক পরে হৈম চোখ খুলে ছেলেদের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে ম্লান হাসি। উজ্জ্বল নরম গলায় বলল, "মা, ভয় কোরো না। আমরা কালই তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাব।"

হৈম ছেলের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে থাকিয়ে থেকে বললেন, "কাল সকালে প্র্যাকটিস কামাই করিস না। ফাইনালে তোদের যে যেতেই হবে।"

উজ্জ্বলের গলা বুজে আসছিল। বুকের মধ্যে একটা কষ্টের পিণ্ড গড়াতে গড়াতে কাছে উঠে আসছে।

উৎপল মাথায় জলপটির ন্যাকড়াটা পালটে দিয়ে বলে উঠল, "কিচ্ছু ভাববেন না মাসিমা। ওরা দু'জনে প্র্যাকটিসে গেলেও আমি তো আছি। আমার ক্লাবের ছেলেরা আছে।"

সজল হৈমর জন্য হরলিক্স বানিয়ে নিয়ে এল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে হৈমকে বসানো হয়েছে। গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে হৈম থেমে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের জন্যে তো রান্না করতে পারিনি। তোরা কী খাবি?"

সজল মা'র মুখের কাছে গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "মুক্তিমাসি খাবার দিয়ে গেছে।"

উৎপল নিজের ঝোলা দেখিয়ে বলল, "আপনি ভাববেন না। ওই ঝোলায় পাউরুটি, ডিম, কলা সবরকম খাবার আছে। সারারাত খেলেও শেষ হবে না।"

প্র্যাকটিস শেষ করে সুশীলদাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা আর·জি· কর-এ এল। হৈম'র জন্য একটা কেবিন ব্যবস্থা করেছেন অশোক রায়। বড় ডাক্তার এখনও আসেননি। খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে হৈমকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ওরা আস্তে-আস্তে বাইরে এল। বাইরে তখন ইলশেগুড়ি বৃষ্টি ঝরছে। ওরা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের ক্যান্টিনের দিকে যেতে লাগল।

সজল জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন সুশীলদা?"

সুশীলদা চলতে চলতে জবাব দিলেন, "শ্যামলের কাছে যাচ্ছি। শ্যামল দত্ত। ছেলেটা আমার পরিচিত। খুব কাজের ছেলে। দেখি, যদি ওর কোনও সাহায্য পাই।"

হাসপাতালে সুশীলদার অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সুশীলদাকে দেখেই শ্যামল দত্ত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। সবকিছু শোনার পর বৃষ্টির মধ্যেই নীচে নেমে এসে ডাক্তার চ্যাটার্জির খোঁজ করতে লাগল। ইতিমধ্যে শিবব্রত, ডাঃ সোমনাথ, সন্তোষ দত্ত আরও অনেক জুনিয়র ডাক্তার আর স্টাফ এসে জড়ো হয়ে গেছে সুশীলদার পাশে।

বিকেলে কালীঘাট মাঠে প্র্যাকটিস শুরু হবার আগে সুশীলদা বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, তোদের মন পড়ে আছে হাসপাতালের

কেবিনে, তোদের মায়ের কাছে। তোদের মায়ের মন কিন্তু অপেক্ষা করছে এই মাঠে। তোরা নিজেদের জন্যে খেলছিস না, খেলছিস তোদের মায়ের জন্যে। ফুটবল তোদের মা। তোরা মাঠে নামলে তোদের মা তোদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। মাঠের বাতাসে হৈমবউদির নিশ্বাস লেগে আছে। তোরা চোখ বুজে ভাবলেই ধরতে পারবি।"

কোয়ার্টার-ফাইনালে মণীন্দ্র মেমোরিয়ালকে খেলতে হল বার্নপুরের নবোদয় সঙ্ঘের সঙ্গে। বেশ শক্তিশালী দল। গত বছর অবনী দত্তর মিতালি সংঘ এদের সঙ্গেই ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় এক গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কলকাতার প্রথম ডিভিশন থেকে জনা-তিনেক ভাড়া-করা খেলোয়াড় এই দলের হয়ে খেলল। হাফ-টাইমের পর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালিয়ে মণীন্দ্র মেমোরিয়াল শেষ পর্যন্ত অতনুর দেওয়া এক গোলে জিতে গেল।

খেলা শেষ হতেই সুশীলদা সজলকে বললেন, "সজল, তুই বারবার অফসাইডে পড়ে গিয়ে দলের দুটো পজিটিভ চান্স নষ্ট করেছিস। উজ্জ্বল তোকে বক্সের মধ্যে যে বল দিয়েছিল, তা থেকে একটা অন্তত গোল হতে পারত, কিন্তু তুই পারলি না।"

সজল বাঁ হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কষ্টটা সুশীলদা জানেন। অংশু হালদার এসে আড়ালে ডেকে সুশীল ভট্টাচার্যকে বললেন, "সজলকে বোকো না। ওর মা'র অবস্থা তো জানো।"

সুশীলদা আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন আপনমনেই বললেন, "জানি বলেই তো ওদের ভেতরের জেদটাকে কেবলই খোঁচাতে চাইছি। ওদের ভেতরের কষ্ট আর অপমানকে মাঠের মধ্যে আগুন করে ফুটিয়ে তুলতে চাই। অংশু, আমি জানি, হৈমবউদি ওদের কাছে কতখানি। সে জন্যেই মা'র কথা বলে ওদের তাতাতে চাই। ফাইনালে অবনী দত্তর মিতালিকে হয়তো আমরা পাব। সেদিন ওদের আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে হবে। বদ্‌লা চাই অংশু, অপমানের বদ্‌লা, ফুটবলকে অপমান করার বদ্‌লা।"

ফাইনাল খেলার দু'দিন আগে অভাবিত ঘটনাটা ঘটল। সেমিফাইনাল খেলার দিন বেতের চেয়ারে বসে খেলা দেখছিলেন অবনী দত্ত। পরের দিন মিতালির খেলা। মিতালির ছেলেরা সেমি-ফাইনাল খেলবে বলে একদিন আগেই দুর্গাপুরে পৌঁছে গেছে। অবনী দত্তর টাকায় লজের ঘর ভাড়া করে প্লেয়াররা রাজার হালে আছে। মিতালির সেমিফাইনালের আগের দিন মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের সেমিফাইনাল হচ্ছে। কলকাতার ডায়মণ্ড ক্লাবের এগারোজনের মধ্যে ন'জনই প্রথম ডিভিশনর খেলোয়াড়। ওদের ব্যাক, স্টপার আর দু'জন স্ট্রাইকার কলকাতার মাঝারি দলগুলোতে নিয়মিত খেলে। উজ্জ্বল ওদের অনেককেই চেনে। অবনী দত্ত আশা করেছিলেন মণীন্দ্র মেমোরিয়াল সেমিফাইনালেই বিদায় নেবে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। ডায়মণ্ড ক্লাবের ছেলেরা এলোপাথাড়ি পা চালিয়ে, মারদাঙ্গা করেও খেলাটাকে নিজেদের দখলে রাখতে পারল না। দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে ওরা আরও মাথা গরম করে খেলতে লাগল। দ্বিতীয়ার্ধের পনেরো মিনিটে সজলকে এমনভাবে ফাউল করল যে, ওকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হল। বক্সের বাইরে থেকে সেই ফাউল-কিক নিয়েছিল উজ্জ্বল। কোনাকুনি শটে হাওয়ায় বাঁক খাইয়ে বলকে গোঁত্তা মেরে সেকেণ্ড বারের তলা দিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর উজ্জ্বলের মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছিল। ডায়মণ্ড তিন গোল খাবার পর অবনী দত্ত মাঠ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

সেই অবনী দত্তকে আবার দেখা গেল ফাইনালের দু'দিন আগে। শিয়ালদা মাঠে সকালে প্র্যাকটিসের পর ওরা ট্রাম-রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল হাসপাতালে যাবে বলে। হঠাৎ সাদা রঙের একটা ফিয়াট ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। ওরা সরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গাড়ির মধ্যে থেকে মুখ বার করে অবনী দত্ত ডাকলেন, "কোথায় যাবে? হাসপাতালে? চলে এসো।"

ওরা দু'ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আপত্তি করবার মতো সাহস পেল না। গাড়ি চলতে শুরু করার পর অবনী

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ

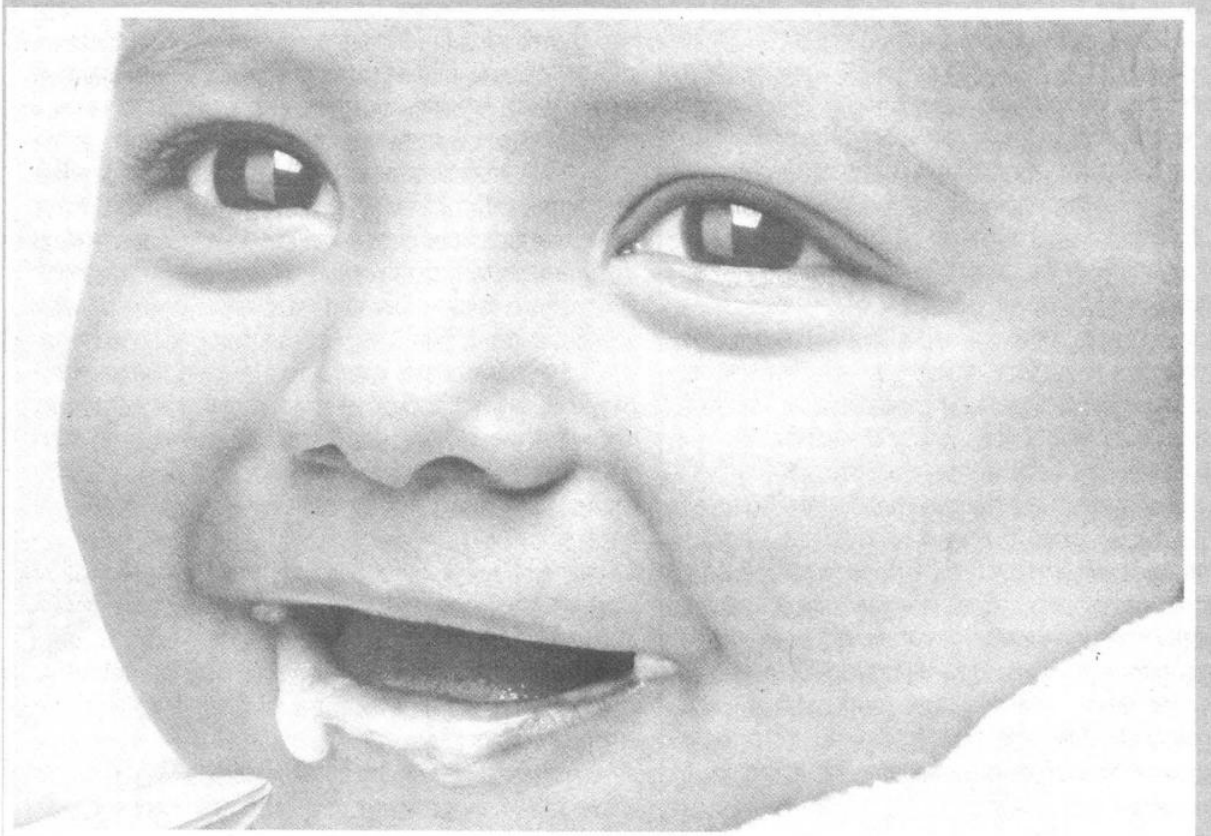

শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ ঃ সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ ঃ সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ ঃ সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো–চট্‌পট্ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন ঃ সেরেল্যাক
পোষ্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮

Nestlé

SAA/FSL/C/3799 (RI) BEN

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ– স্বাদে অনন্য

দত্ত বললেন, "কালই সুশীলের মুখে তোমার মা'র অসুখের কথা শুনলাম। খুব ভাবনার ব্যাপার।"

অবনী দত্ত চিন্তিত মুখে বাইরে তাকালেন। উজ্জ্বল ভেবে পেল না, তার মায়ের জন্য অবনী দত্ত এতখানি চিন্তিত বোধ করবেন কেন ?

অবনী দত্ত সিটের ওপর সোজা হয়ে বসে বললেন, "হার্টের ওপর টিউমার, বুঝতেই পারছ, অপারেশন ছাড়া গতি নেই। আর এরকম শক্ত অপারেশন ভেলোরে ছাড়া ভারতে অন্য কোথাও ভাল হয় না।"

সজল সামনের সিট থেকে এবার ঘাড় ঘুরিয়ে অবনী দত্তকে দেখল। উজ্জ্বল জানে, তার মা'কে সারিয়ে তুলতে যত টাকার দরকার, তত টাকা তাদের নেই। কেমন করে টাকার জোগাড় হবে সেটা কিছুতেই তার মাথায় আসছে না। উজ্জ্বল জানলার বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল। অবনী দত্ত সিটের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "টাকা-পয়সার কোনও ব্যবস্থা হয়েছে ?"

উজ্জ্বল ছোট্ট করে উত্তর দিল, "না।"

অবনী দত্ত যেন নিজের মনেই বললেন, "কী করেই বা হবে। তোমরা দুটি নাবালক ভাই। সব মিলিয়ে প্রায় ছ'সাত হাজার টাকা খরচ।"

ওরা চুপ করে রইল। টাকার অঙ্কটা উজ্জ্বলও জানত। সুশীলদা হাজার-দুয়েক টাকা জোগাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু বাকি চার হাজার টাকার ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে সেটা উজ্জ্বল জানে না। বাড়িটা বাঁধা দিলে হয়তো টাকা জোগাড় হতে পারে, কিন্তু সেটা মা কিছুতেই চাইবেন না। উজ্জ্বলের মাথার মধ্যে বোলতার মতো দুর্ভাবনাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

অবনী দত্ত রাস্তার দিকে চোখ রেখে বললেন, "সুশীল অবশ্য নানা জায়গায় তোমাদের জন্যে অ্যাপিল করছে। কিন্তু তাতে কতটা কী হবে বলা মুশকিল। তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তা হলে অপারেশনের পুরো ছ' হাজার টাকাই আমি দিতে পারি। তোমাদের ভালবাসি বলেই এটা করতে চাই।"

সজল সামনের সিট থেকে ঘুরে বসল। উজ্জ্বল অবনী দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী কথা ?"

অবনী দত্ত বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললেন, "যদি আমার কথা রাখো, তা হলে কথাটা বলি।"

উজ্জ্বল সিটের ওপর সোজা হয়ে বসে ছিল। এবার একটু ঘুরে বসে অবনী দত্তর মুখোমুখি হল। বলল, "মা'র জন্য আমরা সবকিছু করতে রাজি আছি। বলুন, কী করতে হবে।"

অবনী দত্ত এবার উজ্জ্বলের মুখের দিকে তাকালেন। চশমার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বলকে লক্ষ করতে করতে বললেন, "খুব সামান্য কাজ। মহারাজা গোল্ড কাপের ফাইনালে তোমরা দু' ভাই খেলবে না। তোমরা না খেললে অতনু, শিবু, শ্যামল আর নিতাইও খেলবে না। যুব সম্মিলনী তোমাদের ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নেবে। আসছে বছর তুমিই যুব'র ক্যাপ্টেন।"

উজ্জ্বল ঘামতে আরম্ভ করল। অবনী দত্তর চোখ তার মুখের ওপর। সজল স্থির চোখে তাঁরই দিকে তাকিয়ে। উজ্জ্বল বলল, "টাকাটা কবে পাব ?"

অবনী দত্ত আবার সিটের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, "ফাইনাল খেলার পরের দিন।"

উজ্জ্বল মনে-মনে একটু ভাবল। তারপর বলল, "যদি ফাইনালে মিতালি সংঘ হেরে যায় ?"

অবনী দত্ত সোজা হয়ে বসে সিটের গায়ে চাপড় মেরে বললেন, "নেভার ! তোমরা না খেললে মিতালি এই দল নিয়েই চার গোলে জিতে যাবে। এবার মহারাজা গোল্ড কাপ আমার চাই। পর পর তিনবার জিতলে দশ হাজার টাকা ক্যাশ-মানি পাওয়া যাবে। টাকাটা বড় নয়, বড় হচ্ছে আমার প্রেস্টিজ। ফাইনাল খেলাটা মিতালি ভারসাস মণীন্দ্র মেমোরিয়াল হচ্ছে না। আসল খেলা হচ্ছে অবনী দত্ত ভারসাস সুশীল ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড অংশু হালদার। আমি ওঁদের কাছে হারতে চাই না। তা নইলে এই পুঁচকে টুর্নামেন্ট নিয়ে আমার এত ভাবনা ছিল না। আমি হেরে গেলে তার প্রতিক্রিয়া আমার কমিটিতেও হবে।"

উজ্জ্বল আস্তে-আস্তে চোখ সরিয়ে নিল। গাড়িটা ব্রিজ পেরিয়ে আর· জি· কর হাসপাতালের গেটের মুখে এসে গেছে। গেট পেরিয়ে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। উজ্জ্বল নেমে যাচ্ছিল। অবনী দত্ত গাড়ির

ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তোমরা কথা দিচ্ছ তো ?"

উজ্জ্বল গাড়ির দরজা বন্ধ করার আগে বলল, "মা'র সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

অবনী দত্ত বললেন, "মা'কে বোলো, কিন্তু সুশীল কিংবা অংশুকে কিছু বোলো না। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। আমাকে আজই জেনে যেতে হবে।"

উজ্জ্বল দরজা বন্ধ করে দিল। হেঁটে যেতে-যেতে সজল বলল, "কী করবি, রাজি হবি ?"

উজ্জ্বল বলল, "আগে মা'কে বলি।"

কেবিনে ঢুকে উজ্জ্বল দেখল সুশীলদা প্র্যাকটিস থেকে আগে বেরিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছেন। নীলিমাবউদিও মা'র পাশে বসে। উজ্জ্বল চারপাশে তাকিয়ে বলল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

হৈম বললেন, "কী কথা ?"

উজ্জ্বল একটু ইতস্তত করে ঘটনাটা বলল। হৈম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমায় কেন, তোর সুশীলদাকে জিজ্ঞেস কর। উনি কী বলেন।"

উজ্জ্বল সুশীলদার মুখের দিকে তাকাল। সুশীলদা উজ্জ্বলের মাথায় হাত রাখলেন। ওর চুলের মধ্যে সুশীলদার হাতের আঙুল বিলি কাটছে। নরম গলায় থেমে-থেমে সুশীলদা বললেন, "আমি নিজেও সাধারণ মধ্যবিত্ত। আমার যদি টাকা থাকত, তা হলে জোর করে কিছু বলতে পারতাম। অবনী দত্তর অনেক টাকা। ছ'হাজার টাকা ওঁর কাছে কিছুই না। ওঁর টাকাটা পেলে বউদির অপারেশন হয়ে

যাবে। এবার তোরা ভেবে দ্যাখ।"

সুশীলদার গলা শেষের দিকে ভিজে এল। সুশীলদা সরে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চোখ রাখলেন। রেল-ইয়ার্ডের ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় বাইরের আকাশটা ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে।

উজ্জ্বল হৈমর কাছে সরে এল। মা অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে। উজ্জ্বল বলল, "হাসপাতালের গেটে অবনী দত্ত গাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আমি গিয়ে বলে আসি?"

হৈম বলল, "কী বলবি?"

উজ্জ্বল বলল, "বলব, আমরা রাজি।"

হৈমর পাণ্ডুর মুখ মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল। কঠিন চোখে তাকিয়ে আদেশের গলায় বললেন, "না। আমি মরে যাব, তবু এ-জিনিস হতে দেব না। ফুটবল তো তোদের মা। লোভে পড়ে সেই মা'কে বিক্রি করতে তোদের লজ্জা হচ্ছে না। এই মা'কেই তো একদিন অপমানিত হয়ে টেন্ট থেকে ফিরতে হয়েছিল। সেই অপমানের বদলা নিবি না। আমি হয়তো মরব, কিন্তু সেই মরণটাও যেন সুখের হয়। তাতে যেন অপমানের কালিমা না থাকে। তোরা মায়ের মতো ভালবেসে যতদিন ফুটবল খেলবি, আমি ততদিন তোদের সঙ্গে-সঙ্গে বেঁচে থাকব। তোদের খেলার মাঠের ঘাসের বুকে আমি প্রতিদিন নতুন করে জন্ম নিতে চাই। তোরা আমাকে অপমানে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিস কেন?"

হৈমর চোখ ভাসিয়ে জল গড়িয়ে এল। নীলিমা সেই জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি শান্ত হন বউদি। ওরা ছেলেমানুষ।"

হৈম দু'হাত তুলে ছেলেদের কাছে ডাকলেন। ওদের মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভালবাসার জিনিস, সাধনার ধন নিয়ে ব্যবসা চলে না। যে সওদা করতে এসেছে,তাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আয়। বলবি, আমার মা মরতে জানে, কিন্তু অপমান আর অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে শেখেনি।"

অবনী দত্ত গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব শুনে বললেন, "এই অহঙ্কারের জন্যে অনুতাপ করতে হবে। আমি ব্লু স্টারের ছেলেদের ফাইনালে মাঠে নামাব। দেখব সুশীল ভট্টাচার্য আর অংশু হালদারের হিম্মত কতখানি! তোমার মা'র জেদটাও আমার মনে থাকবে।"

॥ বারো ॥

দুর্গাপুর স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলার আয়োজন দেখে উজ্জ্বলের মনে হল, যেন আই· এফ· এ· শিল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গ্যালারিতে অনেক লোক। উৎপল বোধহয় ঘোলা আর সোদপুর থেকে প্রায় দুশো ছেলে নিয়ে চলে এসেছে দুর্গাপুরে। পানাগড় স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তারা সবাই এখন মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের পক্ষে। গতবারের ফাইনালে পরাজিত বার্নপুরের নবোদয় কী এক অজ্ঞাত কারণে ফাইনালের দিন মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের সমর্থক হয়ে গেল। ওদের সেক্রেটারি দুপুরবেলা এসে সুশীলদাকে বলে গেলেন, "আজ মিতালিকে হারাতেই হবে। গতবার আমরা লড়াই করে হেরেছি। ওরা তো কলকাতার বাছা-বাছা খেলোয়াড় এনে ফাইনালে খেলায়। এবার আরও আনবে। তিনবার ওদের কাপ নেওয়া আটকাতেই হবে।"

মাঠে এসে খবর পাওয়া গেল ব্লু স্টারের ফার্নান্ডেজ, দীপক শেঠ, গৌতম আর পার্থ দে মিতালির হয়ে খেলবে। তা ছাড়া যুব'র প্রভাস, কানাই আর মন্টু কর্মকার তো আছেই।

অতনু বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, "প্রভাসটা সব জায়গাতেই আছে। অবনী দত্তর পা চেটে-চেটে ও খেলোয়াড় হবে।"

জার্সি পরে সবাই লাইন করে দাঁড়াবার পর সুশীলদা আর অংশু হালদার ওদের সামনে এলেন। সুশীলদা বললেন, "আজ সেই প্রতিশোধের দিন। উজ্জ্বল আর সজলের সেই বদলা নেওয়ার পালা। আমি আশা করব, একজন খেলোয়াড় খেলার মাঠে যেভাবে তার অপমানের প্রতিশোধ নেয়, তোমরা সেইভাবে নেবে। অর্থাৎ ভাল খেলে, জীবনপণ করে লড়াই চালিয়ে তোমরা জয় ছিনিয়ে আনবে। তোমরা জিতলে অংশুর অপমানের জ্বালা জুড়োবে। আমি জানব, তোমরা তোমাদের মহৎ জেদ আর কঠিন সংকল্পকে মর্যাদা দিতে শিখেছ।"

সবাই সুশীলদা আর অংশুদাকে প্রণাম করে মাঠে নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। সুশীলদা উজ্জ্বল আর সজলকে লাইন থেকে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, "তোদের মা হাসপাতালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। তোদের বাবার নামে ক্লাব তৈরি করেছি। আজ নিজেদের উজাড় করে দিয়ে আঘাত হান্। তোর মা'র অপমান, আমার অপমান, তোদের প্রতি অন্যায়—সবকিছুর বিরুদ্ধে তোদের সব শক্তি আজ মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে দে। মনে রাখিস হৈমবউদি তোদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবেন। আর গ্যালারিতে থাকবেন মণিদা। মা আর মৃত বাবার প্রতি তোদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানাবার আজকেই পরম লগ্ন। তোরা আগুনের মতো জ্বলে উঠে মায়ের মুখ থেকে অপমানের অন্ধকার সরিয়ে দে।"

সুশীলদার গলা আবেগে জড়িয়ে গেল। থরথর গলায় তিনি বলে উঠলেন, "লিঙ্কম্যান, তোমার অ্যাটাক দিয়ে প্রতিপক্ষের অ্যাটাককে ভেঙে দাও। স্ট্রাইকার, ডিফেন্স ভাঙো, অ্যাটাকে যাও, অ্যাটাকে।"

সুশীলদার গলা বজ্রের মতো গমগম করে কেঁপে উঠল। ওরা ছুটতে ছুটতে মাঠের মধ্যে ঢুকে দেখল গোটা মাঠ জুড়ে মায়ের চোখের মতো মমতাময় আলো। মিতালির ক্যাপ্টেন ফুলের তোড়া নিয়ে সেন্টার-লাইনে ছুটে আসছে।

খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে অতনু ব্যাকপাস করে উজ্জ্বলকে বল দিল। গ্যালারি জুড়ে অন্তত দুশোটা গলা উজ্জ্বলের নাম ধরে চিৎকার করছে। উজ্জ্বল দেখল বাঁ দিকের কোণ থেকে ফার্নান্ডেজ জায়গা বদলে তার দিকে ছুটে আসছে। উজ্জ্বল কয়েক পা ছুটে গিয়ে আগুয়ান প্রভাসের মাথার ওপর দিয়ে বক্সে বল তুলল। খেলা শুরু হবার প্রথম মিনিটেই সেই সুযোগ নষ্ট করে ফেলল শ্যামল। বলটা বুকে করে নামিয়ে শট নিতে দেরি না করলে মিতালি এতক্ষণে এক গোলে পিছিয়ে পড়ত। খেলার প্রথম মিনিটের আচমকা আক্রমণ সামলে উঠে মিতালি তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে উঠে আসতে চাইল। অবনী দত্তর বেতের চেয়ারের চারপাশে জনা-দশেক লোক দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল ওদের ব্লু স্টারের টেন্টে সবসময় অবনী দত্তের চারপাশে মাছির মতো ভনভন করে বহুবার ঘুরতে দেখেছে। ফার্নান্ডেজ বল নিয়ে তার দৌড় শুরু করবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই জনা-দশেক লোক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল। ফার্নান্ডেজ ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসে দীপককে থ্রু বাড়াল। জমির দেড় বিঘত ওপর দিয়ে বল ছুটে যাচ্ছিল দীপকের দিকে। দীপককে আটকাবার জন্যে ছুটে আসছে মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের স্টপার কল্যাণ। উজ্জ্বল আর দীপকের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। এখান থেকে ছুটে গিয়ে বলের নাগাল পাওয়া সাধ্যাতীত। ফার্নান্ডেজ খুব বুদ্ধি করে বল বাড়িয়েছে দীপককে। দীপক আর কয়েক পা ছুটে এলেই বলের নাগাল পেয়ে যাবে। শিবু গোল ছেড়ে এগিয়েছে। বল মাটি স্পর্শ করবার আগেই দীপক বাঁ পায়ে গোলে শট নিল। শিবুর বাঁ দিকে দিয়ে ফাঁকা গোলের দিকে বল উড়ে যাচ্ছিল। মিতালির লোকেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ফাঁকা গোলের সামনে দু'পাশে হাত মেলে বাজপাখির মতো শূন্যে লাফিয়ে উঠছে

মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের লিঙ্কম্যান। মাটি থেকে অনেকটা লাফিয়ে উঠে বলে মাথা ঠুকল উজ্জ্বল। হতভম্ব দীপকের দু'হাত দূর দিয়ে সেই বল উড়ে গিয়ে শ্যামলের পায়ে জমা পড়তেই দুর্গাপুরের স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে হাততালি বাজতে লাগল।

হাফ-টাইম পর্যন্ত দু'দল পাঞ্জা কষে লড়াই করল। মিতালি এই একবার ছাড়া গোলের তেমন সুযোগ পায়নি। মণীন্দ্র মেমোরিয়াল হাফ-টাইমের আগে আরেকটা সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। অতনু আর শ্যামলের পা ঘুরে বল এসেছিল সজলের কাছে। মিতালির রাইট-স্টপার গৌরাঙ্গকে বোকা বানিয়ে সজল গোলের সামনে গিয়েও বলটা ঠিকমতো প্লেস করতে না পেরে বল তুলে দিল গোলকিপার সন্দীপ মজুমদারের হাতে।

হাফ-টাইমে সুশীলদা এসে সজলকে বললেন, "জুন মাসের সেই দিনটার কথা তোর মনে আছে ? যেদিন তোর মা তোদের জন্য অবনী দত্তর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ? সেদিন সেই অপমানের বদলা নেবার জন্যে তোরা একটা সুযোগ চেয়েছিলি। কিন্তু সুযোগ পেয়েও বদলা নিতে পারছিস না। মনে রাখিস, তোর মা'র মুখে এখনও অপমানের কালো চিহ্ন লেগে আছে। তোদের হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট।"

সজল সুশীলদার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। লজ্জায় তার মন ছেয়ে আছে। ভেতরে একটা ছটফটানি অনুভব করতে পারল সে। অংশু হালদার আর সুশীলদা বললেন, "ফার্নান্ডেজ আর দীপককে আরও কড়া পাহারা দিতে হবে। পার্থ আর গৌতমকে বল ধরে এগোতে দিলেই বিপদ। ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং করে খেলতে না পারলে জিততে পারবি না। অতনু আর উজ্জ্বল যখনই অ্যাটাকে উঠে যাবে, কিংবা সজল আর শ্যামলের সাহায্যের জন্যে ওদের পাশে যাবে তখনই বলাই, সঞ্জয় আর লিটনকে নিজেদের এলাকা পাহারা দেবার জন্যে নেমে আসতে হবে। খেলাটা যেভাবে হচ্ছে তাতে বল ধরে চারদিকে দেখে বল দেবার সুযোগ নেই। ওদের ডিফেন্সকে পজিশন নিতে দেবার সময় দিলেই তোদের অ্যাটাকে কোনও কাজ হবে না। গোলে আচমকা চলতি বলে শট নিতে হবে।"

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই মিতালির ডিফেন্স-সুদ্ধু ওপরে উঠে এল। তার মানে মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের বক্সের মধ্যে খেলাটাকে রাখতে চাইছে মিতালি। অতনু উজ্জ্বলকে বলল, "বক্সের মধ্যে থেকে বল পেয়ে লম্বা কিকে ক্লিয়ার করতে না পারলে গোল খেয়ে যাব। ওরা চাপ রাখতে চাইছে।"

শ্যামল আর সজল পিছিয়ে এসেছিল। উজ্জ্বল ওদের পিছিয়ে আসতে বারণ করল। ঠিক এগারো মিনিটের মাথায় গৌতমের ব্যাকপাস থেকে বল পেয়ে ফার্নান্ডেজ আচমকা গোলে শট নিয়েছিল। বারের তলা ছুঁয়ে চলে যাবার মতো বিপজ্জনক শট। শিবু ঠিক সময়ে লাফিয়ে উঠে সেই বল ধরে নিয়ে হাতে করে ছুঁড়ে দিল উজ্জ্বলের পায়ের সামনে। উজ্জ্বলের একপাশে গৌতম আর একপাশে দীপক, ব্লু স্টারের দুই বিখ্যাত স্ট্রাইকার। বল পায়ে পড়তেই তার বুকের মধ্যে থেকে মা কথা বলে উঠলেন। যেন মাঠের প্রতিটি ঘাসের তলা থেকে ভেসে উঠল মায়ের চোখ। অপমানে পাণ্ডুর সেই চোখ বলে উঠল, 'অ্যাটাক-অ্যাটাক।'

উজ্জ্বল বল নিয়ে তীরের বেগে ছুটে গেল। ওর পাশে-পাশে ছুটছে মিতালির দুই বিখ্যাত স্ট্রাইকার। উজ্জ্বল সহসা থেমে গিয়ে ছুটন্ত গৌতমের পেছন দিক দিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে এসে ফার্নান্ডেজকে

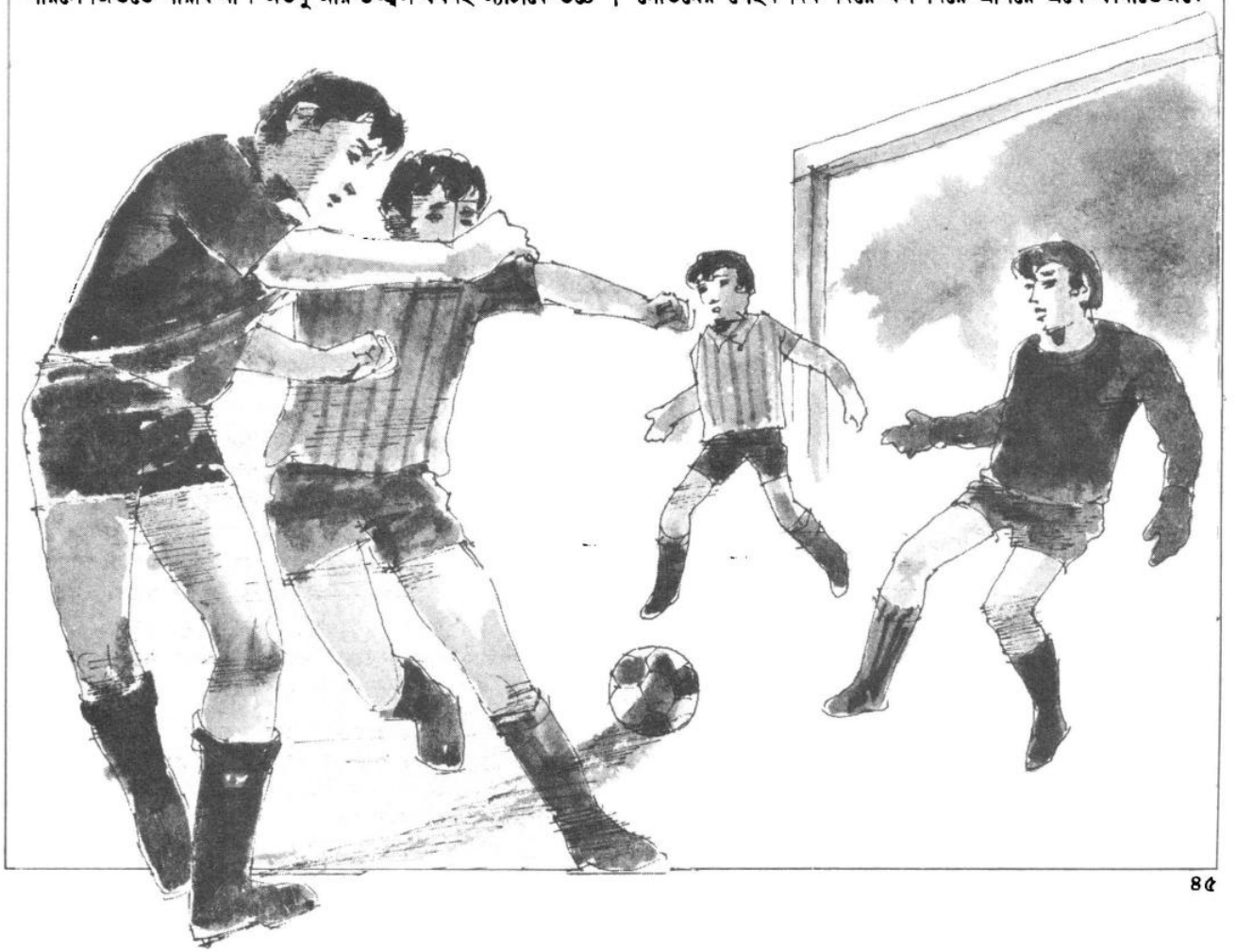

বিদ্যুৎগতিতে টপকে গিয়ে বল ঠেলে দিল অতনুকে। অতনুকে আটকাবার জন্যে প্রভাস এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওকে আটকানো প্রভাসের সাধ্যের বাইরে। বক্সের মাথায় উঠে এসেছে সজল। তার ওপর মিতালির রাইট স্টপারের কড়া নজর। অতনু বল ঠেলে দিল আবার উজ্জ্বলকে। উজ্জ্বল বল নিয়ে বক্সের কোনায় সজলের জায়গায় দৌড়ে যেতেই গৌরাঙ্গের মুখোমুখি হল। সজল ততক্ষণে সরে গেছে অনেকটা বাঁয়ে। উজ্জ্বল বক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বাঁ পা দিয়ে বল ঠেলে দিল সজলকে। লেফট স্টপার তার জায়গা থেকে সরে আসবার আগেই চলতি বলে সজল শট নিল। এবার তার হিসেবে ভুল হয়নি। মিতালির গোলকিপার সন্দীপ মজুমদারের বাঁ দিকের দুর্বলতার কথা অংশুদা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সজল বাঁ দিকে ফাঁকা জায়গা দিয়ে বল পাঠাল। সন্দীপ এতটা ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল যে, তার পক্ষে অতটা জায়গা কভার করা সম্ভব হয়নি। বল নেটে গিয়ে ধাক্কা খাবার পরেও সজল বিশ্বাস করতে পারছিল না সত্যিই তার পা থেকে গোল এসেছে।

গ্যালারি থেকে কাঁসর আর ঘন্টা বেজে উঠল। দুমদাম্ পটকা ফাটতে লাগল গ্যালারির মাথায়। মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের ছেলেরা দু'হাত মেলে সজলকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। সজল নেটের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলল, 'আমি পেরেছি মা, আমি তোমার মুখ থেকে অপমানের চিহ্ন মুছে দিতে পেরেছি।'

গোল খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য তেতে উঠেছিল মিতালি। কিন্তু উজ্জ্বল আর অতনুর সঙ্গে বলাই, সঞ্জয় আর লিটন মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের ডিফেন্সকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। ফার্নান্ডেজের পায়ের ওপর থেকে উজ্জ্বল বল তুলে নেবার সময় পেছন থেকে হাত চালিয়েছিল ফার্নান্ডেজ। গ্যালারি থেকে সেই দৃশ্য দেখে সবাই ফার্নান্ডেজকে লক্ষ্য করে নানারকম আওয়াজ দিতে লাগল।

অবনী দত্ত তার দলবল নিয়ে যেখানে বসে ছিলেন, সেখান থেকে বল নিয়ে উজ্জ্বল যখন দু'হাত ওপরে তুলে থ্রো করতে যাচ্ছে তখন তার কাঁধে একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়েছিল কেউ। উজ্জ্বল পেছন ফিরে দেখেছিল অবনী দত্তর চোখ তার দিকে। গোল খাওয়ার পর মিনিট-সাতেক খেলা হতেই মিতালি এলোপাথাড়ি ফাউল করতে আরম্ভ করল। সজল আর শ্যামলকে পেছন থেকে দু'বার বিশ্রীভাবে ট্যাকল করল গৌরাঙ্গ। উজ্জ্বলকে পেছন থেকে ট্যাকল করে মাঠের বাইরে ছিটকে ফেলে দিল দীপক। উজ্জ্বল বুঝতে পারল, মিতালি গায়ের জোরে খেলার দখল নিতে চাইছে। ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইছে মণীন্দ্র মেমোরিয়ালকে। বাবার গায়ে যেমন জার্সি ছিল, সেই রঙের জার্সি তার গায়ে। তার বাবা তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছেন। মাঠের ঘাসে-ঘাসে মায়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ আর প্রেরণা। উজ্জ্বল ভয় পেল না। নাকের রক্ত মুছে নিয়ে মনে-মনে বলল, 'শরীরের সব রক্ত নিংড়ে দেব, তবু হারব না। আমি খেলছি আমার মায়ের জন্য। ওই কালো ফুটকি দেওয়া বলটা আমার মা'র স্বপ্ন দিয়ে গড়া।'

রেফারি ঘড়ি দেখলেন। সময় শেষ হয়ে আসছে। মিতালি মরিয়া হয়ে খেলার দখল নিতে চাইছে। মাঝ-মাঠে উঠে এসেছে মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের খেলোয়াড়রা। গোটা মাঠ জুড়ে চিৎকার আর উত্তেজনার মধ্যে অতনু হঠাৎ গৌতমের পাশ কাটিয়ে সাইডলাইন ধরে বল নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। গ্যালারি থেকে জোয়ারের মতো মাঠের ওপর আছড়ে পড়ছে উত্তেজিত চিৎকার। প্রভাসকে ডিঙিয়ে বক্সের মাথা থেকে অতনু বল দিল শ্যামলকে। শ্যামল মুহূর্তের মধ্যে ছুটে আসা সেই বল সজলের দিকে বাড়াল। মিতালির দু'জন সজলের দু'দিক থেকে বাধা দিতে এগিয়েছে। সজল ছুটে-আসা বলের ওপর পা না ঠেকিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। বল তার পায়ের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে জানে, এই বল কোথায় কোন্ ঠিকানায় যাবে। সজলকে লাফিয়ে উঠতে দেখে মিতালির গোলকিপার সন্দীপও হঠাৎ বাঁ দিকে সরে গেল। ডান দিকের ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাটি কামড়ে তখন বল ঢুকছে গোলের মধ্যে। সন্দীপ কিংবা গৌরাঙ্গ কেউই বুঝতে পারেনি সজল বলটা লাফিয়ে উঠে ছেড়ে দিচ্ছে। তার লাফানো শরীর আড়াল করে রেখেছে সন্দীপের মুখ। আর পেছন থেকে ছুটে এসে সেই বলে শট নিয়েছে উজ্জ্বল। শিয়ালদা মাঠে অনেক কানমলা আর বকুনি খেয়ে যে জিনিসটা দু'ভাই রপ্ত করেছিল, আজ তার সার্থক প্রয়োগ করতে উজ্জ্বল দৌড়ে গিয়ে প্রথমেই সজলকে জড়িয়ে ধরল।

মিতালির খেলোয়াড়রা যখন নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করছে, ঠিক তখনই রেফারি খেলা শেষের লম্বা বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। গ্যালারি থেকে পিলপিল করে লোক নেমে আসছে মাঠে। উজ্জ্বল ভিড়ের মধ্যে থেকে ছুটে বাইরে এসে দেখল, অবনী দত্তর চেয়ার ফাঁকা। মিতালির ছেলেরা মাথা নিচু করে নিজেদের শিবিরে ফিরে যাচ্ছে।

উজ্জ্বল সেন্টার লাইনের ওপর বসল। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার ভঙ্গিতে নিচু হয়ে আস্তে-আস্তে বলল, "মা, তুমি এবার মুখ তুলে তাকাও। আমরা তোমার অপমান মুছে দিতে পেরেছি। এবার তোমার প্রসন্ন মুখ তুলে আমাদের দিকে একবার তাকাও।"

উজ্জ্বল জার্সি খুলে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বাবার কথা ভাবল। তার মনে হল, বাবার স্পর্শ তার বুকে লাগছে। চোখ তুলে চারপাশে তাকাতে গিয়ে সে বোবা হয়ে গেল। সুশীলদা আর নীলিমা বউদি তার দিকে ছুটে আসছেন। উজ্জ্বল উঠে দাঁড়াল। নীলিমা বউদি এগিয়ে এসে বললেন, "উজ্জ্বল, দেখবে এসো, এ-দৃশ্য তোমার দেখা উচিত।"

ওঁদের সঙ্গে এসে উজ্জ্বল দেখল, মণীন্দ্র মেমোরিয়ালের ছেলেরা তার বাবার ফোটোর সামনে জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা থেকে প্রাইজ দেবার জন্যে এসেছিলেন শৈলেন মান্না আর তুলসীদাস বলরাম। ওঁরা ধীরে পায়ে এগিয়ে এসে সুশীলদাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সুশীলদা একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, "আমার অ্যাপিলে কাজ হয়েছে। কলকাতার তিনটে বড় ক্লাব তোদের মায়ের অপারেশনের জন্য ছ'হাজার টাকা দিয়েছে। আজই সেই টাকা পেয়ে যাবি। আর···।

সুশীলদা থেমে গিয়ে শ্যামলের দিকে তাকালেন। শ্যামল বলল, "উজ্জ্বলের মা আমাদেরও মা। বাবা তোদের খেলা দেখে দু' হাজার টাকা তোদের দিতে চায়। তোরা আপত্তি করিস না।"

উজ্জ্বলের চারপাশে যেন স্বপ্ন নেমে এল। মনে হল, একটা স্বপ্ন ভালবাসার চেহারা নিয়ে বটের ঝুরির মতো তাকে ঘিরে রেখেছে। তার বুকের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হতে থাকল। সুশীলদার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ঝাপসা চোখে স্বপ্নের মতো ঘটনাগুলো ঘটে যেতে দেখল উজ্জ্বল। শৈলেন মান্না এখন তার মাথায় হাত রেখেছেন। তার শরীর ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

দু'চোখে জল নিয়ে সে অস্ফুটে বলল, "মা, হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে তুমি কি এসব দেখতে পাচ্ছ?"

[এই কাহিনীটি আদ্যন্ত কাল্পনিক। অধিকাংশ চরিত্রও মনগড়া। শুধু কাহিনীটিকে কিছুটা বাস্তবের চেহারা দেবার তাগিদে কিছু-কিছু খেলোয়াড় এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হয়েছে, যা বাস্তব। এই বাস্তবতা শুধুই গল্পের প্রয়োজনে।]

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ফোটো : বরুণ বিশ্বাস

আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন

বিশ্বরূপ সেন

প্রাণিবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কীট-পতঙ্গ হল পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন থেকে শুরু করে ব্যবহারের বৈচিত্র্য পর্যন্ত সবকিছুই বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছে। এই কীট-পতঙ্গদের পয়লা নম্বরের শত্রু হল পতঙ্গভুক প্রাণীরা। আর-দশটা প্রাণীর মতো এদের তো আর শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা নেই! তাই এরা বেছে নিয়েছে অন্য পথ।

আফ্রিকায় 'লিমাকোডিডিয়ার' নামে এক ধরনের ঘন সবুজ রঙের শুঁয়োপোকা আছে। এদের আকৃতি একেবারে পাতার মতোই। গাছের ডালে এরা এমনভাবে বসে থাকে, যাতে দূর থেকে ঠিক পাতা বলেই মনে হয়। কোনও শত্রু এদের এই চালাকি ধরে ফেললেও এরা ঘাবড়ায় না, কেননা, শত্রুকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যে এদের সারা শরীরে ঢাকা থাকে বিষাক্ত কাঁটা-যুক্ত লোম। তবে ভারত ও মালয়েশিয়ার 'ক্যালিমা ইমাচুস' নামের প্রজাপতির গায়ে অবশ্য কাঁটা থাকে না, কিন্তু বিপদ বুঝলে ডানা দুটোকে এমন সুন্দরভাবে উঁচু করে গাছের ডালে বসে থাকে যে, তাদের পাতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। শত্রুদের বোকা বানানোর ব্যাপারে 'ফাইলিয়াম বায়োকুলেটাস'-এর জুড়ি মেলা ভার। এদের গায়ের রঙ সবুজ পাতার মতো তো বটেই, সমস্ত শরীরে রয়েছে পাতার মতো শিরা ও উপশিরা। আর মুখের অংশটিকে দেখলে পাতার বোঁটা বলেই ভুল হয়।

আবার এশিয়া আর ইউরোপের 'এগ্রিগাস কনভলভিউলি' নামের মথকে দেখতে একেবারে গাছের ছালের মতো। বিপদ বুঝলেই এরা গাছের পুরনো ডালে এসে বসে পড়ে। গাছের ছালের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এত মিল যে, শত্রুরা গাছের ছাল আর তাদের শিকারকে আলাদা করে চিনতেই পারে না। ইউরোপ আর আফ্রিকার 'ওলিয়েণ্ডার' মথের গায়ের রঙ অবশ্য একটু রঙচঙে। এজন্যে তারা ঘুরে বেড়ায় রঙিন ফুলের বাগানে, যাতে ফুলের মধ্যে নিজেদের খুব সহজেই লুকিয়ে ফেলা যায়।

ফ্রান্সের 'বাফটিপ' মথের ডানার রঙ একেবারে শুকনো কাঠের মতো। শত্রুর গন্ধ পেলেই এরা কোনও গাছের ডালে এসে এমনভাবে বসে যে, এদের দেখে সেই গাছের শুকনো ডাল বলে ভুল হয়।

'সিনটোমিড্‌স্' মথের শরীরে আঁকা থাকে কালো আর হলুদ রঙের দাগ। এদের ডানা একেবারে স্বচ্ছ। যার ফলে এরা শিকারির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য সময় বুঝে নিজেদের শুকনো পাতার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। আফ্রিকা আর দক্ষিণ ফ্রান্সের 'এমপিউসা' নামের পতঙ্গরা দেখতে একেবারে শুকনো ডালের মতো। অবশ্য ইউরোপের 'কোমা' মথ দেখতে বেশ উজ্জ্বল, ফলে খুব সহজেই শত্রুদের নজরে পড়ার আশঙ্কা বেশি; তবে এরা পাতার ওপর ডানা দুটিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে বসে থাকে, যাতে শুকনো পাতা বলেই মনে হয়।

কিন্তু ফ্রান্সের 'জিওমেট্রিডিয়া'র রকমসকম একটু আলাদা। এরা গাছের সঙ্গে লেগে থাকে একেবারে শাখাপ্রশাখার মতো। তাদের শরীরের কাঁটাগুলোকে দূর থেকে মনে হয় পাতার মতো।

'কিউনিকুলা ইমব্রিগা'র রঙের লম্বা-লম্বা পা আর শরীর দেখে যে-কেউই শুকনো ডাল ভেবে ভুল করবে।

এ ছাড়া মথের ডানায় ছোট-ছোট কাঁটার মতো সূক্ষ্ম একরকম জিনিস থাকে—যা মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। টিকটিকি বা মথ-শিকারি কোনও প্রাণী যদি ভুলক্রমে মথের ডানা কামড়ে ধরে, তা হলে ওই কাঁটাগুলো তাদের গলায় এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি করে। অনেকটা বুনো ওল খেয়ে গলা চুলকুনির মতো। সেই জন্যেই শিকার ধরতে শিকারিদের কিছুটা কষ্টও সহ্য করতে হয়।

এরকমই অনেক কীট-পতঙ্গ পাওয়া যাবে যারা শত্রুর নজর থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখবার জন্যে নানা পথ বেছে নিয়েছে। এদের বাহাদুরি এমনই যে, শত্রু তো দূরের কথা, এইসব কীট-পতঙ্গ নজরে আনতে বিজ্ঞানীরা হিমশিম খেয়ে যান। এদের বিচিত্র গঠন এবং বিচিত্র ব্যবহার সম্পর্কে আরও মজার-মজার তথ্য জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডোবা জাহাজের রত্ন উদ্ধার

চঞ্চল পাল

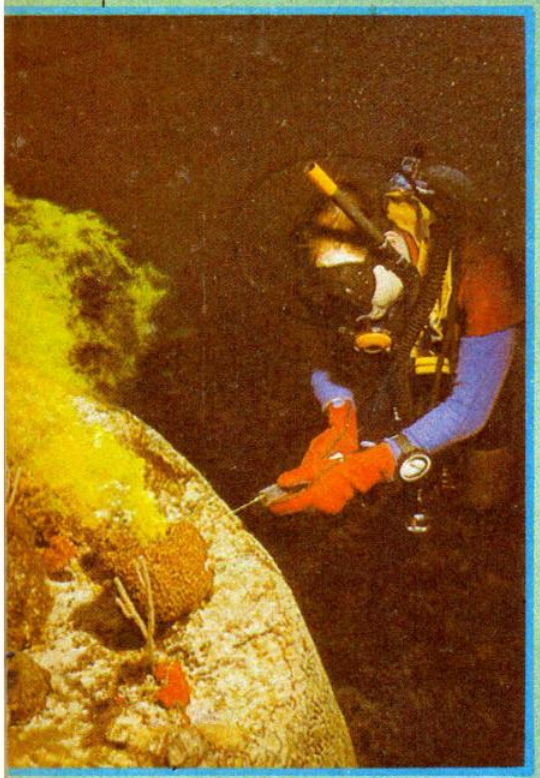

রত্ন-উদ্ধারের কাজে ডুবুরিরা জলজ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে

উত্তাল সমুদ্র ফুঁসছে যুগ-যুগ ধরে। তবু মানুষ পরোয়া করেনি, সমুদ্র পেরিয়ে দেশে-দেশে পাড়ি দিয়েছে, সমুদ্রকে জয় করেছে রোমাঞ্চের নেশায়। ঝড় ওঠে, জাহাজে আগুন লাগে, বিস্ফোরণ ঘটে, ধাক্কা মারে ডুবো পাহাড়ে, বিগড়ে যায় যন্ত্রপাতি। বিপদের শেষ নেই। আর যুদ্ধের নেশায় কখনও-কখনও নিজের সৃষ্টিকে নিজেই ধ্বংস করে মানুষ। তখন গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যায় জলযানগুলো। শুধু কি জাহাজ আর সাবমেরিন? সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে একই বিভীষিকার শিকার হয় উড়োজাহাজগুলোও। বহু অর্থ আর পরিশ্রমে গড়া সেইসব যন্ত্রযানে হয়তো থাকে রত্নভাণ্ডার, বাণিজ্যিক সামগ্রী বা অমূল্য সব নথিপত্র। তবে হা-হুতাশ করে বসে থাকার পাত্র নয় মানুষ, চেষ্টা চালায় ফিরে পেতে হারিয়ে যাওয়া সেইসব অমূল্য জিনিসপত্র। এভাবেই গড়ে ওঠে এক নতুন বিজ্ঞান, জলের নীচে থেকে রত্নসামগ্রী উদ্ধার করার প্রযুক্তিগত কৌশল—ইংরেজি নাম যার 'আণ্ডারওয়াটার স্যালভেজ'।

এই কৌশলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দরকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতা। প্রকৃত উদ্ধারকার্য শুরু হওয়ার আগে মাথা খাটাতে হয় কীভাবে এগোতে হবে। অনেক সময়েই

উদ্ধার-করা মূল্যবান নানা জিনিসপত্র। জুতো, টি-পট ও ঘণ্টাটিও কয়েক হাজার বছর সমুদ্রতলে কাটিয়েছে

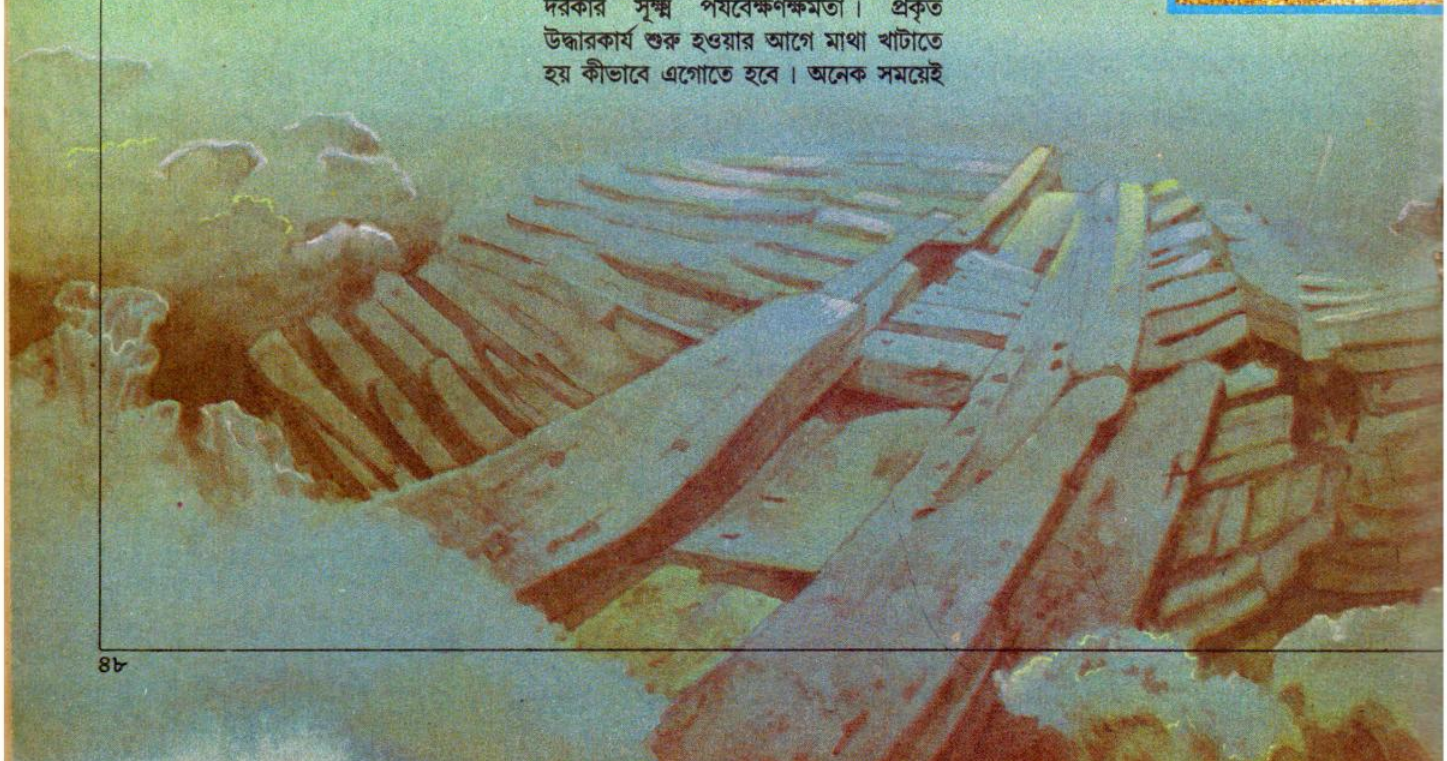

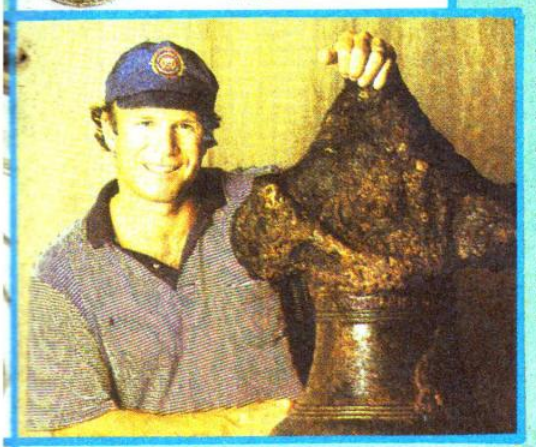

সাধারণ মানুষের কাছে এটা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, মনে হতে পারে বোকামিও। কিন্তু এরকম গোলমেলে ব্যাপার বলেই একটা জাহাজ উদ্ধার করতে বছরের পর বছরও ঘুরে যায়। যেমন ধরা যাক, 'লরেন্‌টিক্‌' ও 'ইজিপ্ট' নামে দুটি জাহাজের কথা।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তর দিকের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল লরেন্‌টিক্‌, যার ভেতর থরে থরে সাজানো ছিল সোনার বাট। তখনকার দিনের হিসেবমতোই, এই সোনার দাম ছিল পাঁচ কোটি টাকা। কিছুদিন বাদে শুরু হল জরিপের কাজ, অর্থাৎ সমুদ্রতলের ঠিক কোথায় জাহাজটা ডুবে রয়েছে তা জানার উদ্যোগ। তারপর নামানো হল ডুবুরিদের। জাহাজের যে-ঘরটায় সোনা ছিল, প্রধান দরজাটা তাঁরা খুঁজে বার করলেন বটে, কিন্তু তা খোলার চেষ্টা করলেন না। বরং ঘরের অনেকটা দূরে একটা দরজার কব্জাগুলো আস্তে-আস্তে খুলে ফেলে, দরজাটার পুরোটাই তাঁরা জলের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা উদ্ধারকারী জাহাজে (রেসার) তুলে নিয়ে এলেন। তারপর খোলা দরজা আর সোনার ঘরটার মাঝে পড়ল রক্ষীদের ঘর ও মাল রাখার গুদাম। এই দুই বাধা তাঁরা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে নিলেন।

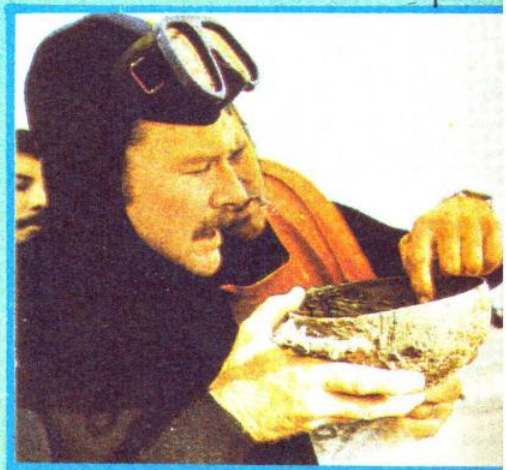

৩৪০০ বছর সমুদ্রের নীচে পড়ে ছিল এই ধাতব পাত্রটি

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

আডভেঞ্চার-ফিল্ম 'রেইজ দি টাইটানিক'-এ অভিশপ্ত জাহাজটির মডেল ▲
ডুবুরির কাজ যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বিপজ্জনক

অনেকে বলতে পারেন, এত ঝামেলার দরকার কী? ঘরের বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকলেই তো হত। আসলে, বড় দরজাটা যদি একবার বন্ধ হয়ে যেত, তা হলে জলের চাপের বিরুদ্ধে সেই দরজা আবার খুলে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। তা ছাড়া প্রধান দরজাটা উড়িয়ে দিতে গেলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানো দরকার, তাতে সোনার বাটগুলোই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে এই বাটগুলোর আর নাগাল পাওয়া যেত না।

এই নতুন তৈরি-করা সুড়ঙ্গ দিয়ে ডুবুরিরা প্রায় আশি হাজার টাকার সোনা উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু জলের চাপে ঘরের কাঠামো এমনভাবে দুমড়ে গিয়েছিল যে, আবার নতুন একটা রাস্তা তৈরির প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। এভাবে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁরা ৩২১১টি বাটের মধ্যে ৫৪২টি উদ্ধার করেন। এরপর এসে গেল হাড়-কাঁপানো শীত। উদ্ধারের কাজ স্থগিত রাখতে হল। কিন্তু বসন্তের শেষ দিকে আবার যখন কাজ শুরুর কথা, তখন দেখা গেল, জলের টানে আর প্রতিকূল আবহাওয়ায় লরেন্‌টিক্ বেশ কিছুটা সরে গেছে, ঘুরেও গেছে অন্য দিকে; তৈরি-করা সুড়ঙ্গের ওপর ভেঙে পড়েছে জাহাজের বহু অংশ। ফলে, আবার নতুন রাস্তা তৈরির পালা। শেষ পর্যন্ত বহুবার এমন ঝক্কি সামলে যখন মোট ৩১৮৬টি বাট উদ্ধার করা গেল, তখন বছরগুলো ঘুরে ১৯২৪ সালে গিয়ে পড়েছে।

১৯২২ সালের মে মাসে ডুবে গিয়েছিল 'ইজিপ্ট', একটি মালবাহী ফরাসি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। কিন্তু ডোবা জাহাজ সমুদ্রের তলায় ঠিক কোন্ জায়গায় পড়ে আছে, তা নির্ধারণ করতেই কেটে গেল দীর্ঘ ন' বছর। ১৯৩১ সালের মে মাসে উদ্ধারকারী জাহাজ 'আর্টিগ্‌লিও-২' শুরু করল উদ্ধারের কাজ। ডোবা জাহাজে ছিল প্রায় এক কোটি টাকার (তখনকার হিসেবেই) সোনা ও রুপো। কিন্তু এর বেশির ভাগটাই ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। বাট বেশি ছিল না। ফলে, মুদ্রাগুলো ছড়িয়েছিটিয়ে এমন অবস্থায় পড়ে ছিল যে, একটা একটা করে সেগুলো তুলে আনা ঠিক না। তাই এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার'। সোজা কথায়, এটির মোটা ফাঁপা বায়ুরোধক নল, পাম্পের সাহায্যে ভেতরটা বায়ুশূন্য করে রাখা থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে মুদ্রার ঘরটার সমস্ত দরজা জানালা তো বটেই, সামান্য ছিদ্রগুলো পর্যন্ত বুজিয়ে দেওয়া হল ডুবুরিদের সাহায্যে।

তারপর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের একদিকটা ঘরের ভেতরে নিশ্ছিদ্রভাবে ঢুকিয়ে আর-এক দিকটা উদ্ধারকারী জাহাজের ওপর রাখা একটা বিশাল ড্রামের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর বিস্ফোরকের সাহায্যে নলের দুটো বন্ধ মুখ ফাটিয়ে ফেলা হল। নলটা বায়ুশূন্য থাকার ফলে মুদ্রার ঘরের জল প্রবল বেগে উঠে আসতে লাগল, সঙ্গে উঠে এল ঘরের ভেতরের মুদ্রা, বালি আর ছোট-ছোট ভাঙা টুকরোগুলো। একেবারে সব মুদ্রা তো উঠে আসা সম্ভব নয়, তাই একবার ঘরের ছিদ্রগুলো খুলে জল ভরিয়ে দেওয়া হত, আবার সেগুলো বন্ধ করে ভ্যাকুয়াম দিয়ে জল টেনে তোলা হত। কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল চার বছর।

যদি দেখা যায় জাহাজের খোলটাকে কিছু মেরামত করে নিলেই আবার নতুন জাহাজ তৈরি করা যাবে বা যদি বোঝা যায় জাহাজের কাঠামো বা অন্যান্য উপকরণ ভেঙে অন্য কাজে লাগানো যাবে, কিংবা যদি দেখা যায় জাহাজের ভেতর বহুমূল্য বা গোপনীয় কিছু পারমাণবিক অস্ত্র ইত্যাদি রয়ে গেছে, অথচ আলাদাভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না, তা হলে তো পুরো জাহাজটাকেই তোলার দরকার হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালে ফরাসি যুদ্ধজাহাজ 'মেইলে ব্রিজে' আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে যায়। তাকে যখন তোলা হল তখন দেখা গেল শুধু খোলটাই জলের ওপরে ভাসছে। ডেকের ওপর ঘর, মাস্তুল, বারান্দা ইত্যাদি যা-যা ছিল, সবকিছু কেটে ফেলে দিতে হয়েছে। কারণ জাহাজ তোলার সময় তার ওজন যত কম হয় ততই ভাল। তার ওপর খোলটাই উদ্ধার করার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি।

ডোবা জাহাজটাকে দড়ি বেঁধে টেনে তোলার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাদের এককথায় বলে 'লিফ্‌টিং ক্র্যাফ্‌ট'। এগুলোর মধ্যে যেসব ভাসমান ক্রেন ও কপিকল ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু কারখানায় বা রাস্তা তৈরির কাজে অচল। অর্থাৎ এগুলো তৈরি করা হয় এই বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে নজর রেখেই। তা ছাড়া, টন-টন ওজনের প্রকাণ্ড জাহাজগুলোকে টেনে তোলা হয়, প্রায় ৯ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত স্টিলের তার এবং শেকল দিয়ে। ষাট মিটার লম্বা এই তারগুলোর ওজনই প্রায় এক টন। এই তার দিয়ে জাহাজটাকে জড়িয়ে ধরা এবং টান দেবার জন্যে যে শক্তির দরকার,

হাজার বছর আগেও

জলের নীচে প্রথম ডুবুরি নামে হয়তো মুক্তো খোঁজার তাগিদে। ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা হেরোডোটাসের পুঁথিতে আছে ডুবুরিদের মুক্তো খোঁজার কথা। ৩০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রোডিয়ান্ লিখেছিলেন, ডুবুরি হয়ে মুক্তো খোঁজাও একটা পেশার মধ্যে পড়ে। তার জন্যে নির্দিষ্ট মজুরিও বরাদ্দ করা ছিল। যেমন, ৮ কিউবিট (৪ মিটার) নামতে হলে ডুবুরিরা মুক্তোর এক তৃতীয়াংশ পেত, ১৬ কিউবিট নামতে হলে অর্ধাংশ পেত ইত্যাদি। মুক্তো খোঁজা ছাড়া অন্য কারণের কথা প্রথম পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের লেখায়। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট নাকি ডুবুরিদের আদেশ দিয়েছিলেন 'টায়ার' নামক বন্দরে জলের নীচে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিতে। সেটা ৩৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা। তখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কীরকম ছিল তা জানা যায়নি, তবে এটা অনুমান করা যায়, অতকাল আগেও ডুবুরিরা জলের নীচে নেমে কিছু কাজকর্ম করতে পারত।

এসব ডুবুরি যখন জলে নামত, তাদের গায়ে কোনও পরিচ্ছদ থাকত না। তাদের কাঁধে থাকত দুটো ভারী ঝোলানো পাথর। তারপর জলের তলায় নেমে চটপট কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে পাথর দুটো ফেলে দিত আর ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসত। তা ছাড়া বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে কয়েক মিনিট জলের নীচে থাকার ব্যায়ামও তারা শিখত।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পারস্য উপসাগরে ও সিংহলে ডুবুরি নামার কথা নথিবদ্ধ আছে। ওদের পরনে থাকত গাছের ছালের কৌপীন, নাকের গর্ত দুটো টিপে বন্ধ করা আর হাত ও পায়ের আঙুলে থাকত চামড়ার দস্তানা। ৬০ থেকে ৯০ ফুট গভীরে তারা নামতে পারত, কিন্তু একবার নেমে দু' মিনিটের বেশি থাকতে পারত না। একদিনে একজন ডুবুরি প্রায় তিরিশবার জলের তলায় নামত। এদের অনেকেই কয়েক বছর বাদে পঙ্গু হয়ে যেত।

তা যে শুধু বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সম্ভব তা বলাই বাহুল্য।

এতসব কাণ্ডের পরেও অনেক বিশাল-বপু জাহাজ বাগ মানে না। ১৯১৮ সালের ওরকনে দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে 'স্কাপা ফ্লো' উপসাগরে ডুবে গিয়েছিল গোটা-পঞ্চাশ জার্মান যুদ্ধজাহাজের একটা বহর। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ওই বহরের একটা ৭৫০ টনের ভি-৭০ ডেস্ট্রয়ারকে যখন টেনে তোলা হচ্ছিল, তখনই বাধল বিভ্রাট। ঝুলন্ত তারগুলো একটা-একটা করে ছিঁড়ে পড়তে লাগল। এমনকী, জাহাজটার ওজনের সামাল দিতে গিয়ে একটা ক্রেন প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ল। জাহাজটা ফের তলিয়ে গেল সমুদ্রের তলায়। এসব ক্ষেত্রে যা করা হয়, তা হল, উচ্চচাপে বাতাসকে পাম্প করে জাহাজের খোলে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাতে ভেতরের সমস্ত জল বেরিয়ে আসবে আর জলের নীচে জাহাজটার ওজনও কমে যাবে অনেকখানি। তখন তাকে টেনে তুলতে অত কষ্ট হবে না। সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতিতে বাতাসের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে 'পলিস্টাইরিন', দেখতে হোমিওপ্যাথিক বড়ির মতো। একে ফুটন্ত বাষ্প দিয়ে উত্তপ্ত করলে আয়তন বেড়ে যায় পঞ্চাশ গুণ। তাই খোলের ভেতরের জল সরাবার কাজে পলিস্টাইরিনের ব্যবহার জাহাজ উদ্ধারের কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।

জাহাজ উদ্ধারকারীদের আর-একটা মজার যন্ত্র হচ্ছে 'পনটুন'। নাবিকরা আদর করে ডাকেন 'ক্যামেল' বলে। বিশাল ডোবা জাহাজটাকে না হয় টেনে জলের ওপর ভাসানো যায় কিন্তু তাকে মেরামতের জন্য তীরে বা ডকে টেনে নিয়ে তো আসতে হবে। অথচ ভাঙাচোরা জাহাজটা ভাসতে ভাসতে তো আর আসতে পারবে না, তাই জাহাজটিকে পনটুনের ঘাড়ে তুলে দেওয়া হয়। পনটুনকে বলা যায় বিরাট একটা ফাঁপা সিলিণ্ডার, যার মধ্যে বাইরে থেকে ইচ্ছেমতো বাতাস বা জল ভরে দেওয়া যায়। এতে কোনও চালক-ইঞ্জিন নেই, কোনও জাহাজের সাহায্যেই টেনে নিয়ে যেতে হবে। ডুবে যাওয়া জাহাজ জলের ওপরে যখন কিছুক্ষণের জন্যে ভাসানো হয় কিংবা জলের কয়েক ফুট নীচে উঠে আসে, সেই সময় চার-পাঁচটা পনটুন জল ভর্তি করে জাহাজটার একেবারে গায়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। জলভর্তি অবস্থায় পনটুনগুলো জলের ওপর তলের ঠিক নীচে ডুবে থাকে। তারপর পনটুনের ভেতর জোর করে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে পনটুনগুলো ভাঙা জাহাজসুদ্ধ জলের ওপর ভেসে ওঠে। একটা ডিমকে খাড়াভাবে টেবিলের ওপর বসাতে গেলে ডিমের গায়ে যেমন দু-তিনটে কাঠের টুকরো হেলিয়ে দিলেই চলে, পনটুনের কাজও ঠিক সেইরকম ভাঙা জাহাজটাকে খাড়া করে ভাসিয়ে রাখা। ফলে জাহাজের আর হেলে পড়ার ভয় থাকে না। পনটুনগুলোর ওপর ভর করে এগিয়ে চলে।

ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধারের কাজে সবচেয়ে আধুনিক হাতিয়ার হচ্ছে 'সাবমারসিবল' বা ডুবো-নৌকো। এদের ঠিক সাবমেরিন বা ডুবো-জাহাজ বলা যায় না। এগুলো সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট, তা ছাড়া এর ভেতরে মানুষ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। এক-একরকম ডুবো-নৌকো এক-একরকম কাজের জন্যে তৈরি। 'পিসেস-১' ডুবো-নৌকো নামতে পারে ৪৬৫ মিটার পর্যন্ত, কিন্তু 'পিসেস-৫' নামের ডুবো-নৌকো ২০০০ মিটার জলের নীচেও কাজ করতে পারে। এই ডুবো-নৌকোগুলোতে প্রধানত দুটো ছোট-ছোট কুঠুরি থাকে। একটাতে একজন মানুষ শুয়ে শুয়ে নৌকোর বাইরের দৃশ্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নৌকোর সঙ্গে লাগানো যান্ত্রিক হাত নাড়াচাড়া করে। আর-একটা কুঠুরিতে থাকে নৌকোর যন্ত্রপাতি আর তেলের পিপে। নৌকোটাকে ঘিরে থাকে রবারের মতো নরম ঝোলা, যা কুঠুরি থেকে তেলে ভরিয়ে দিলে ফুলে যায় আর নৌকোর আয়তন বাড়িয়ে দেয়। আবার তেল খালি করে কুঠুরিতে পাঠিয়ে দিলে চুপসে গিয়ে আয়তন কমিয়ে দেয়। জলের নীচে নামতে হলে যান্ত্রিক উপায়ে ঝোলাগুলোকে চুপসে দিতে হয় আর ওপরে ওঠার সময় ক্রমশ তেলে ভরিয়ে নিতে হয়। তা ছাড়া এর ভেতরে থাকে টেলিফোন ও বেতারযন্ত্র, যা দিয়ে জলের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এর সঙ্গে লাগানো ভিডিও-ক্যামেরা চটপট জলের নীচে ছবি তুলে নেয়। আর কোনও কিছু টুকে নেবার দরকার হলে, খাতাপত্র নয়, মুখে বললেই হবে। কারণ চালকের সামনেই চলতে থাকে টেপরেকর্ডার। এর আরও একটা জিনিস না বললেই নয়, তা হচ্ছে 'সোনার' ও 'একো-সাউন্ডার'। এই যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গকে প্রতিফলিত করিয়ে জানা যায় কতদূরে কোন্ বাধা রয়েছে।

১৯৫৪ সালের ১০ জানুয়ারি 'কমেট' শ্রেণীর একটা ব্রিটিশ বিমান রহস্যজনকভাবে ভেঙে পড়েছিল ভূমধ্যসাগরে। ভেঙে পড়ার এক সেকেণ্ড আগেও বিমানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়েনি। তাই কেউ ভাবল এটা কোনও নাশকতামূলক কাজ। আবার কেউ-বা ভাবল গ্রহান্তরের উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপার। অবশেষে সমুদ্রের তলা

রোবট তুলল ব্ল্যাক-বক্স

এয়ার-ইণ্ডিয়ার 'কনিষ্ক' বিমানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৫-র ২২ জুন। ৩০৭ জন যাত্রী আর ২২ জন বৈমানিক ও বিমানকর্মীকে ছিন্নভিন্ন করে জাম্বো জেটটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের কাছে অতলান্তিক মহাসাগরে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে খোঁজ পড়ল ব্ল্যাক-বক্সের। এটা টেলিফোনের মতো প্রায় চৌকো একটা কমলা রঙের বাক্স, ভেতরে থাকে 'ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার' ও 'ককপিট্ ভয়েস রেকর্ডার'। বিমান ওড়ার পর থেকে সমস্ত শব্দ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন, প্রতি মুহূর্তে গতি ও উচ্চতার পরিমাপ, বিভিন্ন যান্ত্রিক সঙ্কেত ইত্যাদি প্রায় সব রকমের তথ্য জমা হতে থাকে এই ব্ল্যাক-বক্সে। তার ওপর এটা হল জল-নিরোধক, অগ্নি-নিরোধক ও আঘাত-নিরোধক যন্ত্র। তা ছাড়া বিমান থেকে আলাদা হয়ে যাবার পরও প্রায় ৩০ দিন ধরে এই ব্ল্যাক-বক্স একনাগাড়ে সঙ্কেত পাঠিয়ে চলে।

কনিষ্কের ব্ল্যাক-বক্সের এই সঙ্কেত অনুসরণ করে এগিয়ে চলল আয়ার্ল্যাণ্ডের একটা ছোট্ট স্বয়ংক্রিয় ডুবো-নৌকো। বহু খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল ব্ল্যাক-বক্স পড়ে রয়েছে সমুদ্রের প্রায় ৬,০০০ মিটার গভীরে। এত নীচে ডুবুরি নামানো অবান্তর, তাই চালু করা হল ডুবো-নৌকোর সঙ্গে লাগানো একটা রোবটকে, যার নাম 'স্কারাব্'। এর স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক হাত ঠিক গিয়ে পাকড়াও করল বাক্সটিকে আর তুলে নিয়ে এল উদ্ধারকারী জাহাজে।

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেল রোবটের এই আপাত-অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা, যা সাগরের নীচে মানুষের অভিযান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অসাধারণ নিদর্শন।

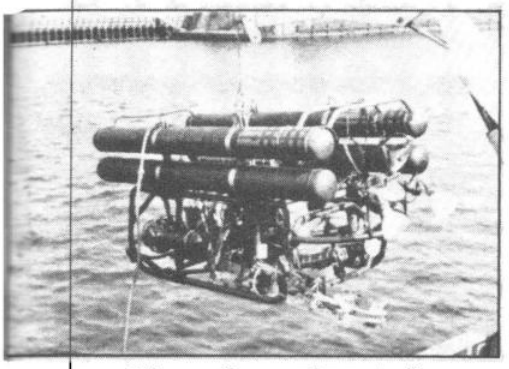

মানুষবিহীন, স্বয়ংক্রিয় ডুবোনৌকো—'কার্ভ'

থেকে কমেটকে উদ্ধার করে যখন তার ভাঙা টুকরো নিয়ে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হল, তখন বোঝা গেল নাশকতাও নয়, অলৌকিক কোনও কাণ্ডও নয়, মানুষের বিজ্ঞানের অহঙ্কারই এর জন্য দায়ী। বাতাসের বিভিন্ন তাপমাত্রা ও চাপের মধ্যে পড়ে কখনও সঙ্কোচন ও কখনও প্রসারণের ফলে ধাতুর যে টানাপোড়েন হয়, তাকে বলে 'মেটাল ফেটিগ' (ধাতব ক্লান্তি ?)। এই টানাপোড়েন যে কখনও বিমানে চিড় ধরাতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। কমেটের দুর্ঘটনা কিন্তু এই কারণেই হয়েছে বলে ধরা পড়ল। এরপর সমস্ত কমেট-শ্রেণীর বিমানগুলোকে সুরক্ষিত করে নাম রাখা হল 'নিমরড্‌স'। এত কাণ্ড

ডুবে যাচ্ছে 'মেইলি ব্রিজ'

করা যেত না, আর রহস্য রহস্যই থেকে যেত, যদি না পিসেস-এর মতো ডুবো-নৌকো সাহায্য করত। কারণ একেই তো এরোপ্লেনটা জাহাজের চেয়ে অনেক ছোট, তার ওপর ভেঙে পড়ার সময় অনেকগুলো টুকরো এত দূরে-দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ডুবুরিদের দিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রতলে হাতড়ে বেড়ানো মানে পুকুরে আংটি খোঁজার সামিল।

তবে প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশলে পিসেসকে ছাপিয়ে গেছে 'কার্ভ'। পুরো কথাটা এসেছে 'কেবল কনট্রোলড আণ্ডারওয়াটার রিকভারি ভেহিকল' থেকে। পিসেসের সমস্ত যন্ত্রপাতি এতে শুধু আরও উন্নতই করা হয়নি, একে পরিচালিত করা হয় সমুদ্রতীর থেকে বা উদ্ধারকারী জাহাজের ডেক থেকে। অর্থাৎ এর ভেতরে কোনও মানুষ থাকার দরকারই নেই। নৌকোর বাইরে থাকে রোবটের মতো হাত ও আঙুল, যা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সমুদ্রতলের অনেক ছোট-বড় জিনিস আঁকড়ে ধরে তুলে আনা যায়। এর একটা কীর্তি না বললেই নয়।

১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি একটা বি-৫২ বোমারু বিমান বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল চারটে বিশেষ ধরনের ছোট পারমাণবিক অস্ত্র। মাঝপথে ঘটল বিস্ফোরণ, ভূমধ্যসাগরের উপকূল বরাবর। তিনটে অস্ত্র ছিটকে পড়ল মাটির ওপরে, যা খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল বটে, তবে বাকি অস্ত্রটা সমুদ্রের তলায় হারিয়ে গেল। ডুবুরি নামিয়ে কোনও লাভ হল না, জাহাজের শব্দ-প্রতিফলক যন্ত্রও এত ছোট অস্ত্রকে সমুদ্রতলের অন্যান্য হাজার টুকরো জিনিসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিল। অবশেষে নামল কার্ভ। অস্ত্রটাকে শুধু খুঁজেই পেল না, তার ওপর তার যান্ত্রিক হাতগুলো দিয়ে সাবধানে আঁকড়ে ধরে তুলে আনল উদ্ধারকারী জাহাজ 'পেট্রেল'-এর ডেকে।

তবে, পুরো জাহাজকে আঁকড়ে ধরে তোলার ক্ষমতা যে এইসব ডুবো-নৌকোর নেই, তা বলাই বাহুল্য। সেসব ক্ষেত্রে লিফটিং ক্র্যাফটের সাহায্য অবশ্যই দরকার, কিন্তু লিফটিং ক্র্যাফট তো শুধু টেনে তোলার জন্যে টানাটানি করবে, ঠিকমতো জাহাজটাকে বাঁধা না হলে সব চেষ্টাই বিফল হবে। তা ছাড়া দেখতে হবে জাহাজটা কীভাবে সমুদ্রের নীচে পড়ে আছে,সোজা হয়ে, না উপুড় হয়ে ; কাত হয়ে নাকি দু'টুকরো হয়ে। সেই বুঝে বাঁধার তার জড়ানো দরকার। এসব দায়িত্ব যাঁদের, সেইসব ডুবুরিদের কাণ্ডকারখানাও চমক লাগিয়ে দেয়।

ডোবা-জাহাজটা কোথায় রয়েছে, তা যখন মোটামুটিভাবে জানা যায় সোনার বা একো-সাউণ্ড পদ্ধতির সাহায্যে, তখন জলের ওপর একটা বয়া থেকে লম্বা তার দিয়ে একটা ভারী ওজন সোজাসুজি নামিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রতলে। এবার নামে ডুবুরি। ডুবুরি ওই তারটার গায়ে আর-একটা ১৫ মিটার লম্বা সুতো লাগিয়ে নেয়। এবার সুতোটার অন্য প্রান্ত হাত দিয়ে ধরে চক্রাকারে ঘুরলে ১৫ মিটার ব্যাসার্ধযুক্ত একটা বৃত্তাকার জমিতে ভ্রমণ করা হবে। এই জমির ভেতর যদি জাহাজটা থাকে, তা হলে সুতোটা তার গায়ে ধাক্কা খাবে। এর ফলে, বোঝা যাবে বয়ার তারটা থেকে জাহাজটা ঠিক কতদূরে আছে। যদি এইটুকু জমির ভেতর জাহাজটা না থাকে তা হলে বয়াটা অন্যদিকে আর-একটু সরিয়ে একইভাবে ডুবুরিকে ঘুরতে হবে,

যতক্ষণ না জাহাজটাকে ছোঁয়া যায়। খুবই জটিল কাজ, সময়ও লাগে বেশ, তাই অনেক সময় একসঙ্গে একাধিক বয়া থেকে তার ঝুলিয়ে একাধিক ডুবুরিকে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে ডোবাজাহাজের অবস্থান নিখুঁতভাবে জানা গেলে উদ্ধারকারী জাহাজকে এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়, যাতে ক্রেনের আঁকশি বা বাঁধবার দড়াদড়ি জলের ওপর থেকে ফেললে সরাসরি ডোবাজাহাজের গায়ে এসে পড়ে।

আজকাল ডুবুরির পোশাকে টেলিফোন-যোগাযোগের ব্যবস্থা করা থাকে। তবু ডুবুরিদের কিছু সাঙ্কেতিক ভাষা শিখতে হয়, যা দরকারমতো তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন। বাস-কন্ডাক্টররা যেমন ঘন্টি টেনে বোঝান (একবার টানলে 'থামো', দু'বার টানলে 'যাও' ইত্যাদি) ডুবুরিদের দড়ির ভাষাও অনেকটা এইরকম। অর্থাৎ একটা দড়ি অনেক সময়ই তাঁদের শরীরের সঙ্গে বাঁধা থাকে, যা সরাসরি উদ্ধারকারী জাহাজের সঙ্গে যুক্ত।

পিঠে অক্সিজেন সিলিণ্ডার বেঁধে ডুবুরির সাঁতার কাটার যে ছবি আমরা সাধারণত দেখে থাকি, তা অনেকক্ষেত্রেই কাজে লাগে না। উদ্ধারকারী ডুবুরিদের বাতাস সরবরাহ করা হয় কোনও ডুবো-নৌকোয় রাখা বা ভাসমান একটা অক্সিজেন নাইট্রোজেন মিশ্রণের ট্যাঙ্ক থেকে। ডুবুরি যত নীচে নামবে, জলের চাপের ফলে বাতাসেরও দরকার পড়বে অনেক বেশি। কিন্তু দেখা গেছে, বেশি চাপে বাতাসের নাইট্রোজেন শরীরের ভেতরে এমন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যাতে ডুবুরির গা-বমি ভাব দেখা দেয়, আর মাথা ঘোরে। ৬০ থেকে ৭০ মিটারের মধ্যে সাধারণ বাতাসে কাজ চলতে পারে, কিন্তু তার বেশি হলে বাতাসের মিশ্রণটা তৈরি করা হয় অক্সিজেন আর হিলিয়াম দিয়ে।

যদি এর চেয়েও বেশি গভীরে নামতে হয়, তা হলে লৌহমানব না হলে চলে না। অনেকসময় ডুবুরির গায়ে একটা লোহার বর্ম আপাদমস্তক পরিয়ে দেওয়া হয়। হাত-পা নাড়ানোর জন্যে কাঁধ, কনুই, হাঁটু আর গোড়ালিতে কব্জা দেওয়া থাকে। মাথায় যে ভারী লোহার বাটিটা চাপানো থাকে। তাতে স্বচ্ছ ও শক্ত পলিথিন লাগানো ছোট-ছোট জানলা থাকে দেখবার জন্যে। পিঠে থাকে অক্সিজেন-সিলিণ্ডার, বর্মের ভেতরেই। এই ভারী বর্ম পরে মাটির ওপরে হাঁটাই দায়, তবে জলের নীচে হাত-পা নাড়াতে অত কষ্ট হয় না। তা সত্ত্বেও খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে টলে পড়ে না যায়। অত্যধিক জলের চাপে বর্ম হয়তো দুমড়ে যায় না, তবে হাত-পা নাড়ানোর জন্যে লৌহমানবেরও একটা নির্দিষ্ট জলের চাপের সীমা ঠিক করা আছে, তার বেশি হলেই গোলমাল।

ডুবো-নৌকো আর রোবট নিয়েই আজকাল গবেষণা চলছে বেশি। গত বছর আমাদের দেশের 'কনিষ্ক' বিমানের বিশেষ যন্ত্রাংশ (ব্ল্যাক বক্স) তন্ন-তন্ন করে খুঁজে তুলে এনেছে একধরনের স্বয়ংক্রিয় রোবট (স্কারাব)। মানুষের এককালের গর্ব বিশাল 'টাইটানিক', 'লুসিতানিয়া' ও 'অ্যানড্রি ডোরিয়া' জাহাজকে তোলবার জন্যে উপযুক্ত স্বয়ংক্রিয় রোবট তৈরি করার বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে।

১৯৫৮ সালে রাশিয়ান জাহাজ 'ভিত্যাজ্' সমুদ্রতলের এক জায়গায় (মারিয়ানাম্ ট্রেঞ্চ) গভীরতা মেপে দেখেছে প্রায় ৩৬,০৫৬ ফুট। এইরকম গভীরতায় যদি কোনও জাহাজ ডুবে যায় তা হলে তাকে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে তার উপায় বার করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এর ওপর আছে আরও অনেক বাধাবিপত্তি, যা মানুষের নিত্যসঙ্গী, সাগরের নীচেও তার ব্যতিক্রম নেই। কত ডুবুরি যে হাঙরের পেটে গেছে, কতজন যে ভাঙা জাহাজের ভেতর ঢুকে পথ হারিয়েছে কতজনের যে গলায় চেপে ধরেছে ঝুলন্ত দড়াদড়ির জট, তার কোনও হিসেব নেই। ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছে আমেরিকান জাহাজ 'স্টার অভ দি ইস্ট' থেকে জেমস্ বার্টলে নামক এক ডুবুরিকে জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গে গিলে ফেলল বিশাল এক তিমি। পরের দিন তিমিটাকে ধরে পেটটা চিরে দেখা গেল অবিশ্বাস্য কাণ্ড, জেমস্ শুয়ে আছেন অজ্ঞান অবস্থায়। তিমির পাচক রসে তার সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। হাসপাতালে গিয়ে প্রাণ ফিরে পেলেন বটে, তবে চিরকালের মতো জেমস হারিয়ে ফেলেন তাঁর মানসিক ভারসাম্য।

এসব বিপদ ছাড়াও আছে ভাগ্যের পরিহাস। ১৯১২ সালে মেক্সিকোর উপকূলে ডুবেছিল 'মেরিডা' জাহাজ। ওতে নাকি ঠাসা ছিল সোনা, রুপো আর হিরে। বহু বছর সাধ্যসাধনা করে যখন ডোবা জাহাজটার সন্ধান মিলল, দেখা গেল দরজা খোলা আর সব সাফ! হয় চোরাগোপ্তা শখের ডুবুরিরা সব চুরি করে নিয়েছে, নয়তো জাহাজটা ডোবার সময়ই নাবিকরা যে-যার মতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। ১৯৩৭ সালে আমেরিকান রত্নজাহাজ 'এইচ· এম· এস· হুসার' ডুবেছিল কয়েক লক্ষ মুদ্রা নিয়ে। হাজার কাণ্ডের পর তার ভেতর থেকে যে সামান্য মুদ্রা উদ্ধার করা গিয়েছিল তার মূল্য মাত্র ৪১ পেন্স।

অন্ধকারের পর যেমন আলো, তেমনই বাধাবিপত্তির পরেই আসে সাফল্য আর সার্থকতা। তাই জিজ্ঞাসু মানুষ কোথাও কোনওদিন থেমে থাকেনি। আর এই না থেমে এগিয়ে যাওয়ারই তো অন্য নাম বিজ্ঞান। সাগরের তলা থেকে জাহাজ উদ্ধারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেও মানুষ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে!

ডোবা জাহাজ কার সম্পত্তি ?

যে ব্যক্তি বা সংস্থা গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে, লোকজন লাগিয়ে, যন্ত্রপাতি ভাড়া করে একটা ডোবা জাহাজ তোলে, সে কি জাহাজটার মালিক হয়ে যায়, নাকি জাহাজটা ডোবার আগে মালিকানা যার ছিল তারই একমাত্র অধিকার থাকে জাহাজটার ওপর? আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হয়তো উদ্ধারকারীর ওপরই পড়বে। কিন্তু আইনে অন্য কথা বলে। জাহাজের আসল মালিকেরই জাহাজটা ফিরে পাবার অধিকার থাকে। তবে তার আগে উদ্ধারকারীকে তার সমস্ত খরচ ও পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি আসল মালিক রাজি না হয়, তা হলে উদ্ধারকারী ডোবা জাহাজটাকে যা খুশি করতে পারে। উদ্ধার করার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তা খতিয়ে দেখতে দায়িত্বশীল যেসব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হন, আইনের ভাষায় তাঁদের বলে 'আরবিট্রেটর'।

তবে যেসব ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন পাঁচশো বছর আগের কোনও ঐতিহাসিক জাহাজ খুঁজে পেলে বা মালিকানাধীন সংস্থা দেউলিয়া হয়ে উঠে গেলে, উদ্ধারকারী সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সেই জাহাজটা তুলবে। অবশ্য তার আগে উদ্ধারকারী নিশ্চয়ই সরকারের কাছে বা জাহাজের বাজারে একবার খোঁজখবর করবেই! এসব ক্ষেত্রে সাধারণত খরচ বহন করে সেইসব দেশের সরকার, যার সীমারেখার মধ্যে জাহাজটা ডুবেছে।

মার্ক স্মিথ

সমুদ্রতলের লুপ্ত-ধন

প্রসাদ সেন

সিনেমার ছবি তুলতে গিয়ে লুপ্ত-ধনের সন্ধান! সমুদ্রতলের দৃশ্য তুলতে গিয়ে! ভাবতে অবাক লাগলেও, এমন চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু ঘটে। আর ১৯৬১ সালে এরকমই এক ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র অঞ্চল থেকে।

এই রুদ্ধশ্বাস, চমকপ্রদ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর শুরুতে কয়েকজনের পরিচয় জেনে রাখা দরকার। প্রথমজন আর্থার সি· ক্লার্ক। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্র-কাহিনীকার, কল্পবিজ্ঞান-গল্পের প্রথম সারির লেখক এবং একজন পাকা ডুবুরি। দ্বিতীয় ব্যক্তি মাইক উইলসন। ক্লার্কের সহযোগী। তিনি ডেভিড লিন-এর বিখ্যাত ইংরেজি চলচ্চিত্র 'ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই' ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় এবং ফোটোগ্রাফির কাজে সহকারীর দায়িত্ব পালন করেন। ইনিও একজন পাকা ডুবুরি। বর্তমান কাহিনীর আরও দুই চরিত্র হল মার্ক স্মিথ ও ববি ক্রিগেল—১৩ ও ১৪ বছরের দুই কিশোর। আর একটি চরিত্র হল—শ্রীলঙ্কার 'গ্রেট বাস্ রিফ'-এর একটি লাইটহাউস বা বাতিঘর।

১৯৬১ সালের কিছু আগে রোড্‌নি নামে এক ডুবুরির সহযোগিতায় 'সিলোন টি প্রপাগাণ্ডা বোর্ড'-এর হয়ে 'বিনিথ দি সিজ অব সিলোন' নামে সমুদ্রতলের বিভিন্ন ধরনের মাছ, হাঙর ও প্রাণীদের নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি ছবি তোলেন মাইক উইলসন। ছবিটি সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে, ক্লার্কের সহযোগিতায় ওঁরা আর একটি সমুদ্রতলের ছবি করার সিদ্ধান্ত নেন। ছবিটি হবে কাহিনীনির্ভর। দুটি কিশোর সমুদ্রতলের প্রাণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে খেলা করছে—এটাই ছিল বিষয়।

তবে এরকম দুটি ডুবুরি কিশোর খুঁজে পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হয়। শ্রীলঙ্কার মার্কিন দূতাবাসের দুই কর্মীর দুটি ছেলেকে পাওয়া গেল। মার্ক ও ক্রিগেল দু'জনেই সাঁতার ও ডুব-সাঁতারে ওস্তাদ। একেবারে জলের পোকা। ওদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে, ডুবুরির সরঞ্জামসহ স্থানীয় একটি সুইমিং পুল-এ কয়েকদিন ট্রেনিং দিতেই, ওরা নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণিত করল। অবশেষে দলটি সমুদ্রে রওনা হল। সঙ্গে জলের নীচে ছবি তোলার ও ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম। কিন্তু দলে মাত্র তিনজন। রোডনি শ্রীলঙ্কার বাইরে। আর আর্থার ক্লার্ক-কেও ডাক্তাররা তাঁর অসুস্থতার জন্য ডুবুরির কাজ করতে বারণ করে দিলেন।

যাই হোক, এক ভোরে দলটি শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূল কিরিন্দা থেকে ছোট্ট একটি মোটর বোটে যাত্রা করল দশ মাইল দূরে সমুদ্রের মাঝখানে 'গ্রেট বাস' লাইটহাউসের উদ্দেশে। অসংখ্য ডুবো পাহাড়ের মাঝে সামান্য একটু জেগে থাকা পাথরের উপর লাইটহাউসটি বহুকষ্টে বসানো হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রাচীন কাল থেকেই বহু জাহাজ ওই অঞ্চলে ডুবে যায়। জাহাজগুলো বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এই লাইটহাউসটি তৈরি করা হয়। এখানে কয়েকজন কর্মচারীও থাকেন। মাইকদের কাজ এক সপ্তাহের। অতএব একটা আশ্রয়স্থলও চাই। লাইটহাউসটিকেই থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা সরকার।

শুটিং-এর দিন যন্ত্রপাতিসহ একটি পাম্প-করা রবারবোটে চেপে দলটি গেল লাইটহাউস থেকে এক হাজার ফুট দূরের সমুদ্রে। অ্যাকুয়া লাঙ, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, মুখ ঢাকার মুখোশ ও ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে তিনজনকে সমুদ্রের তলদেশে যেতে দেখা গেল। সেখানে দিনের আলোর মতোই সূর্যের আলো ঝকমক করছে। মস্ত বড় বড় গ্রুপার ও টুনা মাছ অভ্যর্থনা জানাল ওদের। মাইকের সঙ্গে আগেরবারই মাছেদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এবার ওদের জন্য খাবার আনা হয়েছিল। এখন মার্ক ও ক্রিগেলের সঙ্গে ওদের ভাব জমাতে হবে। শুধু দেখতে হবে, হিংস্র হাঙরেরা যেন আক্রমণ না করে। যতক্ষণ পারা গেল, মার্ক ও ক্রিগেল আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব করল টুনা ও গ্রুপারদের সঙ্গে। দিনটা এভাবেই কাটল। ছবি তোলা হল না। জল থেকে উঠে লাইটহাউসে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম নিল ওরা।

এভাবেই ধীরে-ধীরে ছবি তোলার কাজ এগোচ্ছিল। এদিকে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় নিজের বাড়িতে বসে অসুস্থ ক্লার্ক উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। দুই বিদেশী কিশোরকে নিয়ে ভয়ঙ্কর এক ঝুঁকি নিয়েছেন মাইক। তাঁদের কোনও খবরও নেই। নেই খবর পাবার উপায়ও। বহু হাত ঘুরে লাইটহাউসের একটি রেডিও মেসেজ শুধু হাতে এসেছিল, 'আমরা ভাল আছি।'

অবশেষে, প্রায় দশদিনের মাথায় বাড়ির জানলা থেকে ক্লার্ক দেখলেন, তাঁর ভোকস-ওয়াগন গাড়িটি গেট দিয়ে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। মার্ক ও ক্রিগেলকে নিয়ে ধরাধরি করে একটা বাক্স নামালেন মাইক। বাক্সটায় ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম থাকে। কিন্তু বাক্সটা খুব ভারী বলেই মনে হচ্ছে এখন। তিনজনে বেশ কষ্ট করে বাক্সটা বয়ে নিয়ে সোজা ক্লার্কের অফিস-ঘরে ঢুকিয়ে দিল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। না, চোখে-মুখেও নেই কোনও অভিব্যক্তি। ওদের অনুসরণ করে ক্লার্ক অফিস-ঘরে প্রবেশ করতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ক্রিগেল।

বাক্সের ডালাটা তুলে দিল মার্ক। সেখানে ক্যামেরা-ট্যামেরা নেই। রয়েছে প্রবালে জড়ানো নোংরা কয়েকটা জিনিস। একটা বড় চকচকে গোলাকার কিন্তু লম্বা বস্তুও দেখা যাচ্ছে।

মাইক জিজ্ঞেস করলেন ক্লার্ককে, 'এগুলো কী বলুন তো?'

বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন ক্লার্ক। তারপর বিস্ময়ে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'এ যে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পুরনো জাহাজের সামগ্রী!'

লম্বা বস্তুটি বের করলেন মাইক।

পিতলের তৈরি ছোট একটি প্রাচীন কামান। কামানের নীচে চাপা-পড়া প্রবালের তালগুলো বের করা হল। নোংরা জিনিসগুলো আর কিছুই নয়, অজস্র প্রাচীন মুদ্রা তালগোল পাকিয়ে আছে। বিস্ময়ে হতবাক ক্লার্ক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেই মুহূর্তের কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : 'জীবনে এটা একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ডুবুরিদের জীবনে তো বটেই। আমি তাকিয়ে রইলাম সেই নোংরা তালগুলোর দিকে। এ দৃশ্য দেখা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! খাঁটি এবং দুর্লভ ঐশ্বর্য! কুৎসিত এই তালগুলো হল দলাপাকানো মুদ্রা। হাজার হাজার মুদ্রা। একটি তাল তুলতে গেলাম। খুব ভারী। তোলা কষ্ট। কিন্তু ওগুলো সোনার নয় বলে একটু হতাশ হলাম আমি। সোনার পরেই যার স্থান, সেই রুপোর তৈরি এই মুদ্রাগুলো। এই তালগুলোর নীচে আরও অসংখ্য মুদ্রা ছিল ছড়ানো অবস্থায়। ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু তখনও ভাল অবস্থা। কেননা মুদ্রার গায়ে ফার্সি অক্ষরের ছাপগুলো স্পষ্ট। সব মিলিয়ে মুদ্রার ওজন প্রায় দেড়শো পাউণ্ড। মুদ্রা ও কামান ছাড়াও—বাক্সে ছিল কিছু ছোট ছোট তামার ইট এবং সিসের গুলি। সবসুদ্ধ ওজন দু' হন্দরের মতো। আমি অবাক হয়ে গেলাম মাইকদের কার্যকলাপ দেখে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে এগুলো উদ্ধার, লাইটহাউসে রাখা (গোপনে নিশ্চয়), তারপর উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভূখণ্ডে পৌঁছনো এবং অবশেষে এখানে নিয়ে আসা—কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছে ওরা। চিন্তায়, আনন্দে ও উত্তেজনায় আমি যখন বিভোর, তখনই মাইকের কথায় আমার চেতনা ফিরে এল। সে বলছে—এ আর কী দেখছেন! আরও অনেক কিছুই পড়ে আছে সেখানে।'

এই আবিষ্কারের কাহিনী যেমন চমকপ্রদ, তেমনি রোমাঞ্চকর। সমুদ্রতলের একটা পাহাড়ের গা ধরে এগোচ্ছিল ক্রিগেল। হঠাৎই সে কামানটা দেখতে পেল। বালিতে সেটা গেঁথে ছিল। মাইক আর ক্রিগেল দুজনে মিলে উদ্ধার করেছিল কামানটাকে। উদ্ধারের সময় মাইকের মনে পড়েছিল একটা কথা। এখানে ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কত জাহাজই না ডুবে গেছে। সেইজন্যই তো পরে লাইটহাউসটি তৈরি হয়। এরপর ওরা আবিষ্কার করেছিল, নিচু একটা প্রাচীর। আসলে সেটা প্রাচীর নয়। জাহাজের খোলে বস্তা-বোঝাই মুদ্রাগুলো জমে জমে প্রাচীরের মতো হয়ে উঠেছিল।

সমুদ্রতল থেকে রত্ন জিনিসপত্র উদ্ধার করার মতোই সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য-নির্ধারণের কাজটিও বেশ কঠিন। আর এই কাজটা করতে হয় গোপনে। মাত্র কয়েকটি মুদ্রা সেবার দেখানো হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এক অপেশাদার অথচ পণ্ডিত মুদ্রাবিশেষজ্ঞকে। তিনি রায় দিয়েছিলেন—এই মুদ্রা দিল্লির সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলের। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের। মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে তখন সুরাটে রৌপ্যমুদ্রা তৈরি হত। তার অর্থ, বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য ওই মুদ্রা জাহাজে করে কোথাও পাঠানো হচ্ছিল। হয়তো সেটা ছিল সরকারি জাহাজ। ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া গেল, প্রায় একই সময়ে, ১৭০৩ সালে রৌপ্যমুদ্রা বোঝাই একটি পালতোলা জাহাজ সুরাট থেকে বাটাভিয়া যাবার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। আর লাইটহাউসটির ইতিহাস থেকে জানা গেল, চাঞ্চল্যকর আরও অনেক জাহাজডুবির বিবরণ।

এরপর আর্থার সি· ক্লার্ক সমুদ্রতলের লুপ্তধন উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু এর জন্য দরকার প্রচুর অর্থ। অন্তত একজন 'আণ্ডারওয়াটার আর্কিওলজিস্ট'-এরও প্রয়োজন। অভিযানের অর্থ সংগ্রহের জন্য সিনেমা-ব্যবসায়ে নামলেন মাইক উইলসন। সিংহলী ভাষায় বেশ কিছু 'হিট' ছবিও তিনি করলেন। আর্থার ক্লার্ক লিখতে লাগলেন বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস। বিদেশের প্রকাশকরা উদার হাতে তাঁকে দিলেন রয়ালটি। আরও নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হল। ইতিমধ্যে জানা গেল, সমুদ্রের ওই এলাকাটি শ্রীলঙ্কা সরকারের জলসীমার মধ্যে পড়ে না। আবার মহা উৎসাহে অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন সবাই। এবং আর্থার সি· ক্লার্কের নেতৃত্বেই সেই আগের দলটি সমুদ্রতল থেকে উদ্ধার করেছে অজস্র ধনরত্ন ও ঐতিহাসিক সামগ্রী। এই সব জিনিসপত্র বিভিন্ন জাদুঘরে রাখা হয়েছে। ক্লার্ক মনে করেন, এখনও অজস্র ধনরত্ন পড়ে আছে সমুদ্রের নীচে। সেগুলি উদ্ধারের জন্য আরও অভিযান চালাতে হবে। বড় কথা, প্রৌঢ় আর্থার সি· ক্লার্ক অসুস্থ শরীর নিয়েই ডুবুরির কাজ করেছিলেন তাঁর ওই ঐতিহাসিক অভিযানে।

টাইটানিক কি আবার ভেসে উঠবে

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

অতলান্তিক সাগরে পাড়ি দেবার সময় এক ডুবো-পাহাড়ের ধাক্কায় ধ্বংস হয় 'টাইটান' জাহাজ। সে-ছিল তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। জাহাজ-বিশেষজ্ঞরা টাইটানের নিরাপত্তা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তবু টাইটান ভেঙে পড়ে এক এপ্রিলের রাতে। বিশাল জাহাজে লাইফবোটের সংখ্যা ছিল মাত্র কুড়িটি। ফলে অধিকাংশ যাত্রীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

টাইটানিকের কথা বলছি না। ওপরের ঘটনাটি আসলে টাইটানিকের মতো আর এক ভাগ্যহীন জাহাজ টাইটানকে নিয়ে। ১৮৯৮ সালে এই টাইটান-এর ভেঙে পড়ার কাহিনী নিয়ে ইংরেজ লেখক মর্গান রবার্টসন 'দি রেক অব দি টাইটান' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ঠিক তার চোদ্দ বছরের মাথায়, ১৯১২ সালে, উপন্যাসের টাইটানের মতো টাইটানিকও অতলান্তিক মহাসাগরে চোদ্দ এপ্রিলের রাতে ধ্বংস হয়। লাইফ বোটের সংখ্যা এখানেও ছিল খুবই কম। কল্পনার টাইটানের সঙ্গে এভাবে হুবহু মিলে গিয়েছিল বাস্তবের টাইটানিকের পরিণতি।

টাইটানের মতো টাইটানিক-বিশেষজ্ঞরাও তার নিরাপত্তা নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। টাইটানিকও ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ জাহাজ। এগারো তলা এই

টাইটানিকের সামনের অংশ

জাহাজ ছিল লম্বায় প্রায় দু'শো সত্তর ফুট আর ওজনে ছেচল্লিশ হাজার তিনশো টনের কাছাকাছি। এমন একটি জাহাজের প্রথম সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী হবার লোভ অনেকেই এড়াতে পারেননি। যার ফলে দু'হাজারের ওপর যাত্রীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত, এবং ধনী পরিবারের লোকজন। টাইটানিককে সাজানো হয়েছিল রাজপ্রাসাদের মতো। রাজপ্রাসাদ তো বটেই ! খাবারদাবার ও গান-বাজনার ব্যবস্থা ছিল একেবারে রাজকীয়। আর খুদে যাত্রীদের জন্য ছিল নানা ধরনের খেলাধুলো ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

ইংল্যান্ডের সাউদাংটন থেকে পাড়ি জমাবার ঠিক চারদিনের মাথায় দুর্ঘটনাটি ঘটল। টাইটানিকের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য ছিল বিভিন্ন জাহাজ আর স্টিমার। চোদ্দ এপ্রিল সকাল ন'টায় 'ক্যারোনিয়া' স্টিমার থেকে ওয়ারলেসে প্রথম খবর এসে পৌঁছয় 'কাপ্টেন, টাইটানিক, ৪২° উত্তর থেকে ৫১° পশ্চিম পর্যন্ত হিমশৈল, সাবধান।' এমন একটি অপ্রত্যাশিত সতর্কবাণীকে প্রথমটায় কেউই তেমন আমল দেননি। ক্যাপ্টেন ই জে স্মিথ সমেত সকলেই জাহাজটি সম্পর্কে এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁরা ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু শুধু 'ক্যারোনিয়া' নয়, 'বেলটিক', 'ক্যালিফোর্নিয়ান' সব ক'টা

টাইটানিকের পিছনের অংশ, জাহাজের সামনের অংশ থেকে ৬০০ গজ দূরে আবিষ্কৃত হয়েছে

টাইটানিক কীভাবে ডুবল

'টাইটান' বা 'টাইটানিক' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দানব। শুধু নামে নয়, টাইটানিক ছিল সত্যি-সত্যিই অপরাজেয়। এমন একটি জাহাজ হিমশৈলের ধাক্কায় ঠিক কীভাবে অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিজ্ঞানীরা নানা মত দিয়েছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, রাত দুটো আঠারো মিনিটে জাহাজটি ভয়ঙ্কর মূর্তি নেয়। জাহাজটি সাঙ্ঘাতিকভাবে কেঁপে ওঠে। কেবিনঘর, আসবাবপত্র, জাহাজের ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতি ভেঙে পড়তে থাকে। টাইটানিক হারিয়ে ফেলে তার 'বুয়েন্সি', অর্থাৎ সমুদ্রে ভেসে থাকবার ক্ষমতা। রাত দুটো কুড়ি মিনিটে সে সম্পূর্ণ ডুবে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ডুবে যাবার পনেরো সেকেণ্ডের মাথায় টাইটানিক পনেরো ফুট নীচে তলিয়ে যায়। এবং দ্রুত সে আরও নীচে নামতে থাকে। একসময় টাইটানিক এত গরম হয়ে ওঠে যে, সমুদ্রের মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জল প্রায় টগবগ করে ফুটতে থাকে। তারপর মাত্র পাঁচ মিনিটেই টাইটানিক তলিয়ে যায় সমুদ্রের একেবারে মাঝখানে, প্রায় দু'হাজার মিটার নীচে।

টাইটানিকের কাঠামো ছিল অত্যন্ত মজবুত। তবু সমুদ্রের একেবারে নীচে পৌঁছবার আগে, তার সামনের এবং পেছনের দুটো অংশ আলাদা হয়ে যায়। এভাবে তার দু'টুকরো হয়ে যাবার কারণ অবশ্য এখনও জানা যায়নি। জাহাজটি ৪,০০০ মিটার গভীরে সমুদ্রের একেবারে তল ছুঁয়েছিল রাত দুটো তিরিশ মিনিটে।

টাইটানিক বেঁচে ছিল মাত্র ১৭ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

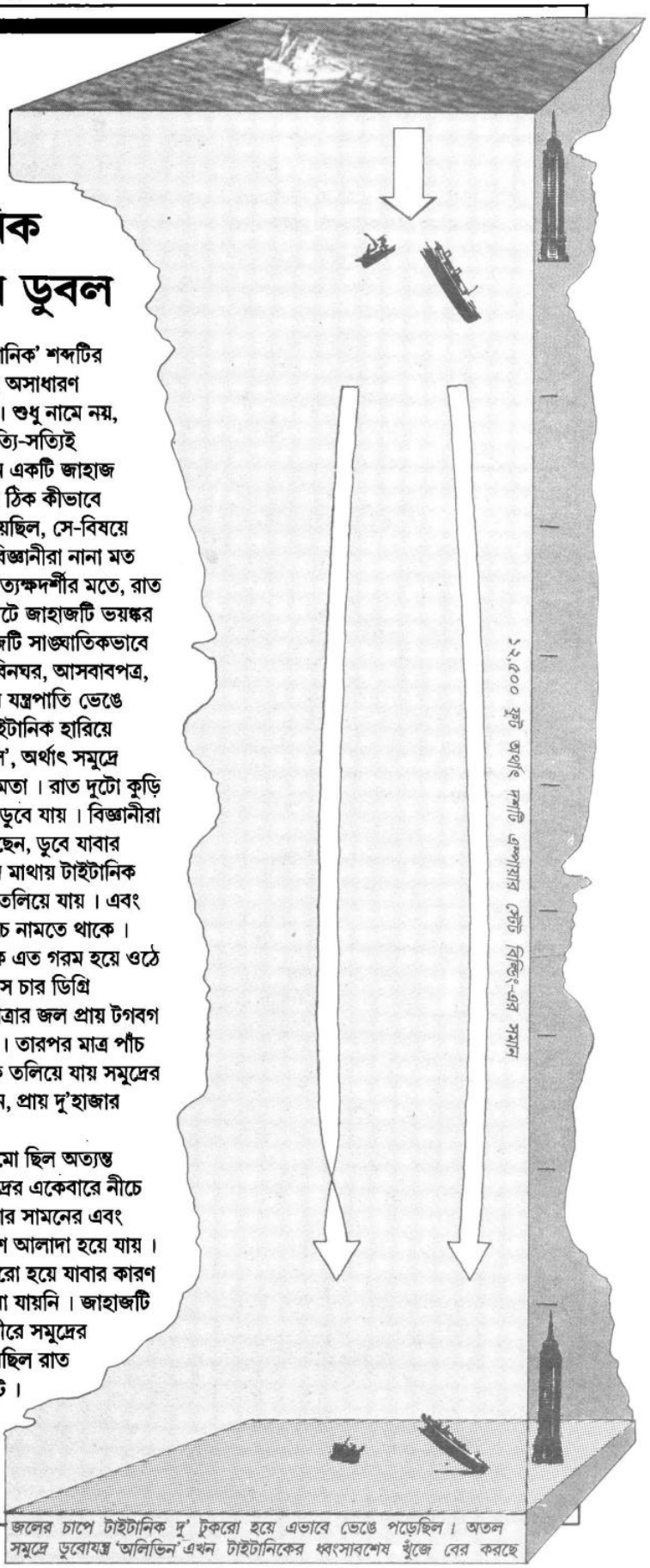

জলের চাপে টাইটানিক দু' টুকরো হয়ে এভাবে ভেঙে পড়েছিল। অতল সমুদ্রে ডুবোযন্ত্র 'অলিভিন' এখন টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করছে

নজরদারি-জাহাজ থেকে একই খবর এসে পৌঁছতে লাগল।

এদিকে যাত্রীরা নৈশভোজন সেরে কেউ কেউ বেড়াতে এসেছেন জাহাজের ডেকে। কেউ কেউ ধরেছেন গান। তাঁরা বিন্দুমাত্রও জানতে পারলেন না, অপরাজেয় টাইটানিক কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত তাঁদের টনক নড়ল। ডাক পড়ল বিশেষজ্ঞদের। এলেন টমাস এন্ড্রুজ, যিনি টাইটানিকের নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনি সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান, জাহাজের ওজন, জলের গভীরতা সবকিছু হিসেব করে জানিয়ে দিলেন, টাইটানিককে বাঁচাবার কোনও পথ নেই। ততক্ষণে অনেক সময় চলে গেছে। টাইটানিক একুশ নট্ বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর হিমশৈলের কাছাকাছি। ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন জাহাজের মুখ ফেরাবার। নাবিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তা সম্ভব হল না, ততক্ষণে হিমশৈলের ধাক্কায় টাইটানিকের ভাঙা অংশ দিয়ে ঢুকে পড়ছে জল। জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হল। যাত্রীরা কাতারে কাতারে উঠে এলেন জাহাজের ডেকে। ক্যাপ্টেন লাইফবোট বার করবার নির্দেশ দিলেন। প্রায় দু'হাজারের ওপর যাত্রীর জন্য পাওয়া গেল মাত্র ষোলোটি লাইফবোট। কর্তৃপক্ষ জানালেন, লাইফবোটে জায়গা হবে কেবলমাত্র মেয়ে এবং খুদে যাত্রীদের। প্রিয়জনদের শেষ বিদায় জানিয়ে ষোলোটি লাইফবোটের যাত্রীরা ভেসে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। প্রত্যেক লাইফবোটে গেলেন একজন অফিসার।

এদিকে টাইটানিকে বেজে উঠল ভায়োলিন। আতঙ্কগ্রস্ত অসুস্থ যাত্রীদের চিকিৎসা করে চললেন ডাক্তাররা। কেউ কেউ সেরে নিলেন ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা। ধর্মযাজক বাইবেল পড়ে শোনালেন। আর আস্তে-আস্তে অতলান্তিক সমুদ্রের জলের মধ্যে ১৪ এপ্রিলের রাতে প্রায় দেড়হাজার যাত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পৃথিবীর বৃহত্তম ভাসমান রাজপ্রাসাদ টাইটানিক। টাইটানিক শেষ খবর পাঠিয়েছিল যে নজরদারি-জাহাজকে তার নাম হল 'কারপাথিয়া'। কারপাথিয়ায় ক্যাপ্টেন রস্ট্রন পরে জানিয়েছেন, 'অনেকক্ষণ টাইটানিকের কোনও খবর পাচ্ছিলাম না। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রাত প্রায় তিনটে পঁয়ত্রিশ নাগাদ আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম একটি বেগুনি রঙের আলোর বিন্দু। আমার তখন মনে হল, এটি নিশ্চিত লাইফবোট। কাছে আসতে আমি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, টাইটানিক কোথায়? উত্তর এল, রাত দুটো কুড়ি মিনিটে টাইটানিক চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। পরে টাইটানিকের আর কিছুই পাওয়া যায়নি। ডুবে যাবার এক সপ্তাহ পরে ম্যাক-কে-ব্যানেট নামে একটি জাহাজ তুলে এনেছিল তিনশো ছ'টি মৃতদেহ। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের নীচ থেকে তুলে এনেছেন টাইটানিকের কিছু ছবি। এবং ধারণা টাইটানিকের মধ্যে রয়েছে অনেক মূল্যবান বস্তু। টাইটানিককে সমুদ্রতল থেকে তুলে আনার চেষ্টা তাঁরা করছেন।

অনেকে আবার বিশ্বাস করেন, টাইটানিক নিশ্চয় একদিন অক্ষত অবস্থায় অতলান্তিকে ভেসে বেড়াবে। ঔপন্যাসিক ক্লাইভ কাসলারের 'রেইজ দ্য টাইটানিক' নামে একটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে। সেখানে তিনি লিখেছেন ১৯৮৮ সালে আবার অতলান্তিকে ভেসে উঠবে অক্ষত, অপরাজেয় টাইটানিক। সেই উপন্যাসের নায়ক ডার্ক পিট দেখতে পাচ্ছেন, টাইটানিক আবার যখন ভেসে উঠেছে তখন সূর্য ঢলে পড়ছে। অনেকেই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন ঢলে-পড়া সূর্যের সৌন্দর্য আর ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেইখানে, যেখান থেকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ নির্দেশটি দিয়েছিলেন।

সাগরতলে ধাতব নুড়ি

সাগরতলে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গোলাকৃতি নুড়ি। পেঁয়াজের খোসার মতো সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু দামি ও দুষ্প্রাপ্য ধাতুর আস্তরণ। প্রকৃতির এই রত্নভাণ্ডার কী করে যে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। তবে এইসব নুড়ি সাগরগর্ভ থেকে তুলে আনার জন্য পৃথিবীর সব উন্নত দেশই চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, দস্তা, মলিব্ডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, জারকোনিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি দামি ধাতু এত প্রচুর পরিমাণে নুড়িগুলোর ভেতরে রয়েছে যে, মাত্র দশ শতাংশ তুলতে পারলেই আগামী কয়েকশো বছরে সারা বিশ্বের ধাতুর চাহিদা মিটে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রায় এক কোটি টন ধাতব নুড়ি প্রতি বছর সমুদ্রতলে নতুন করে জমা হচ্ছে।

তাই ডোবা জাহাজ উদ্ধারের সমস্ত প্রযুক্তি এক্ষেত্রেও কাজে লাগছে। ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই। ভারত মহাসাগরের তলায় এই ধরনের প্রচুর নুড়ির সন্ধান পেয়েছে ভারতের নিজস্ব জাহাজ 'গবেষণী'। শুধু তাই নয়, নুড়িগুলোকে আঁকড়ে ধরে তুলে আনার একটা নিজস্ব যন্ত্রও (বুমেরাং গ্র্যাব্) তৈরি করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ ওসোনোগ্রাফি'র ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫,০০০ মিটার পর্যন্ত সাগরতলে নেমে কিছু নুড়ি সংগ্রহ করার পর অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলে হাল্কা হয়ে যায় আর ডোবার জায়গা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে ভেসে ওঠে। তা ছাড়া, সরাসরি জাহাজ থেকে নুড়ি তোলার তিনটি পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রথমত, 'হাইড্রলিক সিস্টেম'। এটা অনেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কাজ করে, যার কথা মূল নিবন্ধে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'এয়ার লিফ্ট্ সিস্টেম'। এই পদ্ধতিতে একটা লম্বা ও মোটা নল নামিয়ে দেওয়া হয় নুড়ির ওপর আর নলের নীচের দিক থেকে ওপর দিকে উচ্চচাপে বাতাসকে প্রবাহিত করা হয়। ফলে নুড়িগুলোও নলের মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে আসে। তৃতীয়ত, 'লাইন বাকেট্ সিস্টেম'। একটা দড়ির গায়ে কিছু সারিবদ্ধ বালতিকে আটকে নুড়ির ওপর দিয়ে ঘষতে ঘষতে নিয়ে যাওয়া হয় আর কিছুক্ষণ পরে টেনে তুললেই বেশ কিছু নুড়ি বালতিতে জমা হয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা কোদাল দিয়ে মাটি চাঁচার মতো।

মনে হতে পারে, এ-যেন মশা মারতে কামান দাগা। কারণ এইসব যন্ত্রপাতি রাখার জন্য যে পরিমাণ জায়গা দরকার, তা ছোটখাটো জাহাজের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা বিশাল তেলের ট্যাঙ্কারের ওজন যদি হয় প্রায় ১৫,০০০ টন, তা হলে এই নুড়ি-উদ্ধারকারী জাহাজের ওজন দাঁড়ায় তার প্রায় দশগুণ। কারণ, শুধুমাত্র একটা ৫,০০০ মিটার লম্বা নলের ওজনই তো বিরাট, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তো আছেই। তবু এত অর্থ খরচ নগণ্য মনে হবে, যখন পুরোদমে এই প্রাকৃতিক রত্নভাণ্ডার উঠতে শুরু করবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে।

প্রাণ বাঁচানোর ছুরি

ছুরিটির নাম 'ম্যালিন এম-১৫'। লম্বায় এক ফুট। স্টেনলেস স্টিলের তৈরি ফলা যেমন ধারালো তেমনি মজবুত। ফলার বিপরীত দিকের করাতের মতো দাঁত খুব সহজেই কাঠের পাটাতন চিরে ফেলতে পারে। কিন্তু এ-সবের মধ্যে তেমন

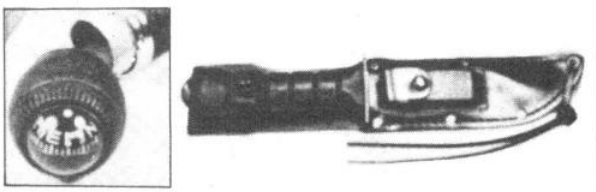

অভিনবত্ব কোথায় ? ছুরিটির প্রকৃত ক্ষমতা লুকিয়ে আছে এর হাতলে। হাতলের শেষ প্রান্তে লাগানো রয়েছে একটি নিখুঁত কম্পাস। কম্পাসটি প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেললেই ফাঁপা হাতলের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়বে জল-নিরোধক প্যাকেটে মোড়া দেশলাই, হাফ ডজন মাছ ধরার বঁড়শি, লম্বা নাইলনের সুতো, জামা-কাপড় সেলাই করার সরঞ্জাম, আর ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটি নমনীয় করাত—যে করাত সহজেই একটি ছোটখাটো গাছ কেটে ফেলতে পারে। সুতরাং দুর্গম কোনও অভিযানে এরকম 'সকল কাজের কাজি' একটি ছুরি সঙ্গে থাকলে অভিযাত্রী যে যথেষ্ট ভরসা পাবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য করার মতো বিষয় হল ছুরিটির দাম : মাত্র চার ডলার। তার ওপর, প্রথম দিকের ক্রেতাদের ছুরির চামড়ার খাপ ও শান-পাথর বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। ম্যালিন এম-১৫ পাওয়া যাচ্ছে এই ঠিকানায় : **সি· ভি· পি· ম্যালিন এম-১৫, ডিপার্টমেন্ট ১৯১-১০২, বক্স-১২০১, ওয়েস্টবেরি, নিউইয়র্ক ১১৫৯৫।**

গাড়ির জন্য টিভি

বাড়িতে টিভি আর ভিডিও এখন নতুন কিছু নয়। কিন্তু গাড়িতে ? সাধারণ টিভি বা ভিডিও গাড়িতে বসে দেখতে অসুবিধে হবে বইকী। কারণ গাড়ির ঝাঁকুনি, টিভি স্টেশন থেকে দূরত্ব, অবাঞ্ছিত বেতার-সঙ্কেত, গোলমাল সৃষ্টিকারী অন্যান্য শব্দ, এই সব মিলিয়ে সমস্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু এত রকম সমস্যার নিখুঁত সমাধান করে জাপানের 'সোনি' কোম্পানি নতুন টিভি ও ভিডিও সিস্টেম বের করেছে গাড়িতে ব্যবহারের জন্য। এতে নাকি শব্দ ও ছবি এত নিখুঁত যে বাড়ির টিভিরা এই টিভিকে রীতিমত হিংসে করবে। এর ৩৯০ ডলার দামের টিউনার দুটো অ্যান্টেনা ব্যবহার করে বেতার-সঙ্কেতের নানা পরিবর্তনকে প্রশমিত করে ছবি ও শব্দ নিখুঁত রাখে।

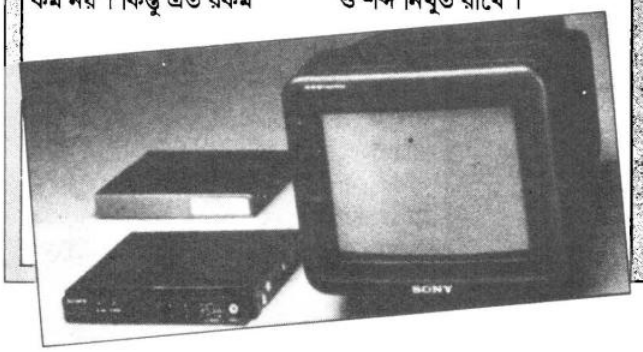

মিনি ইলেকট্রনিক হিয়ারিং এইড

যাঁরা কানে কম শোনেন তাঁরা সাধারণত হিয়ারিং এইড যন্ত্রের সাহায্য নেন। এই যন্ত্রের মূলত দুটি অংশ। প্রথমটি একটি ব্যাটারিচালিত মাইক্রোফোন।

মাইক্রোফোনের সঙ্গে শব্দ বিবর্ধক যন্ত্র ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার লাগানো থাকে।

মাইক্রোফোন ও অ্যামপ্লিফায়ারের মিলিত ইউনিটটি দেখতে ছোট একটি বাক্সের মতো। এই বাক্সটি হিয়ারিং এইড ব্যবহারকারীর বুকপকেটে রাখা থাকে, কিংবা জামার ভেতরে বুকের কাছে ঝোলানো থাকে। যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হল খুদে স্পিকার।

স্পিকারটি ব্যবহারকারীর কানে গোঁজা থাকে। প্রথম অংশের অ্যামপ্লিফায়ার থেকে তার চলে যায় স্পিকারে। ফলে হিয়ারিং এইড ব্যবহারকারীর সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বললে লুকনো মাইক্রোফোন ও অ্যামপ্লিফায়ার সেই শব্দ জোরালো করে পাঠিয়ে দেয় খুদে স্পিকারে। তখন শ্রবণ-ক্ষমতা কম হলেও বক্তার কথা বুঝতে হিয়ারিং এইড ব্যবহারকারীর কোনও অসুবিধে হয় না। সম্প্রতি এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে একেবারে 'মিনি' পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে মার্কিন একটি কোম্পানি। নতুন ধরনের এই যন্ত্রে কোনও তার নেই, নেই কোনও বাক্স। সবকিছুকে, এমনকী ব্যাটারিও, খুদে স্পিকারের মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'অল ইন-দি-ইয়ার' হিয়ারিং এইড। কিন্তু খুদে হলে কী হবে, এর মধ্যে আওয়াজ কম-বেশি করার জন্য রীতিমাফিক ভলিয়ুম কন্ট্রোলের ব্যবস্থা রয়েছে। এই হিয়ারিং এইডটি যাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে তাদের ঠিকানা হল : **বেটার হিয়ারিং, বক্স ৫৬৯-৬৯ এন, ব্রুকপোর্ট, আই· এল· ৬২৯১০।**

হারানো চাবি খুঁজে পেতে

চাবি হারিয়ে গেছে ? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? তা হলে শুধু পরপর চারবার হাততালি দিতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে শোনা যাবে 'বিপ-বিপ' ইলেকট্রনিক চিৎকার। ব্যস, তখন শব্দ অনুসরণ করে জায়গা মতো গিয়ে পৌঁছলেই খুঁজে পাওয়া যাবে হারানিধিকে। যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র এই অভিনব কাজটি সহজে করে দেয় তার নাম 'বিপ এন কিপ কি-ফাইণ্ডার'। চাবির রিংটিকে এই ছোট্ট যন্ত্রটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। হারিয়ে যাওয়া চাবি যদি তিরিশ ফুটের মধ্যে থাকে তা হলে চার সেকেণ্ড জোরে শব্দ করলেই 'কি-ফাইণ্ডার' সাড়া দেবে।

অর্থাৎ, দরকার শুধু চারবার হাততালির। সতেরো ডলারেরও কম দামের এই যন্ত্রটি তৈরি করেছেন আমেরিকার 'এম· এ বেডোল ক্যাটালগ, মন্‌টিয়ারি পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ৯১৭৫৪।

অনুসন্ধানী

হাতের লেখা

তারাপদ রায়

খারাপ হাতের লেখার জন্যে আমাদের বংশের লোকেরা বিখ্যাত। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের হাতের লেখা যে এত হিজিবিজি, বাঁকাচোরা এবং ছেলেমানুষী ধরনের হতে পারে, আমাদের বাড়ির লোকদের হাতের লেখা না দেখলে তা প্রত্যয় হবে না।

এ-বিষয়ে সব চাইতে ডাকসাইটে লোক ছিলেন আমার জ্যাঠামশাই। তিনি খুবই নামকরা উকিল ছিলেন কিন্তু তাঁর হাতের লেখা এক তিনি নিজে এবং আমাদের বাসার আর এক-আধজন মাত্র পড়তে পারত। কোনও-কোনও সময় এমন হত যে, তাঁর হাতের লেখা তিনি নিজেও পড়ে কিছু বুঝতে পারতেন না। অনুমানে চালিয়ে দিতেন। সত্যি কথা বলতে কী, একটা আরশোলাকে কালির দোয়াতে চুবিয়ে কাগজের উপরে ছেড়ে দিলে যে-রকম বাঁকাচোরা ব্যাপার হয় আমার জ্যাঠামশাইয়ের হাতের লেখা প্রায় তাই ছিল।

উত্তরাধিকার সূত্রে হাতের লেখার এই পারিবারিক ঐতিহ্য আমি, দাদা এবং অন্যান্য ভাইয়েরা রক্ষা করেছি।

তবে আমাদের মধ্যে দাদার হাতের লেখাই একটু ভাল ছিল। ধরে-ধরে লিখলে দাদার হাতের লেখা কিছুটা পরিষ্কার হত, চেষ্টা করলে পড়া যেত।

ইস্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসে, অর্থাৎ ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময় দাদার মাথায় ক্রমাগত নানান ধরনের বদবুদ্ধি চাপতে থাকে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইয়েরা তখন দাদাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করেছেন যে, 'তুমি একটু যত্ন করে লিখলেই তোমার হাতের লেখা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমাদের বাড়ির সকলের মতো বিচ্ছিরি লেখা আর তা হলে তোমার থাকবে না।'

এই পরামর্শে দাদা কী বুঝল কে জানে। কিন্তু এরপর থেকে দাদার হাতের লেখা খুব খারাপ হতে লাগল। সে রীতিমত বিচ্ছিরি লেখা, তার পাঠোদ্ধার করে কার সাধ্য। সেই সময় আমি একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর তো বেশ গোটা-গোটা লেখা হচ্ছিল, আবার খারাপ হয়ে গেল কী করে?" দাদা মুচকি হেসে বলল, "হাতের লেখা খারাপ হলেই সুবিধে।" কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?" দাদা বলল, "হাতের লেখা পড়তে পারলে মাস্টারমশাইয়েরা খাতায় সব ভুল ধরে ফেলেন আর খারাপ হলে পড়তে পারেন না। কোনও ভুলও ধরতে পারেন না। বড়জোর পড়া যাচ্ছে না বলে রাগারাগি করেন।"

দিন-দিনই কমে যাচ্ছে ব্যাঙের সংখ্যা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ব্যাঙের সংখ্যা দিন-দিনই কমে যাচ্ছে। এখন অনেক পুকুর ভরাট করে ফেলা হচ্ছে বলে ব্যাঙের ডিম পাড়বার জায়গা নিয়ে টানাটানি দেখা দিয়েছে। এদের ডিমের সবচেয়ে বড় আকার হল ১০ সেন্টিমিটার। ডিমের রঙ সবুজ, হলুদ, গাঢ় বাদামি,এমনকী লালও হতে পারে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে ব্যাঙ স্যাঁতসেঁতে বন-জঙ্গলে বা উষ্ণ জলময় ঘাসজমিতে চলে যায়। শুধু উষ্ণ জলাভূমিতে নয়, যেখানে বরফ পড়ে সেরকম ঠাণ্ডা জায়গাতেও ব্যাঙ আছে। শীত পড়তে শুরু করে, আর তারা শীত-ঘুমের জন্যে গর্তে ঢুকে যায়। জলাভূমিতে সাধারণত তারা তখন তাদের শরীর কাদায় ঢেকে ফেলে কিংবা পুকুরের একেবারে তলদেশে চলে যায়। বসন্তকাল শুরু হলে ব্যাঙেরা জেগে ওঠে। পুরুষ ব্যাঙরা আগে দল বেঁধে আসে আর গ্যাঙর-গ্যাঙ আওয়াজ করে ডাকতে থাকে। তারপর তারা অগভীর অল্প স্রোতের পুকুরে একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ব্যাঙাচি জন্মায়। মাথার পেছনে এক ধরনের ফুলকো আছে, তাই দিয়ে ব্যাঙাচি শ্বাস-নেয়। জন্মাবার কয়েক দিন পরে ব্যাঙাচিদের মুখ খুলে যায়, তখন তারা খেতে পারে। শরীরের বাইরের ফুলকো খুব তাড়াতাড়ি শরীরের ভেতরে চলে যায়। যতদিন পর্যন্ত না অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বড়সড় হচ্ছে, ব্যাঙাচিরা ততদিন জলেই থাকে, তারপর জল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। মাথার পেছনের ফুলকোর বদলে, তখন তৈরি হয়ে যায় দেহের ভেতরে ফুসফুস আর বাইরের ল্যাজটাও খসে পড়ে। ছোট-ছোট এরকম ব্যাঙের পুরোপুরি বড় হতে তিন বছর সময় লেগে যায়। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে পরিবর্তিত হতে উষ্ণাঞ্চলে দশ সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলে আরও বেশি সময় লাগে। সবচেয়ে ঠাণ্ডা অঞ্চলে যে ব্যাঙাচি জন্মায়, তার পুরোপুরি ব্যাঙ হতে এক বছরও লেগে যেতে পারে।

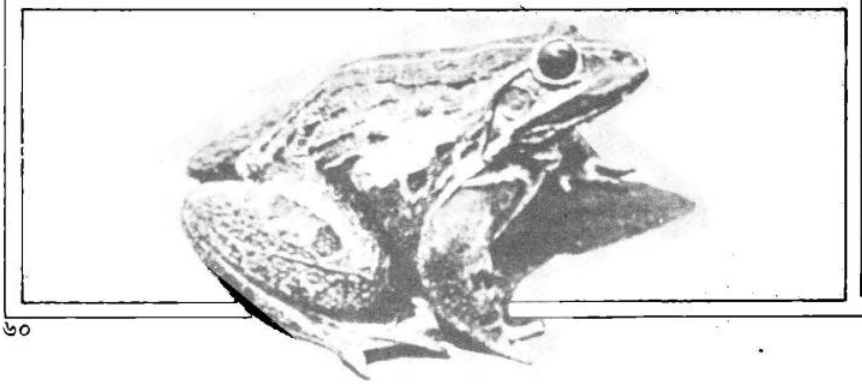

গ্রিক দোভাষীর বিপদ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শার্লক হোমস এবং ওয়াটসনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। যে শার্লক হোমস কখনও তাঁর আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি, সেদিন হঠাৎ তাঁর বড় ভাই মাইক্রফটের কথা বললেন। লন্ডন শহরের সবচেয়ে কুনো লোকদের ক্লাব ডাইয়োজিনেস-এ গিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ওয়াটসনের আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মিঃ মেলাস নামের এক ভদ্রলোককে ডাকলেন মাইক্রফট। তিনি কোর্টে দোভাষীর কাজ করেন। মেলাস তাঁর সমস্যার কথা বলে চললেন, ল্যাটিমার নামে একজন লোক দোভাষীর কাজ করবার জন্যে তাঁকে নিয়ে যান। সেখানে ক্রাটিদেস নামে এক গ্রিক ভদ্রলোককে আনা হল। তাঁর মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। গ্রিক ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন মেলাস। তারপর···

মিঃ মেলাস একটু থেমে বললেন, "পাঁচ মিনিট সময় পেলে ওদের নাকের ডগা দিয়ে সব গোপন কথা টেনে বের করে ফেলতে পারতুম। আমি এরপরই যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলুম তাতেই ব্যাপার হয়তো অনেকটা খোলসা হয়ে যেত। কিন্তু যাকে বলে বিধি বাম। আমি প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা। ঘরের সেই মিটমিটে আলোয় যা দেখলুম, তাতে মনে হল যে, ভদ্রমহিলা সুন্দরী এবং বেশ লম্বা। ভদ্রমহিলার মাথা-ভর্তি কালো চুল। গায়ে সাদা ঢিলে গাউন।

"ঘরে পা দিয়ে মহিলা বললেন, 'হ্যারল্ড, আমি আর ওখানে থাকতে পারলুম না ? ওহ্, ওখানটা কী সাঙ্ঘাতিক রকমের নির্জন··· ! এ কী ! হা ভগবান, পল যে !' ভদ্রমহিলার ইংরেজিটা ভাঙা-ভাঙা। শেষের কথাগুলো অবশ্য ভদ্রমহিলা গ্রিক ভাষায় বলেছিলেন। ভদ্রমহিলার কথা শুনে সেই বন্দী ভদ্রলোক তাঁর গায়ে যত জোর ছিল তা দিয়ে তাঁর মুখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেন। 'সোফি, সোফি,' ভদ্রলোক কাতরভাবে বললেন। ভদ্রমহিলা দৌড়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেই হ্যারল্ড ছোকরা এসে ভদ্রমহিলাকে ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। আর হ্যারল্ডের সঙ্গী দুষ্ট প্রকৃতির লোকটা যাকে পল বলে মহিলাটি ডেকেছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললেন। না খেতে পেয়ে পল রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওই লোকটার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পারবে কেন ? লোকটা পলকে টানতে টানতে অন্য দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন শুধু আমি একা। আমার মনে হল যে, এই সুযোগে একটু সুলুকসন্ধান করে কী কাণ্ড হচ্ছে তা দেখা যেতে পারে। বরাত ভাল বলতে হবে যে, আমি সত্যি সে-রকম কোনও চেষ্টা করিনি। মাথা তুলতেই দেখি সেই বুড়োটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসছে।

"'মিঃ মেলাস, আমাদের যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের খুবই গোপন কথা আপনাকে বিশ্বাস করে বলেছি। ব্যাপারটা শুধু গোপনীয়ই নয়, ব্যক্তিগতও বটে। আপনাকে বিরক্ত করতে হল এইজন্যে যে, আমাদের যে গ্রিক-জানা বন্ধুটি এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ায় তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে। তাই তাঁর বদলে গ্রিক-জানা আর-একজন লোকের সাহায্য আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। আপনার কথা আমরা নানা জায়গায় শুনেছি।'

"লোকটার এ-কথার আমি আর কী উত্তর দেব। তাই চুপ করেই রইলুম।

"লোকটা আমার কাছে সরে এসে বললে, 'এই খামে পাঁচ সভ্‌রেন আছে। আমার মনে হয়, আপনার কাজের মজুরি হিসেবে এটা নেহাতই কম হয়নি।' তারপর সেই রকম হাসতে হাসতে ভদ্রলোক আমার বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এসব কথা ঘুণাক্ষরে যদি কাউকে···কোনও লোককে আপনি বলেন তো আপনার অদৃষ্টে কষ্ট আছে। আর সে যে কী কষ্ট, তা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।'

"মিঃ হোমস্, ওই লোকটার চেহারা যে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু তা কিন্তু নয়, তবুও ওর হাবভাব, হাসি দেখে আমার মনে যে কী দারুণ ভয় আর ঘেন্না হচ্ছিল তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। লোকটা তখন আলোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে ওকে আমি ওই প্রথম ভাল করে দেখতে পেলুম। লোকটার চোখমুখে একটা ধূর্ত ভাব। গায়ের রঙ হলদেটে। মুখে দাড়ি-গোঁফ। কথা বললেই ওর ঠোঁট আর চোখের পাতা কাঁপে। সেন্ট ভিটাস অসুখ হলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। আমার মনে হল, কথায়-কথায় ও যে ওইরকম হেসে ওঠে, তারও কারণ বোধহয় কোনও স্নায়বিক দৌর্বল্য। কিন্তু যেটা দেখলে ভয় হয়, সেটা হল লোকটার চোখ দুটো। ওর চোখের রঙ ঠিক ইস্পাতের মতো চকচকে। সেই চোখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ থেকে একটা নিষ্ঠুর শয়তানি ভাব ঠিকরে বেরোচ্ছে।

"'আপনি যদি এ-সব কথা কাউকে বলেন তো সে-খবর আমরা পাবই,' লোকটা বললে। 'আমাদের এমন অনেক লোক আছে যাদের কাজই হচ্ছে খবর সংগ্রহ করা। যাক, আপনার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার বন্ধু আপনাকে পৌঁছে দেবেন।'

"আমাকে আবার প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে হলের ভেতর দিয়ে এনে গাড়িতে চাপিয়ে দিলে। বাড়ির সামনের বাগানটা এক পলকের জন্যে দেখতে পেলুম। আমার ঘাড়ের কাছে হ্যারল্ড ল্যাটিমার। হ্যারল্ড আমাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিলে। তারপর আমার সামনের সিটে বসল। গাড়ির সব জানলা বন্ধই ছিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ি চলছে তো চলছেই। মনে হল, গাড়ি যেন আর থামবে না। গাড়ি যখন থামল তখন মাঝরাত্তির।

"'মিঃ মেলাস, আপনাকে এখানেই নেমে যেতে হবে,' হ্যারল্ড ল্যাটিমার বললে। 'আপনার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে নামিয়ে দিতে হল বলে খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। একটা কথা

বলি। আপনি যদি এই গাড়িটা অনুসরণ করেন তবে আপনার ভীষণ বিপদ হবে।'

"কথাটা বলেই হ্যারল্ড ল্যাটিমার গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। গাড়ি থেকে আমি মাটিতে পা দিতে-না-দিতেই কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে সপাং করে চাবুক মারলে। ঘোড়াটা জোরে ছুটতে শুরু করলে। আর-একটু হলে আমি পড়ে যেতুম। একটু ধাতস্থ হয়ে আমি আমার চারপাশটা দেখে নিলুম। আমাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছে সেটা একটা বিরাট মাঠ। মাঠের মাঝে-মাঝে ঝোপঝাড়। আর বহু দূরে, মনে হল লোকালয় রয়েছে। দূরে লোকালয়ের দু-একটা দোতলা বাড়ির ওপরতলায় আলো জ্বলছিল। মাঠের আর-একদিকে তাকাতে দেখি দূরে রেলওয়ে সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে।

"যে গাড়িটা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল, সেটা আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। গাড়িটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আমি সেই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এ কোথায় আমি এসে পড়লুম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম বলতে পারব না, হঠাৎ খেয়াল হল কেউ যেন অন্ধকারে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতে দেখলুম যে, সে একজন রেলের কুলি।

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এ জায়গার নাম কী?'

"'ওয়ান্ডস্‌ওয়ার্থ, কমন,' লোকটি বললে।

"'এখান থেকে লন্ডনে ফেরবার ট্রেন পাওয়া যাবে?' আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম।

"'যদি আপনি মাইলখানেক মতো হেঁটে ক্ল্যপহ্যাম জংশনে পৌঁছতে পারেন তবে লন্ডনের শেষ ট্রেনটা পেতেও পারেন।'

"মিঃ হোমস, এইভাবে আমার সে রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শেষ হল। আমি কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম, কোথায় গিয়েছিলুম, কোনও কিছুই জানি না। আপনাকে যা বললুম তার চাইতে বেশি আর কিছুই জানতে পারিনি। তবে আমার মন বলছে যে, এর মধ্যে জঘন্য ধরনের কোনও ষড়যন্ত্র আছে। আর সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে যে, ওই গ্রিক ছোকরাটিকে সাহায্য করা দরকার। তাই পরের দিনই সক্কালে আমি মিঃ মাইক্রফট হোম্‌সকে সব কথা বলি। পরে অবশ্য পুলিশকেও ব্যাপারটা জানাই।"

মিঃ মেলাস চুপ করলেন। মিঃ মেলাস যা বললেন তা তো গল্পের বইয়ে পড়া যায়। সত্যি-সত্যি এসব হয় নাকি? আমরা তো শুনে একদম থ। শার্লক হোম্‌সই কথা বললে।

মাইক্রফটের দিকে তাকিয়ে শার্লক হোম্‌স বললে, "তুমি কী করলে?"

টেবিলের ওপর একটা 'ডেলি নিউজ' পড়ে ছিল। কাগজটা মাইক্রফট তুলে নিলেন।

"এই বিজ্ঞাপনটা সব কাগজেই বেরিয়েছিল। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি," বলে মাইক্রফট হোম্‌স বিজ্ঞাপনটা পড়লেন, "পল ক্রুটসে নামে আথেন্স নিবাসী এক ভদ্রলোকের কোনও সন্ধান যদি কেউ দিতে পারেন তো তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন। পল ক্রাটিডেস ইংরেজি জানেন না। সোফি নামের কোনও গ্রিক তরুণীর সম্পর্কে কোনও হদিস দিতে পারলেও উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে। এক্স ২৪৭৩।"

"তুমি কি গ্রিক সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি?"

"ওদের কাছে খবর নিয়েছিলুম। ওরা কিছু জানে না।"

"অ্যাথেন্সের পুলিশ দফতরে টেলিগ্রাম করলে কেমন হয়?"

মাইক্রফট হোম্‌স আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বাপঠাকুর্দা সকলেই খুব পরিশ্রমী ছিলেন। শার্লক ওঁদের ধাত পেয়েছে। তারপর শার্লকের দিকে ফিরে বললেন, "শার্লক, এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি তদন্ত করো। যদি কোনও ফয়সালা করতে

পারো তো আমাকে জানিও।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হোম্‌স বললে, "তোমাকে তো জানাবই, মিঃ মেলাসকেও খবর দেব।...ইতিমধ্যে মিঃ মেলাস, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। এই বিজ্ঞাপন যদি ওদের চোখে পড়ে তো ওরা জানবে যে আপনি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"

বাড়ি ফেরার পথে হোম্‌স একবার টেলিগ্রাফ অফিসে গেল। তারপর সেখান থেকে বেশ কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠালে।

হাঁটতে হাঁটতে হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, সন্ধেটা বেশ ভালভাবেই কাটল বলতে হবে। আমার বেশ কয়েকটা ভাল কেসের খবর মাইক্রফটের কাছ থেকে পেয়েছি। যে-রহস্যের কথা এখন শুনলে তার অবশ্য একটা ব্যাখ্যাই হতে পারে। তবে ব্যাপারটার মধ্যে অনেক নতুনত্ব আছে।"

"তুমি রহস্যের সমাধান করতে পারবে মনে করছ?"

"দ্যাখো ওয়াটসন, আমরা যে-সব কথা জানতে পেরেছি তার পরও যদি এই রহস্যের সমাধান না করতে পারি তো সেটাই খুব আশ্চর্যের কথা নয় কি? তুমি তো সব কথাই শুনেছ। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো?"

"খানিকটা ধারণা হয়েছে বটে, তবে খুব পরিষ্কার কিছু নয়।"

"বলো শুনি।"

"আমার মনে হচ্ছে যে, ওই হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে ইংরেজ ছোকরাটা ওই গ্রিক মেয়েটিকে জোরজার করে আটকে রেখেছে।"

"কোথা থেকে ওকে এনেছে?"

"হয়তো অ্যাথেন্স থেকে।"

শার্লক হোম্‌স মাথা নাড়লে, "ল্যামিটার ছোকরা একবর্ণও গ্রিক জানে না। কিন্তু গ্রিক মেয়েটি মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে। তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মেয়েটি অন্তত কিছুদিন ইংল্যান্ডে এসেছে। আর ওই ছোকরা গ্রিসে যায়নি।"

"তা হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মেয়েটি হয়তো ইংল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিল। কোনওভাবে ল্যাটিমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারপর ওই ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়েভালিয়ে নিজের ডেরায় এনে বন্দী করে রাখে।"

"এ-কথাটা যা বলছ তা খুবই সম্ভব।"

"এর মধ্যে ওই পল ক্রাটিডেস ইংল্যান্ডে এসে হাজির হল। আমার বিশ্বাস পল হল ওই মেয়েটির দাদা। ও বোধহয় বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই এসেছিল। তারপর ও বোকার মতো ওই ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর খপ্পরে পড়ে যায়। ওরা ওকেও বন্দী করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ওর ওপর রীতিমত অত্যাচার করতে শুরু করে। আমার মনে হচ্ছে যে, যে-কাগজে ও সই করাবার জন্যে ওরা পলের ওপর অত্যাচার করছে, সেগুলো নিশ্চয়ই কোনও বিষয়-সম্পত্তির মালিকানার কাগজ। হয়তো ওই সম্পত্তি সোফির। পল সোফির দাদা হিসেবে ওই সম্পত্তির দেখাশোনা করে। ল্যাটিমাররা চায় যে, পল এ-সম্পত্তির ভার ওদেরই দিয়ে দিক। তাতে পল ছোকরা রাজি নয়। পলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে একজন দোভাষীর দরকার। ওরা সেই কাজের জন্যে মিঃ মেলাসকে বেছে নেয়। এর আগে হয়তো অন্য কোনও লোকের সাহায্য ওরা নিয়ে থাকবে। পল যে ল্যাটিমারদের হাতে এ-রকম কষ্ট পাচ্ছে তা সোফি জানত না। সেদিন নেহাতই ঘটনাচক্রে সে ব্যাপারটা জেনে ফেলে।"

"চমৎকার ওয়াটসন! চমৎকার! তুমি ঠিকই ধরেছ," শার্লক হোম্‌স বললে, "তা হলে দেখতেই পাচ্ছ যে, সব ক'টা তাসই আমাদের হাতে। যদি ওরা দুম করে কোনও খুনজখম না করে বসে তো ওদের ধরে ফেলতে আমাদের অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু ওরা কোথায় কোন্ বাড়িতে আছে, তা তুমি জানবে কী করে?"

"দেখি, আমরা যা ভাবছি তাতে যদি কোনও ভুল না থাকে, আর ওই মেয়েটির নাম যদি সত্যি-সত্যি সোফি ক্রাটিডিস হয়, তবে ওই মেয়েটির সন্ধান পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। আর এই রহস্যের মোকাবিলায় মেয়েটিই আমাদের প্রধান সূত্র। কেননা, ওর ভাইকে তো কেউ চেনে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, হ্যারল্ড ল্যাটিমারের সঙ্গে ওই মেয়েটির পরিচয় বেশ অনেক দিনের। অন্তত বেশ কয়েক সপ্তাহ তো হবেই। তা না হলে ওদের এই আলাপ-পরিচয়ের খবর ওর ভাই পাবে কী করে? আমার মনে হচ্ছে এই খবর পেয়েই ওই ভদ্রলোক গ্রিস থেকে চলে আসেন। যদি ওরা বরাবর একই জায়গায় থাকত তবে মাইক্রফটের বিজ্ঞাপনের একটা না একটা উত্তর আসতই।"

এইরকম কথা বলতে বলতে আমরা একসময়ে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলুম। হোম্‌সই সিঁড়ি দিয়ে আগে-আগে উঠছিল। ঘরের দরজা খুলেই হোম্‌স বেশ চমকে গেল। হোম্‌সের পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে যা দেখলুম, তাতে আমি নিজেও রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ঘরের মাঝখানে একটা আরাম-কেদারায় বসে মাইক্রফট সিগারেট খাচ্ছেন।

"শার্লক ভেতরে এসো। আসুন ওয়াটসন," আমাদের অবাক হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে-হেসে মাইক্রফট বললেন। "শার্লক, তুমি ভাবো যে, এত নড়াচড়া করবার ক্ষমতা আমার নেই, তাই না? কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ হয়েছে।"

"তুমি এখানে এলে কী করে?"

"আমি গাড়িতে এসেছি।"

"তা হলে নতুন কোনও খবর আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে একজন চিঠি লিখেছে।"

"আচ্ছা।"

"হ্যাঁ। তোমরা চলে যাবার একটু পরেই চিঠিটা এল।"

"চিঠিতে কী লিখছে?"

মাইক্রফট হোম্‌স পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন।

"এই যে চিঠিটা," মাইক্রফট বললেন, "চিঠিটা রয়্যাল ক্রিম কাগজে 'জে' কলম দিয়ে লেখা। যিনি লিখেছেন তিনি একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ভাল নয়। ভদ্রলোক লিখছেন, 'মহাশয়, আপনার আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের উত্তরে জানাই যে, যে-মহিলাটির কথা আপনি লিখেছেন তাঁকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি। যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন তো ওঁর জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমি আপনাকে বলতে পারি। এখন ওই ভদ্রমহিলা আছেন বেকেনহ্যামের দ্য মারট্‌লসে। আপনার বিশ্বস্ত জে, ডাভেন পোর্ট।' (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকটিকিট

ডাকটিকিট কীভাবে ছাপা হয়

প্রথম-প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হত লাইন এনগ্রেভিং বা রিসেস প্রিন্টিং পদ্ধতিতে। এ ব্যাপারটি ছিল মোটামুটি সহজ। টিকিটের নকশাটি উলটোভাবে একটি ধাতুর ব্লকের ওপরে খোদাই করা হত। একে বলা হত 'মাস্টার ডাই'।। এ-থেকে যে অংশটি ছাপা হবে তা কেটে ফেলা হত। এতে ছাপার অংশটি একটু ভেতরে বা রিসেস-এ থাকত। এরপর এই প্রথম মাস্টার ডাই থেকে পঞ্চাশ-একশোটি 'ডাই' তৈরি করে নেওয়া হত ধাতব পাতের উপর। ছাপার সময়ে রিসেসড্ অংশে রোলারের সাহায্যে কালি দেওয়া হত। এতে ডাই থেকে কাগজে পরিষ্কার ছবি উঠে আসত।

প্রথম দিকে ডাকটিকিট ছাপার আর-একটি পদ্ধতি ছিল টাইপোগ্রাফি। এতে ছাপা-অংশটি উঁচু হয়ে থাকে এবং ধাতুর পাতের উপর উঁচু হয়ে থাকা অংশটিতে রোলার দিয়ে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপা হত, অনেকটা আমাদের সাধারণ রাবার-স্ট্যাম্পের মতো। এই সব ধাতব পাতের উপর যে নকশা হত তা থেকেও ডাক বিভাগ প্রুফ ছেপে দেখতেন। একে বলা হত ডাই প্রুফ। ভারতের প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে। এতে ছাপার অংশটি একেবারে সমতল থাকত। প্রথম দিকে ডাই তৈরি করা হত পাথরের টুকরোর উপর, পরে বিশেষ ধরনের ধাতু ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যুগে ফোটোগ্রেভিওর প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগ টিকিট ছাপা হয়। এটা অনেকটা রিসেস পদ্ধতিতে ছাপার মতো। প্রথমে

ভারতীয় ডাকটিকিটের 'ডাই প্রুফ'

নকশা থেকে ফোটো তুলে অ্যাসিডের সাহায্যে তামার রোলারে তা ফুটিয়ে তোলা হয় এবং তা থেকে ছাপা হয় ডাকটিকিট। এরপরে এল রোটারি প্রেস। এতেও ছাপার অংশটি থাকে তামার সিলিন্ডার-এ। ভিন্ন-ভিন্ন রঙের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। ডাকটিকিট সাধারণত একপাতায় অনেকগুলি করে ছাপা হয়। তারপর কালি শুকিয়ে গেলে, দেওয়া হয় পারফরেটিং মেশিনে, ডাকটিকিটের চারধারে ফুটো করা হয়। এরপরে পিছনে আঠা লাগিয়ে পাঠানো হয় ডাকঘরে। ছাপার সময় ডাকটিকিটে ভুল-ভ্রান্তি থেকেও যায়। এ-নিয়ে পরে বলব।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাজিক

রং বদলের খেলা

তিনটে পুরনো তাস নাও। একটার দু'পিঠে সাঁটো লাল কাগজ। অন্য দুটোর একদিকে লাল, অন্যদিকে হলুদ কাগজ লাগাও। দুটো রুমাল বন্ধুদের দেখিয়ে টেবিলের দু'দিকে পেতে রাখো। এবার ডান হাতে ধরো দু'পিঠ লাল তাসটা। আর বাঁ হাতে বাকি দুটো তাস এমনভাবে ধরো, যাতে একটার লাল ও অন্যটার হলুদ রং থাকে দর্শকদের দিকে। হাত দুটো উলটে তাসের উলটোদিকগুলো দেখাও বন্ধুদের। তারা দেখবে, তোমার ডান হাতের তাসটার উলটোদিকটা লাল, আর বাঁ হাতে ধরা আছে একটি লাল ও

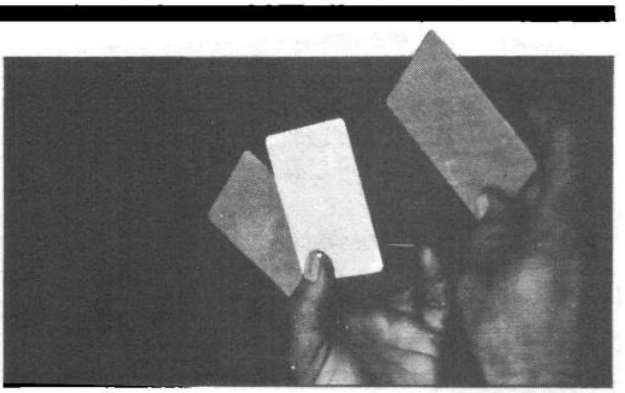

একটি হলুদ তাস। ফলে স্বাভাবিকভাবে তারা যা ভাববে তা হল, বাঁ হাতের তাস দুটির একটি দু'পিঠে লাল, অন্যটি দু'পিঠে হলুদ। এবার বাঁ হাতের তাস দুটোকে দু'দিকের রুমালের তলায় রাখো। রাখার সময় মুখে বলো, এদিকে রাখলাম লাল তাস, ওদিকে হলুদ। দর্শকরাও তাই দেখবে। কিন্তু রাখার সময়ই তাস দুটো সবার অজান্তে তুমি উলটে রাখছ রুমালের তলায়। এবার সামান্য মূকাভিনয়। খালি হাতে এদিকের তাস তুলে ওদিকে রাখবে ভঙ্গি করছ, ওদিকের তাস এদিকে। সবশেষে রুমাল তুলে দেখিয়ে দাও লাল তাসের জায়গায় হলুদ ও হলুদ তাসের জায়গায় লাল তাস এসে গেছে।

(জাদুকর) তাপস বসু

পশ্চিমোত্থানাসন

উপকারিতা : প্রত্যহ সকালে ডাইরিয়া অর্থাৎ পাতলা দাস্ত হলে, এ আসন করলে ডাইরিয়া ভাল হয়ে যায় । দাস্তও হয় স্বাভাবিক । যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয়ে গেলে, এ আসনটি করতে পারলে, সেগুলি সুস্থ ও আকারে স্বাভাবিক হয় । এবং যকৃতের দুর্বলতার জন্য যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তা হলে পশ্চিমোত্থানাসনে এর নিরাময় হয় । এ ছাড়া প্যাংক্রিয়াস থাইমাস গ্ল্যান্ড ও কিডনিকে কিছুটা সুস্থ রাখে । আমাশয় রোগের প্রথম অবস্থায় এবং আমাশয় যদি খুব পুরনো হয়ে যায়, যাকে ক্রনিক ডিসেনট্রি বলে, সে অবস্থায় এ আসন করলে উপকার পাওয়া যায় । কিন্তু আমাশয় অথবা রক্ত আমাশয় রোগের বাড়াবাড়ি হলে এ আসন করা উচিত নয় । পশ্চিমোত্থানাসন করলে পেটের পেশিগুলি সুগঠিত ও কর্মঠ হয় । সকলের এটা জানা উচিত, পেটের শতকরা ৯০টি রোগ

পেটের ওপরের পেশিগুলির দুর্বলতার জন্যই হয়ে থাকে । যেমন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বায়ুজমা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাতলা দাস্ত, হার্নিয়া, যকৃৎ-প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া, হজমের নাড়িগুলি জড়িয়ে যাওয়া, অম্ল, নানা ধরনের আমাশয় প্রভৃতি রোগ পেটের ওপরের পেশিগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেড়ে ওঠে । সেইজন্য পেশিগুলিকে সবল ও কর্মঠ রাখা একান্ত প্রয়োজন । পশ্চিমোত্থোনাসনটি করার আগে একটি কথা মনে রাখা উচিত । সাধারণত দেখা যায়, অনেকে এ আসনটি ঠিকভাবে করতে পারে না বলে যতটা ফল পাওয়া উচিত তা পায় না । এ আসনটি করতে গিয়ে উরুর সঙ্গে তাদের বুক ও পেট না ঠেকে মাঝখানে খানিকটা ফাঁক থেকে যায় । তাতে যকৃৎ ও প্লীহার ওপর কোনও চাপ পড়ে না বলেই, ওই দুটি যন্ত্র এবং সেইসঙ্গে হজমের অন্ত্রগুলিরও কোনও উন্নতি হয় না । এ আসনটি প্রথম প্রথম করার সময় অনেকে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে পারে না, দম বন্ধ করে ফেলে । শায়িত অবস্থা থেকে ওঠার সময় নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে, দম বন্ধ রেখে উঠে বসে তাদের এই আসনটি করা উচিত । আসনটি ঠিকমতো রপ্ত হলে আস্তে-আস্তে অল্প-অল্প করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া অভ্যাস করতে হবে । মনের অস্থিরতা চঞ্চলতা ও উদ্যমহীনতা দূর করতে এই আসনটি খুব সাহায্য করে ।

বিশ্বনাথ ঘোষ
প্রেমসুন্দর দাস
ফোটো : দিব্যসুন্দর দাস

ফুল ফুটুক ও নবগীতবাণীর অনুষ্ঠান

আমাদের ছোটবেলায় চারদিকে এমন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছড়াছড়ি ছিল না । আমরা পড়তাম পাঠশালায় । সেই পাঠশালায় ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ে, তারপর বৃত্তি পরীক্ষা দিতে যেতাম । আমার মনে আছে ১৯৬৪ সালে আমরা যখন বৃত্তি পরীক্ষা দিই, তখন ইংরেজিতে সাতটা বারের নাম আর বারোটা মাসের নাম প্রশ্নপত্রে এসেছিল । Thursday জাতীয় বানান মুখস্থ করতে আমাকে রোজ ভোর চারটেয় মা ঘুম থেকে ডেকে দিতেন ।
আর এখনকার বাচ্চারা তিন বছর বয়স থেকেই কিন্ডারগার্টেনে পড়ার ফলে ইংরেজিটা খুব ভাল করে শিখতে পারছে । Thursday বানান এখন ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরাই বলে দিতে পারে ।

এই কিন্ডারগার্টেন নামকরণ কীভাবে হল, অনেকেই হয়তো সে-কথা জানে না । চার থেকে ছ' বছরের মাঝামাঝি বয়সের বাচ্চাদের জন্য যে স্কুল, তার

নামই কিন্ডারগার্টেন । ফ্রেডরিক ফ্রোয়েবেল নামে এক জার্মান শিক্ষক প্রায় এক শতক আগে প্রথম কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । জার্মান ভাষায় কিন্ডারগার্টেন মানে শিশু-উদ্যান । পরে মারিয়া মন্টেসরি নামে এক মহিলা কিন্ডারগার্টেনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন । ফ্রোয়েবেল প্রথমে একটু বেশি বয়সের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন । কখনও কখনও ওরকম কোনও ছাত্রকে নিয়ে অসুবিধায় পড়লে ভাবতেন, ছাত্রটি শিশুবয়সে ভুল শিক্ষা পেয়েছে, আর সেইজন্যই তাকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে ।

ফ্রোয়েবেল বুঝতে পারলেন, খেলা জিনিসটা শিশুরা সবচেয়ে ভালবাসে, তার মধ্যেই তাদের শিক্ষা দিতে হবে ।

কিন্ডারগার্টেনে শিশুদের স্বনির্ভর হতেও শেখানো হয় ।

তার ফলে শহরে ও শহরতলিতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে । 'ফুল ফুটুক নার্সারি কে· জি স্কুল' এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত । স্কুলটি উত্তর কলকাতার কালিন্দী হাউসিং এস্টেটে । কিছুদিন আগে নাগের বাজারের অনন্ত দত্ত মেমোরিয়াল হলে ফুল ফুটুক আর নবগীতবাণী তাদের অষ্টম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করল । ফুল ফুটুক স্কুলে এখন অজস্র কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠছে । নবগীতবাণীও এখন আর হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটছে না । প্রধান অতিথি, সভাপতি, প্রধানাশিক্ষিকা, মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষা এঁদের সকলের ভাষণ থেকেই তা বোঝা গেল ।
এই প্রতিষ্ঠানটি যে এখন উন্নতির শীর্ষে তাও বোঝা গেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য ও গান পরিবেশনের দক্ষতা দেখে ।

মায়া সিদ্ধান্ত

সুকুমার রায়ের সাহিত্য ও ছবি নিয়ে চমৎকার আলোচনা

সুকুমার রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দূরদর্শনের দুটি অনুষ্ঠান দেখেছি। দুটি নয়, আসলে দেড়টি। প্রথম অনুষ্ঠানটি সবটা দেখতে পারিনি লোডশেডিং-এর জন্য। প্রথমটির যেটুকু দেখেছি, তাতে সেটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়েছে। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গি চমৎকার। গানটিও ভাল, তবে একটু মন্থর মনে হয়েছে। ঠিক হাসির গানের মেজাজ পেলাম না। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের ভাল লেগেছে। এর পর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক আলোচনা চক্রে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং জ্যোতিভূষণ চাকীকে দেখা গেল। দেখলাম এবং শুনলাম। জ্যোতিবাবুর ভূমিকা ছিল কৌতূহলী প্রশ্নকর্তার, আর অন্নদাশঙ্কর রায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের বক্তব্য বলছিলেন আন্তরিকভাবে।

ওঁদের, বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোচনায় সুকুমার রায়ের আঁকা চিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধ বিস্ময়ের কথা শুনতে পেলাম। সুকুমার রায় সম্পর্কে আলোচনার এই বিষয়টি প্রায়ই উল্লেখ করা হয় না, এটা আমাদের একটা ত্রুটি। এই সঙ্গে সুকুমার রায়ের প্রকাশিত ছবি এবং চলচ্চিত্ত-চঞ্চরির একটি দৃশ্য অতি চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সুকুমার রায়ের উপর লুইস ক্যারল-এর প্রভাব প্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথা বললেন। তিনি বললেন, লুইস ক্যারল কেবল সুকুমার রায় নয়, পৃথিবীর সাহিত্যের উপরই একটা অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিলেন। উদ্ভট রচনা এবং অঙ্কন প্রসঙ্গে আমরা আর-একজন আশ্চর্য প্রতিভার কথা অনেক সময়েই ভুলে যাই, তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য সুকুমার রায়ের মতো সকলের কাছেই তৃপ্তিকর নন।

তবুও তাঁর উল্লেখ এক্ষেত্রে আমাদের ভাল লেগেছে। এই বয়সেও প্রেমেন্দ্র মিত্র জানালেন, তিনি উদ্ভট কিছু রচনা করবেন। এটি আমাদের পক্ষে ভাল খবর অবশ্যই।

কীভাবে ভাল বাংলা কথা বলতে হয়, এটা আশ্চর্য মনে হলেও, আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না। এমনকী শিক্ষিতদের মধ্যেও শতকরা দু' একজন মাত্র ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারেন, পারেন গলায় মাধুর্য ফোটাতে। গান শেখার মতো কথা বলাও শেখার জিনিস। এটাও একটা শিল্প। বই পড়ে শোনানোর সময়ও যত্ন করে পড়তে হয়, না হলে আসল অর্থ পাওয়া হয় কঠিন। আমাদের দেশে এককালে রামায়ণ, মহাভারত চেঁচিয়ে, স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ার রীতি ছিল। এখন নানা জায়গায় আবৃত্তির চর্চা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কথা বলাও যে একটা চর্চার বিষয় সেটা আমরা অনেকেই মনে রাখি না। হাতের লেখা খারাপ হলে যেমন পড়ার আনন্দ চলে যায়, পড়তে ইচ্ছেই করে না, তেমনই উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি খারাপ হলে শুনতেই ইচ্ছে করে না। এই প্রসঙ্গে ডিসেম্বরের গোড়ায় প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পর্কে আলোচনার কথা উল্লেখ করি। আলোচনা ছিল যেমন তথ্য সমৃদ্ধ, তেমনই বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণেও দুই

বক্তা মুগ্ধ করলেন।

এখন মনে পড়ছে, ডিসেম্বরের গোড়াতেই শিল্প-জগতে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বাংলায় আলোচনা করলেন। এঁরা হলেন বিভাসকান্ত মুখোপাধ্যায়, তপন মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার রায়, শঙ্করপ্রসাদ সিন্‌হা এবং মানবেন্দ্র চক্রবর্তী।

এঁদের কথাবার্তা সাধারণ নয়। এঁরা কেউই অনাবশ্যক ইংরেজি বাদ দিয়ে সম্ভবত একটি বাক্যও বলেননি। হয়তো চেষ্টা করলে পারতেন। আমার মনে হয়, আলোচনা শুরু করার আগে টিভি কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহারের অনুরোধ জানালে তাঁরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন বাংলায় যথাসাধ্য কথা বলতে।

সেদিন যে ইংরেজি কথাগুলি আমি শুনতে পেয়েছি সেগুলির কিছু-কিছু এখানে জানাই। ওঁরা বললেন, সেভেন্টি টু পার্সেন্ট এক্সপোর্ট মার্কেট,কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট মেইন রিকোয়ারমেন্ট, সাপোর্টিং মেজার, লাস্ট ৩৩ বছর, ক্যান ইউ এলিমিনেট ইট ? প্রোডাকশন মেথডস্ ইমপ্রুভ করা, ক্লোজলি রিলেটেড, লেটেস্ট মেশিন, স্কিল যাতে ইমপ্রুভ করা যায়, ওয়ার্কার যারা ইমপোর্টেড, কনস্ট্রেন্টস, ডিউরিং প্রোডাকশন, আফটার প্রোডাকশন, স্যাম্পল, প্রোডাক্টস টেস্ট, কনজিউমার্স ফোরাম, পাবলিকের গ্রিভান্স, টোটাল সংখ্যক, আরও বেটারমেন্ট, কিছু কিছু প্রবলেমস্ তো রয়ে যাচ্ছে, অবভিয়াসলি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য এক প্রসঙ্গে দর্শকের দরবারে শুনলাম, কোনও এক দর্শক বাংলা কথার মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছেন। হয়তো এখন থেকে এই ব্যাপারে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন নেবেন। নভেম্বরের শেষে জানা-অজানা বিভাগে হাওয়া নিয়ে সন্তোষ মিত্রের পরীক্ষাগুলি চমৎকার। ৪ ডিসেম্বর সুন্দর বাংলা ছবি দেখলাম, নাম'দুষ্টু মিষ্টি'। ছবিটির মধ্যে যেমন রয়েছে মজা, তেমনি রয়েছে শিক্ষা। মাঝে মাঝেই টিভি কর্তৃপক্ষকে, সম্ভবত বাধ্য হয়েই, একই অনুষ্ঠান বারবার দেখাতে হয়। যেমন সিক্রেট্স অব দি সি আবার দেখানো শুরু হল। এ নিশ্চয় খারাপ নয়—এ-সব ছবি দু'বার দেখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু যারা একবার দেখেছে, কয়েক মাস আগে, তারা কি এত তাড়াতাড়ি আবার দেখে মজা পাবে ? যদি দেখতেই হয় তা হলে অবশ্য আর কী করার থাকে ! তবে দুষ্টু মিষ্টির মতো ছবি বছরে একবার দেখালে ভালই।

এখন দেখানো হচ্ছে শেক্সপিয়রের 'উইন্টার্স টেল'। অতি চমৎকার অভিনয়। কিন্তু গল্পটা আমার আগে পড়া হয়নি বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। বইটা পড়ে ফেলতেই হবে। তোমরাও একখানা শেক্সপিয়র রচনাবলী সংগ্রহ করে আগে থেকে পড়ে রাখতে পারো। এরপর আরও কোনও নাটক যদি দেখানো হয় ! এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

দিগ্‌দর্শক

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

লর্ড গ্রেস্টোকের, অর্থাৎ টারজানের, জমিদারিরএলাকায় শেয়াল মারার জন্য যারা বেআইনিভাবে ঢুকেছে, তাদের আটকাতে চলেছেন তিনি....

জেনারেল, আমার এলাকায় আপনার এই নিষ্ঠুর খেলা আমি এবারে বন্ধ করব ।

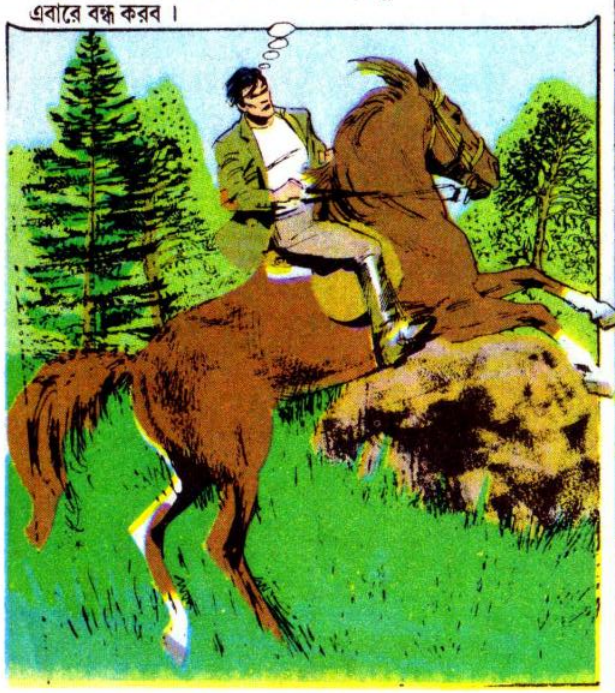

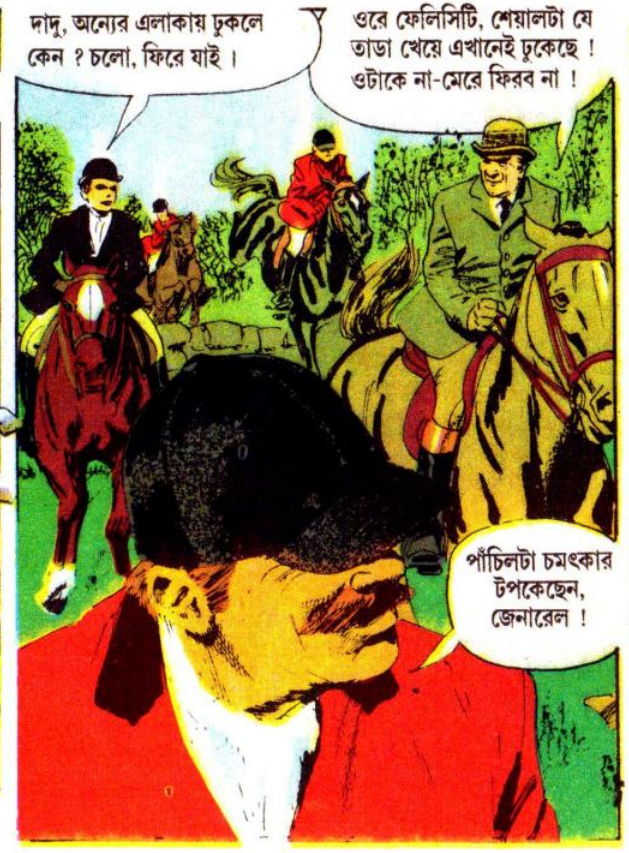

কী রে, তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিস বুঝি ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সর্বনাশ ! কুটুস তো মাথা ঠুকেই মরবে !
যাক, জলে পড়েছে !
ঝাঁপ
ওই আবার ভেসে উঠেছে
ব্রিজের দিকে এগোও ! ওকে বাঁচাতেই হবে !
তাড়াতাড়ি পৌঁছলে বাঁচাতে পারব !
যাক, ধরতে পেরেছি !
খানিক বাদে···
যাক, মাতালটাকে তা হলে বাঁচাতে পেরেছ !
মাতাল ?
তুমি ভাবছ, উঁচুতে উঠে ওর মাথা ঘুরছে ! তা নয়, আমার হুইস্কির বোতল ভেঙেছে ! আর পথে যা পড়েছে, তা-ই চেটে খেয়েছে কুটুস !
!
ফের বজ্জাতি করলে তোমাকে আর বাঁচানো হবে না !
পথ আর ফুরোয় না । শেষে···
এ হল শোর্তেন । লামাদের চিতাভস্ম রাখা হয় ।
দাঁড়ান সাহেব !
থামুন
?
কী ?
?
থামুন !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মার্শাল মনে করেন, বয়কটই সেরা

গৌতম ভট্টাচার্য

'অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি আমরা। আমার মনে হয় অবিলম্বে আইন করে বোলারের রান-আপ কমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওভার-রেট যদি সত্যিই বাড়াতে হয়, তা হলে এটাই হবে এ ব্যাপারে প্রথম এবং সব থেকে যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ। অস্ট্রেলিয়ায় ওই দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলারটি (লারউডের পর এক ফ্র্যাঙ্ক টাইসন ছাড়া আর কাউকে এত জোরে বল করতে দেখিনি) আমাদের সামনে বারবার প্রমাণ করেছে, কম রান-আপ নিয়েও প্রচণ্ড গতিতে বল করা সম্ভব।'

বক্তার নাম ডন ব্রাডম্যান। আর যাঁর সম্পর্কে কথাগুলি বলা, তিনি হলেন ম্যালকম মার্শাল। ব্রাডম্যানের প্রশংসা লোকে সহজে পায় না। কেননা প্রশংসা করার ব্যাপারে তিনি দারুণ হিসেবি। কোনও ক্রিকেটারের দক্ষতা সম্পর্কে দুশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে স্যর ডন মুখ খোলেন না। আর তাই তাঁর প্রশংসা পেতে শুধুই প্রতিভা নয়, বরাতেরও দরকার।

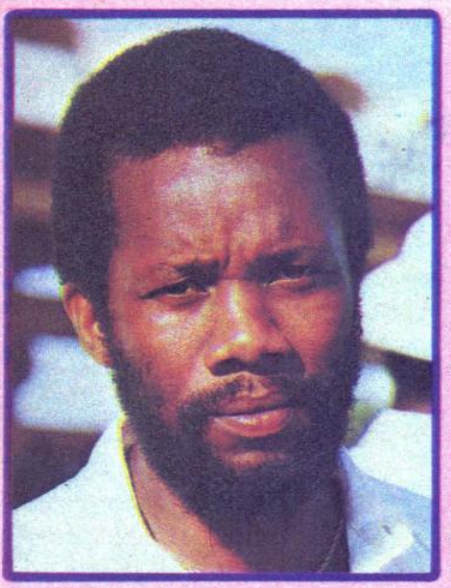

ম্যালকম মার্শাল। ফোটো : সুমন চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বয়ং ব্রাডম্যান যে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানেক-এ মাস আটেক আগে প্রবন্ধ লিখেছেন মার্শাল তা জানতেন না। প্রথম শুনলেন শারজায় আমার মুখ থেকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্য ক্রিকেটারদের তুলনায় মার্শাল অনেক অন্তর্মুখী। মনের ভাব চেপে রাখতে জানেন। কিন্তু ব্রাডম্যান এমন কথা বলেছেন শুনে সেই মার্শালের মুখেও খুশির আভা দেখা গেল। বললাম, শুধু তো ব্রাডম্যান নন, তাবড় তাবড় বিশেষজ্ঞের মুখেও আপনার স্তুতি আমরা শুনেছি। এ সব শুনলে আপনার নিজের কেমন মনে হয়? মার্শাল বললেন,

কপিবুক ক্রিকেটের অনবদ্য নিদর্শন : বয়কটের অন ড্রাইভ। ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

'দেখুন, সত্যি বলতে কী, খুবই ভাল লাগে। কিন্তু কী জানেন, প্রশংসা জিনিসটা ততক্ষণই ভাল, যতক্ষণ আপনি সেটাকে গায়ে মাখছেন না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমের অন্যতম ফাস্ট বোলার হিসাবে আমার কাজ ভাল বল করা। যথাসম্ভব ভাল বল করা। ফাস্ট বোলারদের সম্পর্কে লোকের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। সবাই ধরে নেয় ওরা যেন যন্ত্র। সব সময় ওদের উইকেট পেতেই হবে। এই যে সব সময় একটা আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশা, এটা মেটানো খুব কঠিন। তবু মনপ্রাণ ঢেলে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাই। কাজেই কে প্রশংসা করল, কে সমালোচনা—অত খুঁটিয়ে দেখার সময় আমার নেই।'

এই যে আপনাদের চার ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ ওঠে, আপনারা ওভার-রেট মন্থর করে দিচ্ছেন, ক্রিকেটকে হত্যা করছেন—এ নিয়ে আপনার কী বক্তব্য ? মার্শাল এবার একটু ঝাঁজালো গলায় বললেন, 'সাংবাদিকদের কাজ লেখা। যথাসম্ভব বিতর্ক সৃষ্টি করে কাগজ বিক্রি করা। তাঁরা তা সাধ্যমতো করেন। আমিও আমার কাজ সাধ্যমতো করি। এসব নিয়ে আমি মাথাও ঘামাই না। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি। অধিকাংশ সমালোচনা আসে ইংল্যাণ্ড বা অস্ট্রেলিয়া থেকে, যারা এককালে প্রচুর ফাস্ট বোলার তুলেছে। যেহেতু এখন ওদের দেশ থেকে আর ফাস্ট বোলার বেরোচ্ছে না তাই এত ঈর্ষা। বলে ওভার-রেট বাড়াও ? আচ্ছা মজা, কেন বাড়াব বলুন তো ? মনে করুন, আমি একজন বিক্রেতা, বাজারে মাল বিক্রি করি। যে গতিতে আমি বাজারে মাল আনছি বা বিক্রি করছি তাতে প্রচুর লাভ হচ্ছে। এখন যদি আরও তাড়াহুড়ো করতে যাই, প্রচুর মাল কম সময়ের মধ্যে বাজারে নিয়ে আসি, তা হলে কি আমি বুদ্ধিমান না বোকা ? আমার মতে, বোকা। যখন এমনিতেই লাভ হচ্ছে সেখানে হাঁকপাক করার দরকার কী ? খেলাতেও তা-ই। যখন এমনিতেই ভালভাবে জিতছি, তখন শুধুশুধু হাঁকপাক করতে যাব কেন ?

গত আট বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সব ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বল করার অভিজ্ঞতা হয়েছে মার্শালের। এবং তাঁর বিচারে সব থেকে কঠিন ব্যাটসম্যান হচ্ছেন জিওফ বয়কট। মার্শালের মতে ভিভ রিচার্ডস-গ্রিনিজ-গাওস্কর এবং গ্রেগ চ্যাপেল সবাই দারুণ ব্যাটসম্যান। কিন্তু বয়কটের মতো আর কাউকে আউট করতে এত বেগ পেতে হয়নি। কেন বয়কটকেই আপনার সেরা মনে হয়, জানতে চাইলাম ? মার্শাল জানালেন, 'এর কারণ দুটো। প্রথমত,বয়কট কোনও ঝুঁকি নেয় না,দুই, ওর ধৈর্য অসম্ভব বেশি। এত বেশি যে, তা কল্পনাও করা যায় না।'

বললাম, রিচার্ডস বা গ্রিনিজ যদি বিপক্ষে থাকতেন, তা হলে কি আপনাদের চারজনের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যেত না ? মার্শাল বললেন, 'আমি ওভাবে ব্যাপারটাকে দেখি না। আমার কাজ বল করা। বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, তার বিপক্ষেই আমি তৈরি। আর রিচার্ডস-গ্রিনিজকে ভয় পেতে যাব কেন ? শেল শিল্ড বা স্থানীয় ম্যাচে তো ওদের বিপক্ষে বল করতেই হয়। জানিয়ে রাখি, সেখানেও কিন্তু ফাস্ট বোলাররাই কর্তৃত্ব করে।'

শেষ প্রশ্ন ছিল, একজন ফাস্ট বোলার যখন বেধড়ক পিটুনি খাচ্ছে, তখন তার কী কী মনে রাখা উচিত ? এই প্রথম প্রাণখোলা হাসি হাসতে দেখলাম মার্শালকে। হাসির তোড় কমতে বললেন, 'এক,মনঃসংযোগটা হারালে চলবে না। দুই, পিটুনির মুখেও চেষ্টা করে যেতে হবে যেন লাইন-লেংথটা যথাসম্ভব ঠিক থাকে। আর তিন, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তুমি যে মার খেয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছ, এটা ব্যাটসম্যানকে একদম বুঝতে দেবে না। কিছুতেই না। নইলে কিন্তু ব্যাটসম্যান মাথায় চড়ে বসবে।'

লর্ডস ও এম· সি· সি-র দু'শো বছর

এ-বছর লর্ডস ও এম· সি· সি-র দু'শো বছর উপলক্ষে বেশ কিছু বই ও স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অগস্ট মাসে এম· সি· সি· একাদশের সঙ্গে বিশ্ব একাদশের পাঁচ দিনের এক বিশেষ ক্রিকেট-ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছে। ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের বিশিষ্ট জীবনধারা ও জীবনবোধের একটা পরিচয় পাওয়া যায় বলে, কেউ কেউ দাবি করেন। অনেকেই তাই ভেবেছিলেন। লর্ডস ও এম· সি· সি-র গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণে ব্রিটেনের ডাকবিভাগ বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন। কিন্তু ডাকবিভাগের দিক থেকে তেমন কোনও উদ্যোগ এখনও দেখা যায়নি।

১৯৮৬-তে হকি অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ এবং কমনওয়েলথ গেম্‌স উপলক্ষে বিশেষ ডাকটিকিট অবশ্য ব্রিটেনে বেরিয়েছে। পরের বছরই তাই আবার একটি খেলা নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ১৯৭৩ ও তার সাত বছর ব্যবধানে ১৯৮০-তে অবশ্য ব্রিটেনের ডাকবিভাগ ক্রিকেট নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন। সাত বছরের ব্যবধানে আবার তাই ক্রিকেট নিয়ে ডাকটিকিট বের করা যেতে পারে বলে একটি মহল মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের ডাকবিভাগ তাতে কর্ণপাত করেননি।

১৯৭৩-এ ডবলিউ· জি· গ্রেসকে নিয়ে তিনটি ডাকটিকিটের একটি সেট প্রকাশ করেছিলেন, ব্রিটেনের ডাকবিভাগ। সেই ডাকটিকিটে লেখা ছিল 'কাউন্টি ক্রিকেট ১৮৭৩-১৯৭৩'। ডাকবিভাগ থেকে তখন জানানো হয়, কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপ শুরুর একশো বছর উপলক্ষে তাঁরা এই ডাকটিকিট প্রকাশ করলেন। আসলে সেটা ছিল কাউন্টি ক্রিকেটের বিভিন্ন নিয়মকানুন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের সম্মতি ঘোষণার শতবর্ষ। কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপ যে ঠিক কবে থেকে শুরু হল, তা বলা কঠিন।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের ১০০ বছর উপলক্ষে ১৯৮০-তে যে ডাকটিকিট বেরোয়, তা নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। লর্ডসে সেন্টেনারি টেস্ট শুরু হয়েছিল ওই বছর ২৮ অগস্ট। স্মারক ডাককিকিট বেরিয়েছিল তারও এক মাস পরে। রানির মায়ের ৮০-তম জন্মদিনের জন্য বিশেষ ডাকটিকিট বের করতে গিয়েই ব্রিটেনের ডাকবিভাগ ক্রিকেটের ওই ডাকটিকিট প্রকাশে দেরি করেন। ক্ষতিপূরণের জন্য অবশ্য লর্ডসের নার্সারি গ্রাউন্ডে ডাকবিভাগ একাদশের সঙ্গে ক্রিকেট - লেখক একাদশের বিশেষ এক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় সে-খেলা জমে ওঠেনি।

আশিস উপাধ্যায়

এরা সুপারফাইটার্স!

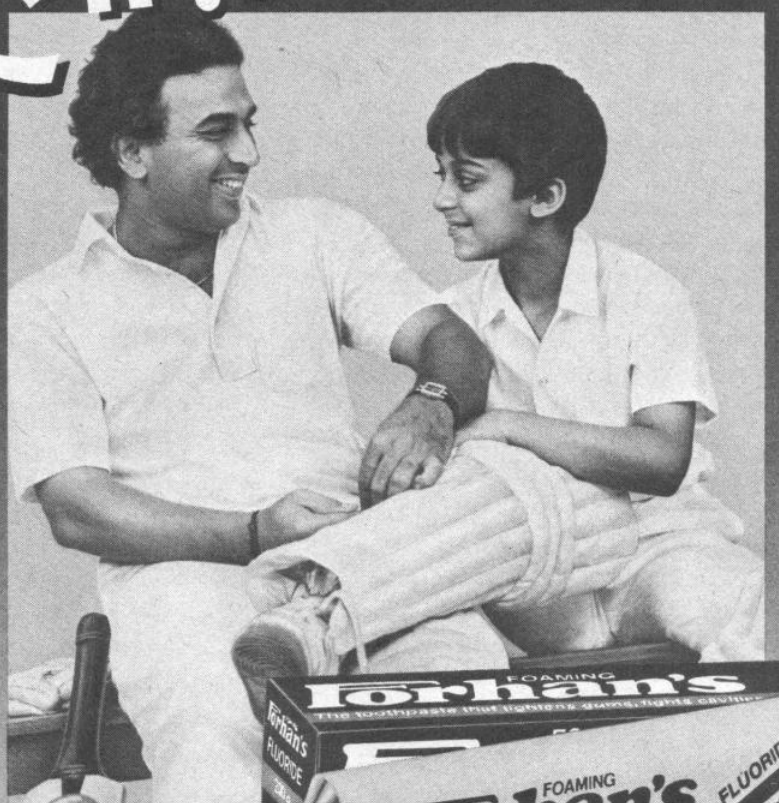

ওঁর কোটি-কোটি ফ্যানেরা বলে আমাদের 'লিট্‌ল মাস্টার'। সেরা আত লড়িয়ে খেলোয়াড়। আর সারা জগত বলে, এই সুপারব্যাটসম্যান চিরকালের এক সেরা ক্রিকেটার। কিন্তু, সুনীল গাভাসকর নিজে বলেন, "আমি একজন সুপারফাইটার। আমি চাই, আমার ছেলেও হয়ে উঠুক তাই। আর সেই কারণেই ওর ছোট্ট বয়স থেকেই আমি শেখাচ্ছি ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড টুথপেষ্ট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজতে– দাঁতের ক্ষয় রোধে এ সত্যিই এক সুপারফাইটার।" দাঁতের ফাঁক-ফোকরে খাদ্যকণা ঢুকে ব্যাকটিরিয়া জন্মায়। আর তার নি:সৃত অ্যাসিডে দাঁতের ক্ষয়রোগ হয়। ফরহ্যান্স সুপারফাইটার-এর ফ্লোরাইড চমৎকার ভাবে কাজ করে দাঁতের এনামেলকে মজবুত ভাবে সুরক্ষিত রাখে। যার ফলে ব্যাকটিরিয়া জন্মায় না আর অ্যাসিড-ও জমে না। আর ফরহ্যান্স-এর বিশেষ অ্যাস্ট্রিনজেণ্ট মাড়িকে আঁটসাঁট মজবুত রাখে। যার ফলে দাঁত মাড়িতে শক্ত-মজবুত, অনড় হয়ে বসে থাকে ও দীর্ঘকাল মুক্তোর মত ঝক্‌মকে রাখে। সুনীলের কথায়– "আমার ছেলে আছে ফরহ্যান্স-এর যত্নে। আপনি কি করছেন সে ব্যাপারে?"

ফরহ্যান্স

ম্যাকেনরো

কি ফর্মে ফিরবেন

সুভাষ সরকার

টেনিস ম্যাকেনরোকে চায়। কথাটা বলেছেন স্বয়ং বিয়র্ন বর্গ। বর্গ সেই সঙ্গে এই কথাটাও জানিয়েছেন যে, ম্যাকেনরোর আবার পুরোদস্তুর ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সম্ভাবনা কতটুকু ? ম্যাকেনরোও নিজে বলেছেন, 'আমার শরীর যদি সুস্থ থাকে, আমি যদি ফিট থাকি, তা হলে আমার প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিযোগিতা হবে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন।' টাটুম-এর সঙ্গে বিয়ে এবং সন্তান কেভিন-এর জন্ম প্রভৃতি ঘটনায় ম্যাকেনরো টেনিস-দুনিয়া থেকে মাস ছয়েক নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা আমার আত্মনির্বাসন !' কিন্তু ছ' মাস পরে প্রতিযোগিতার আসরে ফিরে এসে প্রথম রাউন্ডেই তিনি পরাজিত হলেন। ওই পরাজয় এবং ঠিক তার পরে ফ্লাশিং মেডো-য় ইউ· এস· ওপেনে আবার প্রথম রাউন্ডে হার ম্যাকেনরোর ফিটনেস সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছিল বিশেষজ্ঞদের। ম্যাকেনরো নিজেও ছিলেন সন্দিহান। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ইউ· এস· ওপেনে অ্যানাকন-এর কাছে হেরে যাবার পর ম্যাকেনরো হোটেলে নিজের ঘরে বসে টিভিতে বাস্কেটবল দেখছিলেন। টিভির পর্দার সামনে বসে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়দের শারীরিক দক্ষতা দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এরা গরিব কিন্তু এত সক্ষম। এরা টেনিস খেলে না কেন ? আর্থার অ্যাস-এর পর কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তেমন আর কোনও টেনিস খেলোয়াড় দেখা যাচ্ছে না কেন ? ভাবছি, অবসর নেবার পর কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের নিজের খরচে প্রশিক্ষণ দেব। না হলে ওরা এত টাকা পাবে কোথায় ? টেনিসে তো খরচা অনেক।'

এটা তো ম্যাকেনরোর অবসর সময়ের চিন্তা। ফিরে আসি তাঁর পারিবারিক জীবন প্রসঙ্গে। ম্যাকেনরো সব জায়গাতেই স্ত্রী ও আদরের কেভিনকে নিয়ে যান। এর ফলে প্রথম দিকে খেলায় ততটা মন দিতে পারতেন না। এখন অবশ্য তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন। কেভিনের পিতা জন ম্যাকেনরোর সাংসারিক দায়দায়িত্ব বাড়লেও, টেনিস-কোর্টেও তো তাঁর সমান দায়িত্ব আছে। রগচটা খেলোয়াড় হিসেবে এমনিতেই তাঁর অনেক বদনাম। হাজার হাজার ডলার জরিমানা তাঁকে দিতে হয়েছে বহুবার। অবশ্য জিমি কোনর্সও কম যাননি। তবে এ ব্যাপারে ম্যাকেনরো তাঁকেও টেক্কা দিয়েছেন। ম্যাকেনরো ১৯৮৬-র অগস্ট মাস থেকে ফিরে এসেছেন প্রতিযোগিতার আসরে। দেখা গেল, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছোট· তিনটি প্রতিযোগিতা জিতেছেন, স্বদেশের বাইরেও খেলেছেন, বেকারের কাছে হেরেছেন, আর জিতেছেন বেলজিয়ামে এবং সেখানেই পেয়েছেন হিরের র‍্যাকেট। কিন্তু বছর শেষ হতে না হতেই, ম্যাকেনরোর বদমেজাজের পুরনো ফর্মটা ফিরে আসে।

পুরনো দিনের ম্যাকেনরো কি ফিরে আসবেন এ বছর ?

এর জন্য তাঁকে বিয়াল্লিশ দিন সাসপেন্ড হতে হয়, দিতে হয় অনেক, অনেক জরিমানা। যে ম্যাকেনরো ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস-খেলোয়াড় (এখন এই স্থানটি দখল করেছেন লেন্ডল, এবং দু' নম্বর স্থানে আছেন বেকার), তিনিই এখন নেমে গিয়েছেন দ্বাদশ স্থানে।

ইংল্যান্ডে সবাই আশা করেছিলেন, ম্যাকেনরো উইচ্‌মবলডনে খেলবেন। তিনি কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের জন্য শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করেন। আম্পায়ার ও লাইন্সম্যানরা নিশ্চয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তবে দীর্ঘ সতেরো মাস পরে ম্যাকেনরো আবার লন্ডনে পাড়ি দিলেন, আর দর্শকরাও দেখলেন প্যাট ক্যাস হারিয়ে দিলেন কিংবদন্তীর ম্যাকেনরোকে। ম্যাকেনরোও বুঝেছিলেন, তাঁর ফর্ম নেই। তাঁর দেহের ওজনও কমেছে। একটানা চার-পাঁচ সপ্তাহ ধরে টেনিস খেলার মানসিকতাটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ ওঁর বয়স মাত্র ২৭।

ম্যাকেনরো এক মার্কিন সাংবাদিককে বলেছেন, '১৯৮৬ সালটা আমার দারুণ কেটেছে। পেশার দিক থেকে বিশেষ কিছু না হলেও, ব্যক্তিগত জীবনটা কেটেছে ভালই।' এ - কথা বলেই কিন্তু শান্তি পাননি ম্যাকেনরো। আবার তিনি আত্মচিন্তায় ডুব দিয়েছেন। বলেছেন, ১৯৮৭তে তিনি টেনিসের দিকেই বেশি মন দেবেন।

ম্যাকেনরোর ধারণা, ইউ· এস· ওপেন থেকেই তাঁর খেলা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। অবিমিশ্র সাফল্য না থাকলেও, নিজের খেলা নিয়ে তিনি আশাবাদী। কিন্তু তিনি যতই বলুন, ১৯৮৭-তে আরও বেশি করে টেনিসের দিকে মন দেবেন, আবার ভাল খেলবেন, তা হলেও তাঁর আগের ফর্ম আর নেই। একটানা চার-পাঁচ সপ্তাহ টেনিস খেলার জন্য যে শারীরিক দক্ষতা থাকা দরকার, তাও তাঁর এখন আছে কি না সন্দেহ। গ্রান্ড স্লামের জন্য লেন্ডল ও বেকারদের মধ্যে যে লড়াই চলছে, তাতে টিকতে হলে ম্যাকেনরোকে আবার তাঁর আগের ফর্মে ফিরতে হবে। অ্যাটলান্টায় তিনি অবশ্য লেন্ডলকে ইতিমধ্যে হারিয়েছেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আমেরিকার পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়দের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করেই তাঁকে ফিরতে হবে। নিউইয়র্কে মাস্টার্স টেনিসে দেখা গেল, সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে আমেরিকার কেউ নেই। দেখা যাক, ১৯৮৭-তে ম্যাকেনরো কী করেন !

নিউট্রামূল শক্তি

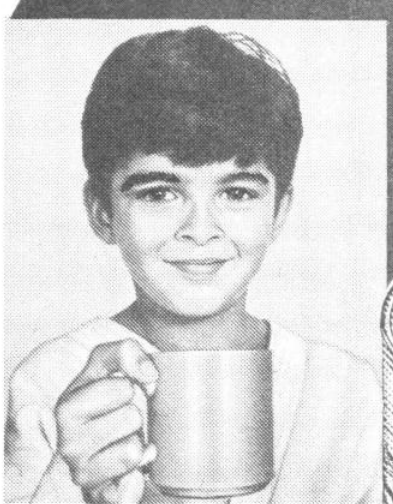

মালাইদার আমূল মিল্ক....পুষ্টিগুণে ভরা মল্ট...
আর সুস্বাদে ভরা কোকো। বাহ!
তাইতো নিউট্রামূল এত শক্তিদায়ক! আর দামেও
এটি অপরাজেয়!

	1000 gms.	500 gms.	Refil.
নিউট্রামূল	37.21	19.29	–
মল্টোভা	43.75	24.65	22.79
বুস্ট	–	24.89	23.06
বোর্ণভিটা	47.48	24.67	22.81

Prices as on 1st January, 1987. Local taxes extra.

আমূলের
নিউট্রামূল

হও নিউট্রামূল 'দাদা'!

বিক্রী ব্যবস্থায়:
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক
মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড,
আনন্দ ৩৮৮ ০০১.

daCunha/GCM/135/86 BEN

কী করে বক্সার হলেন মহম্মদ আলি

অশোক রায়

জো লুই না মহম্মদ আলি ? বক্সিং ইতিহাসে কে সেরা, এই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের তর্কাতর্কির শেষ নেই। রায় যে পক্ষেই পড়ুক না কেন, এটা ঠিক, মহম্মদ আলির মতো ক্ষিপ্র, কুশলী বক্সার দুটো পাওয়া শক্ত। তিনিই একমাত্র বক্সার, যিনি তিনবার বিশ্বখেতাব পুনরুদ্ধার করেছেন। মহম্মদ আলি কীভাবে বক্সিংয়ে এলেন সে এক মজার কাহিনী।

ক্যাসিয়াস ক্লে'র বয়স তখন ১২ বছর (মহম্মদ আলির আগের নাম ক্যাসিয়াস ক্লে)। বাবা একটা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন ছেলেকে। একদিন সাইকেল চেপে প্রিয় বন্ধু জনি উইলিস-এর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ক্যাসিয়াস। হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে পড়ায় দুই বন্ধু ঢুকে পড়েন কলম্বিয়া প্রেক্ষাগৃহে। ওখানে বিনি পয়সার ভোজ সেরে যখন হলের বাইরে আসেন তখন সন্ধে নেমেছে। বৃষ্টিও পড়ছে মুষলধারে। কিন্তু সাইকেলটা ? চারদিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। দুঃখে, ভয়ে, চিন্তায় মুষড়ে পড়লেন বারো বছরের ক্যাসিয়াস। ওইসময় কে একজন জানাল, কলম্বিয়া জিমনেশিয়ামে জো এলস্‌বি মার্টিন নামে এক পুলিশ-কর্তার সঙ্গে দেখা করলে ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে। কাঁদতে কাঁদতেই ছুটলেন তিনি। কিন্তু ব্যায়ামাগারে ঢুকে ক্যাসিয়াস অবাক। জনাদশেক বক্সার তখন ওখানে প্র্যাকটিস করছেন। একটা রোগা ছেলে এত দ্রুত ঘুষি চালাচ্ছিল যে, প্রায় চোখেই দেখা যাচ্ছিল না।

মার্টিন সব কথা শুনলেন। তারপর চলে আসার সময় একটা আবেদনপত্র ক্যাসিয়াসের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, এখানে সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন সন্ধে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত বক্সিং হয়। তুমি যদি চাও তা হলে এখানে আসতে পারো।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক শনিবার, বক্সিংয়ের একটা অনুষ্ঠান দেখার জন্য টিভির পর্দায় চোখ লাগিয়ে বসে ছিলেন ক্যাসিয়াস। হঠাৎ দেখলেন জো মার্টিন রিংয়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে এক বক্সারকে কীসব বোঝাচ্ছেন। মার্টিনকে টিভিতে দেখেই ক্যাসিয়াসের মনে পড়ল আবেদনপত্রের কথা।

"মা, আমি বক্সিং শিখব।" এক মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললেন ক্যাসিয়াস।

"কেন, তুমি কি বক্সার হতে চাও ?" মায়ের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ।" ক্যাসিয়াসের কণ্ঠে তখন রীতিমত আত্মবিশ্বাসের সুর। কথাটা শুনে বাবাও যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। "ক্যাসিয়াস বাড়ি আছে ? আমি ওর দোস্ত জনি উইলিস।"

আবার উইলিস ? যেন চেতনার দরজাতেও ধাক্কা পড়ল। বাবা মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। "উইলিসের দলের সঙ্গে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে তোমার বক্সিং শেখাই ভাল।"

হ্যাঁ, ওই তাৎক্ষণিক অমোঘ এবং স্থির সিদ্ধান্তটিই ইতিহাসের 'গ্রেটেস্ট' বক্সারের জীবনপথের স্থায়ী নির্দেশ হয়ে গেল।

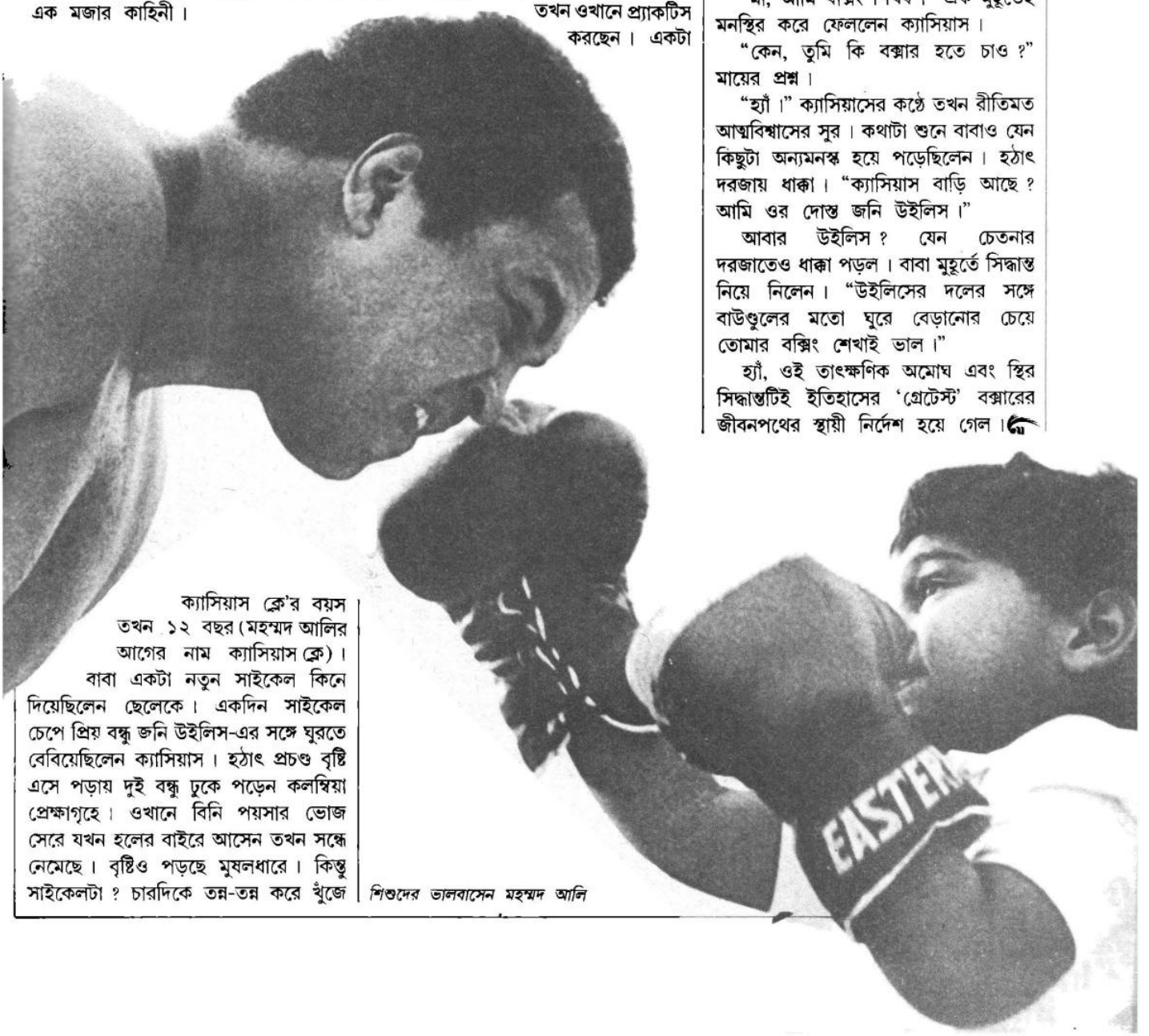

শিশুদের ভালবাসেন মহম্মদ আলি

প্রকাশিত হয়েছে : দুটি চিরায়ত গ্রন্থের আনন্দ-মুদ্রণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অসামান্য বুদ্ধ-জীবনী

নালক দাম ৭·০০

নালক হল গৌতম বুদ্ধের গল্প। দেবকঋষি যোগে বসেছিলেন। ছোট্ট ছেলে নালক ঋষির সেবা করছিল। এমনসময় অন্ধকারে আলো ফুটল। চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক অপরূপ আলোর আলো।
সন্ন্যাসী নালককে বললেন, কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন। আমি চললাম।
একলা নালক চুপ করে বসে রইল বটতলায়। তার ধ্যানমগ্ন চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল বুদ্ধের সারা জীবনের ছবি। একের পর এক অদ্ভুত জীবন্ত ছবি।
ভগবান বুদ্ধের আশ্চর্য জীবনকাহিনী ও অলোকদৃষ্টির অধিকারী এক সন্ন্যাসী বালক নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে-অসামান্য গ্রন্থ, তারই নতুন আনন্দ-সংস্করণ প্রকাশিত হল। এ-গ্রন্থকে পাতা জোড়া-জোড়া দুর্দান্ত ছবি আর মলাট দিয়ে সাজিয়েছেন এ-যুগের রূপদক্ষ শিল্পী কৃষ্ণেন্দু চাকী।

এর আগে বেরিয়েছে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বুড়ো আংলা ১৫·০০
ক্ষীরের পুতুল ১০·০০
রাজকাহিনী ১৫·০০
হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা ৮·০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ছোটদের উপযোগী ক্লাসিক

শকুন্তলা দাম ৬·০০

মহাভারতের কথা অমৃতসমান। আর, মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার কথা ? সন্দেহ নেই, এমন বেদনামধুর ক্লাসিক উপাখ্যান পৃথিবীতেই কম লেখা হয়েছে। এই কাহিনী নিয়েই মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন তাঁর অমর এক নাটক। কালিদাসের সেই নাটকটিকেই ছোটদের জন্য নতুন করে লিখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ভাষায় জাদু, বর্ণনায় সম্মোহন। শব্দ নয়, যেন ছবির পর ছবি দিয়ে লেখা এক চিরকালীন রূপকথা অবনীন্দ্রনাথের ছোটদের এই 'শকুন্তলা।' নতুন আনন্দ-মুদ্রণে পাতায় পাতায় নতুন ছবি এঁকেছেন একালের সম্পন্ন শিল্পী সুব্রত চৌধুরী, আর এঁকেছেন চোখ-জুড়োনো মলাট।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,কলকাতা-৭০০০০৯; ফোন : ৩১-৪৩৫২

রোভার্সের রয়

ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে পারে, তাই রয় সংসারের কাজে মন দিতে পারছে না, আর পেনিও তাই রাগ করে দুই বাচ্চাকে নিয়ে ক্রিটে চলে গিয়েছিল। রাগ পড়ে যাওয়ায় সে ফিরে এসেছে। স্টেডিয়ামের রেস্তোরাঁয় বসে কথা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর—

দিব্যি খেতে-খেতে খেলা দেখা যায় এখান থেকে।

যা বলেছ।

স্কুল-প্রতিযোগিতায় খেলছে রোভার্সের জুনিয়র টিম ...

আমাদের ছেলেও একদিন হয়তো এই মাঠে খেলবে।

গো-ও-ল

এই গোলটি দেওয়ায় আমাদের জুনিয়র টিম সেমিফাইনালে উঠল। টমসন ছেলেটার উপরে দেখছি নজর রাখতে হবে।

হঠাৎ ফিরে এলে কেন, বলো তো?

ব্ল্যাকি ফোন করে বলল, তুমি নাকি নোংরা জামাকাপড় পরেই ক্লাবে আসছ।

তা ছাড়া এটাও মনে হল যে, তোমার পাশে এখন আমার থাকা দরকার। তবে হ্যাঁ, ফি বছর কিন্তু আমরা বেড়াতে যাব।

কী জানো, বাচ্চাদের নিয়ে মাঝে-মাঝে একটু বেরিয়ে পড়া দরকার।

ঠিক আছে, শর্ত মেনে নিচ্ছি।

রাত্তিরেও ক্লাবের কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ...

রোভার্স নেমে যাবে? অসম্ভব!

রেডস্টোককে হারাতে না পারলে সত্যি আমরা বিপদে পড়ব।

আজ রেডস্টোকের সঙ্গে খেলা । ভিড় উপচে পড়ছে ...
মাঠে কখনও এত লোক দেখিনি ।
রোভার্স ! রোভার্স !
তাও কিনা টেবিলের নীচের দিকের দুই টিমের খেলা দেখার জন্যে ।
ROVERS
REDSTOKE
টিকিট না পাওয়ায় অনেকেই মাঠে ঢুকতে পারেনি ...
বাইরে থেকেই যা জানবার জানা যাবে !
ঠিক
চেঁচামেচি শুনলেই বোঝা যাবে
রোভার্সের ড্রেসিং রুমে...
আমার টিমের প্রত্যেকে আজ টেনশনে ভুগছে !
হঠাৎ
ওরে বাবা, টেনশনে আমার বয়েস যে কুড়ি বছর বেড়ে গেল !
কে আপনি ?
আমি নোয়েল ! বুড়োর মুখোশ পরেছিলুম ।
ওরে দুষ্টু !
নোয়েলের দুষ্টুমি অবশ্য টেনশন কাটিয়ে দিয়েছে...
মুখোশ খুলেও কিন্তু নোয়েলকে বুড়োই দেখাচ্ছে !
কিন্তু খেলব দেখিস টাট্টু ঘোড়ার মতো !
হাহাহাহা !
নোয়েলই প্রথম বিপক্ষের গোলে বিপদ বাধাল বটে !
দুর্দান্ত ক্রস-পাসে রয়কে বল দিয়েছে !
বল গোলে ঢুকছে !
বল কিন্তু ক্রস-বারে লেগে ফিরে এল !
মারো রোভার্স !
গোলে পাঠাও !
ক্লিয়ার করো !
উঃ——————আ !
কী হল রে বাবা ?
কিচ্ছু বুঝতে পারছি না !
ভিতরে না-গেলে কি বোঝা যায় ? ধুত !
ROVERS
(ক্রমশ)
কী হচ্ছে মাঠের মধ্যে ? আগামী সংখ্যায় জানতে পারবে

স্বাস্থ্য ভাল করার সময় এই শীতকাল

শীতকাল আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ভাল করার সময়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের প্রখর রশ্মিতে হজম ঠিকমতো হয় না, তাই স্বাস্থ্য ভাল না হোক অন্তত খারাপ যাতে না হয়ে যায়, সেইদিকে লক্ষ রাখতে হয় গরমকালেই।

শীতকালে আমাদের দেশে সূর্যরশ্মির প্রখরতাও কমে, হজমশক্তিও বাড়ে, আর নানারকম ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। সেইজন্যে শীতকালে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে শরীর ভাল করে নেওয়া উচিত। তারপর গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে সেই স্বাস্থ্য যাতে ভেঙে না যায় দেখতে হয়। তারপর আবার শরীর ভাল করতে হয় শীতকালে।

শীতকালে আলু, কপি, পালংশাক, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপন্ন হয়। এই সব শাকসবজিতে নানারকম ভিটামিন আছে। তবে যেসব ভিটামিন ডাক্তারবাবুরা আমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন করেন, আর যেসব ভিটামিন তরিতরকারি ও শাকসবজিতে পাওয়া যায়,এ দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। যেসব ভিটামিন ওষুধে পাওয়া যায়, সেগুলি সিনথেটিক ভিটামিন। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়। কিন্তু খাদ্যে যেসব ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা থাকে, সেগুলি প্রাকৃতিক এবং খুব সহজেই সেগুলি আমরা হজম করতে পারি। এগুলি পুষ্টিরও কাজে লাগে। তা ছাড়া যে-কোনও খাদ্যে একাধিক ভিটামিন মিশ্রিতভাবে থাকে। কোনও একটি বিশেষ ভিটামিন অসুখ করলে লাগে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল করার জন্যে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে, খাদ্য খাওয়া অনেক উপকারী। প্রত্যেকটি খাদ্যে, তা সে প্রাণীজ বা ভেষজই হোক, মিশ্র ভিটামিন ও পুষ্টিকর পদার্থ আছে, যা কোনও ওষুধে থাকে না। সেইজন্যে আমরা ঠিক করে নিই শীতকালে ভাল-ভাল খাবার খেয়ে শরীরটাকে ভাল করে নেব।

ভোরবেলায় উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে ভালভাবে তেল মেখে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান করে নেবে। ভালভাবে তেল মাখলে শরীরের ব্যায়ামও হয় আর ত্বকও খুব ভাল ও মসৃণ থাকে। যে-কোনও খাঁটি তেল মাখলেই হবে। তোমরা অনেকেই বোধহয় জানো না, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রোজ স্নানের আগে খাঁটি নারকোল তেল মাখতেন। তোমরা যে

কোনও তেল মাখতে পারো, তবে খাঁটি হলেই ভাল। স্নান করে জামাকাপড় পরে যোগ-ব্যায়াম করবে কিছুক্ষণ, তারপর পড়তে বসবে। ভোরবেলায় গরম ফ্যান ভাত, ডিম সেদ্ধ,আলু সেদ্ধ, গাওয়া ঘি বা মাখন মেখে খাবে। যারা রুটি খাও, তারা রুটি খাবে, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ ঘি ও মাখন খাবে আর আখের গুড় দিয়ে বা খাঁটি মধু দিয়ে রুটি খাবে। মধু খুব পুষ্টিকর। তবে বেশি খাওয়া ঠিক নয়। পেট খারাপ হয়ে যেতে পারে। টোস্ট খেলে মাখন, জ্যাম মাখিয়ে খাবে, আর যা যা খাবে, তা তো আগেই জানালাম।

দুপুরবেলায় ভাতের সঙ্গে শীতকালে রোজ পালংশাক খাবে, আলু কপির তরকারি খাবে, ডাল খাবে, বেশি খাবে ছোলার ডাল। ছোলা খুব ভাল প্রোটিনজাত খাদ্য। প্রোটিনের অভাবে এক রকমের রোগ হয়, তার নাম কোয়ারসিকোয়াভ। সেই পুষ্টিহীনতা সারাবার জন্য, ছোলার ছাতু খাওয়ানো হয় এবং ছাতু খাইয়ে এই রোগ সারানো যায়। যারা রোগা, তারা খাবার পর রসগোল্লা কি সন্দেশ খাবে। ভাজা মিষ্টি খাবে না, কড়াপাকের সন্দেশ হজম না হলে খাবে না।

বিকেল বেলায় চিঁড়ে-ভাজা, মুড়ি তেল দিয়ে মেখে ছোলা-সেদ্ধ ও বাদাম ভাজা মিশিয়ে খাবে। যারা খুব মোটা, তারা বেগুন-পোড়া, শশা, মুলো খেতে পারো।

রাতের বেলায় ভাত বা রুটি যেটা তোমার খুশি খাবে, তার সঙ্গে ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস যা বাড়িতে হবে, তাই খাবে। মাছ-মাংস না হলেও কোনও চিন্তা নেই। নিরামিষ খাদ্যে যে পরিমাণ পুষ্টি আছে, আমিষ খাদ্যে তার চেয়ে বেশি পুষ্টি নেই। দু'বেলা যদি গোরুর দুধ ফুটিয়ে চিনি মিশিয়ে দু'গ্লাস খাও, খুব ভাল হয়। গোরুর দুধে যে পুষ্টি আছে, টিনের দুধে সে পরিমাণ পুষ্টি নেই। গোরুর দুধে ক্যালসিয়াম কেসিনোজিনেট পদার্থ আছে, যা কোনও টিনের দুধে থাকে না। টিনের দুধে দেখবে ক্যালসিয়াম আর কেসিন আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে, সেইজন্যে গোরুর দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি উপকারী।

শীতকালে পরিশ্রম বেশি করবে, সকাল বিকেল ব্যায়াম ও ছোটাছুটি করবে। রবিবার বা ছুটির দিন নিশ্চয় ক্রিকেট খেলবে। ব্যাডমিন্টন, টেনিস ইত্যাদি যে যে খেলা খেলতে ভালবাসো, তা-ই খেলবে। শীতকালে পরিশ্রম করলে খিধে বাড়বে, আর সেই হিসেবে পেট ভরে খেলে দেখবে শরীর আবার সতেজ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

দূরপাল্লার 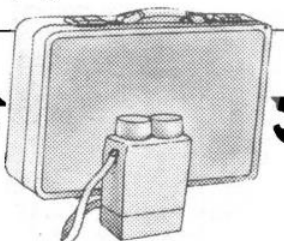 সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন

সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

Response

ধাঁধা

সেজদাদু কথাটা প্রায়ই বলেন। সেজদাদুদের আমলে 'ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলি সিলেকশন' বলে একটা বই পড়ানো হত। তারই মধ্যে ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নামে একটা লেখা। সেই লেখাটা থেকে সেজদাদু প্রায়ই আওড়ান, যেথা হইতে আসিয়াছি সেথায় ফিরিয়া যাইতেছি। এটাই সম্ভবত ভাগীরথীর সংলাপ। প্রায়ই শুনি কথাটা আমরা।

ছোট্কাও দেখি সেদিন ধাঁধার খাতা হাতে নিয়ে এই বাক্যটাই বারবার বলছে। ব্যাপারটা যে কী, বুঝতে পারলাম ধাঁধাটা পেয়ে। সূত্র দেওয়া থাকবে বাংলায়, সেই সূত্র অনুসারে ইংরেজি শব্দ খুঁজে বার করতে হবে। শব্দগুলোর বিশেষত্ব হবে, যে-অক্ষর দিয়ে শুরু, সেই অক্ষর দিয়েই শেষ হওয়া চাই।

যেমন ধরো, বাংলায় বলা হল, জাতি। এই সূত্র ধরে পৌঁছতে হবে NATION শব্দে, যার আরম্ভে এন, শেষেও এন। ঠিক এইভাবে খুঁজে বার করতে হবে কয়েকটি শব্দ। সূত্রগুলো দেওয়া হল—

(ক) গতকাল। (খ) সমালোচক। (গ) সব থেকে কম। (ঘ) যে পাখি দেখে ইঁদুরছানা ভয়ে মরে। (ঙ) নরওয়ের রাজধানী। (চ) যা পিছনে রয়েছে। (ছ) যে-গাছের পাতা দিয়ে গ্রিকরা তৈরি করত সম্মানমুকুট।

এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ব্যাগে রয়েছে কুড়িটি পুঁতি। তিন রঙের পুঁতি। আটটা

নীল, সাতটা লাল, পাঁচটা সবুজ রঙের পুঁতি।

তোমার চোখ বেঁধে দেওয়া হল রুমাল দিয়ে। এবার, না-দেখে কত বেশি সংখ্যক পুঁতি তুমি ব্যাগ থেকে তুলে আনতে পারো, যাতে কিনা ব্যাগের মধ্যে পড়ে থাকে যে-কোনও রঙের অন্তত চারটি পুঁতি এবং অন্য-এক রঙের অন্তত তিনটি পুঁতি? ভাল করে ভেবে জবাব দাও।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

নিহেমেবার

গতবারের উত্তর ॥ (১) ভাস্বতী রুশ ভাষা শেখে এবং গিটার বাজায়। (২) ২৭ (৩) চিন্তাপরায়ণ।

সত্যসন্ধ

হাসিখুশি

"মা, পিকলু আমার কাঠের পুতুলটা ভেঙে ফেলেছে।"

"ভাঙল কী করে?"

"ওটা দিয়ে আমি যে ওর মাথায় মেরেছিলাম।"

"রাক্ষসদের মধ্যে প্রথম কে টাকা-পয়সার প্রচলন করেছিল?"

"মুদ্রারাক্ষস।"

"এই ওষুধটা প্রতিবারে তিন চামচ করে খাবে, বুঝেছ?"

"হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যে একটার বেশি চামচ নেই!"

"প্রতিদিন স্বপ্নে দেখি, আমি বাঁদর হয়ে গেছি। এরকম স্বপ্ন দেখার কারণটা কী বলুন তো?"

"নিজের সম্পর্কে সব সময় ভাবেন বলেই হয়তো।"

ছবি : দেবাশিস দেব

মজার খেলা

বারোটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা টুথপিক টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখো পরপর।

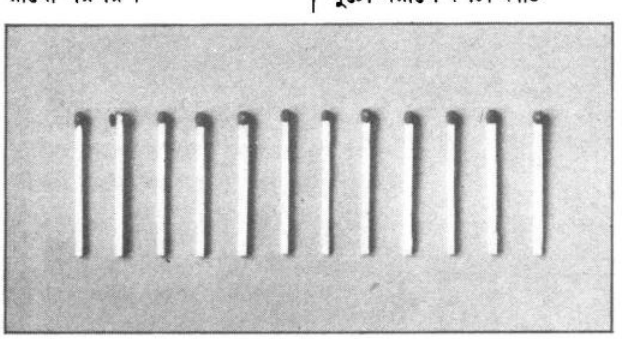

এবার বন্ধুদের বলো, এর থেকে দুটো কাঠি সরিয়ে নিলে যা থাকবে, তা হল পাঁচ। বন্ধুরা কি প্রমাণ করতে পারবে কী করে তা হয়? বন্ধুরা একটু হকচকিয়ে যাবে। দুটো সরালে দশটা কাঠি থাকবে। কিন্তু পাঁচ পড়ে থাকবে, এ কেমন করে হয়? হয়, হয়। তুমি দশটা কাঠিকে

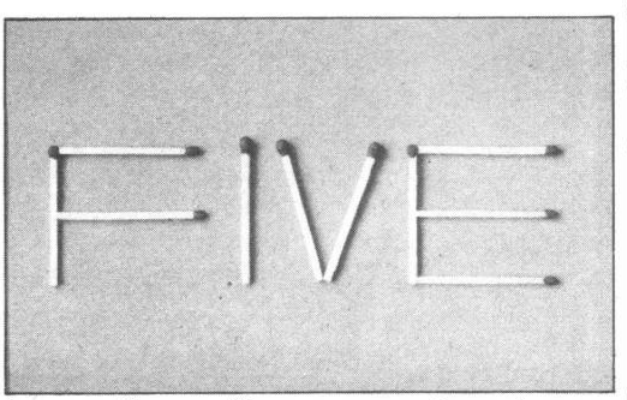

উপরের ছবির মতো সাজিয়ে দেখাও, কীভাবে পাঁচ পড়ে থাকে টেবিলে।

কী ভাবছ, পাঁচটা কাঠি পড়ে নেই? তা তো কথাও ছিল না। আমরা বলেছিলাম, পাঁচ পড়ে থাকবে। তাই তো পড়ে রয়েছে।

মজারু

আঁকতে গিয়ে মজা পাবে

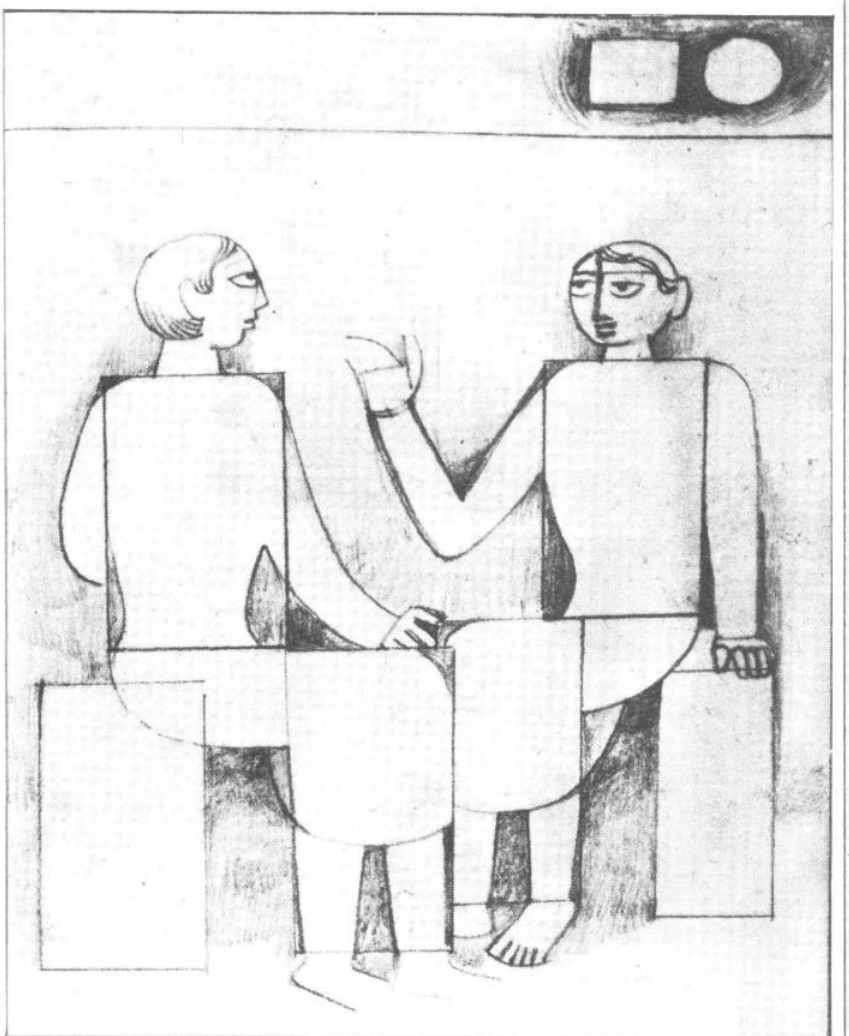

গতবারের চৌকোর খেলায় কেমনভাবে মানুষ তার আকার নিয়ে তোমার খাতায় ফুটে উঠেছে মনে পড়ছে তো ? এবারের পাতায় দ্যাখো, কেমনভাবে তারা বসে একে-অপরের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করছে। ইচ্ছে করলে দু'জনের জায়গায় অনায়াসে আরও কয়েকজনকে বসিয়ে দিতে পারো। এবং আঁকতে গিয়ে দেখবে বেশ মজাও পাচ্ছ তোমরা।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

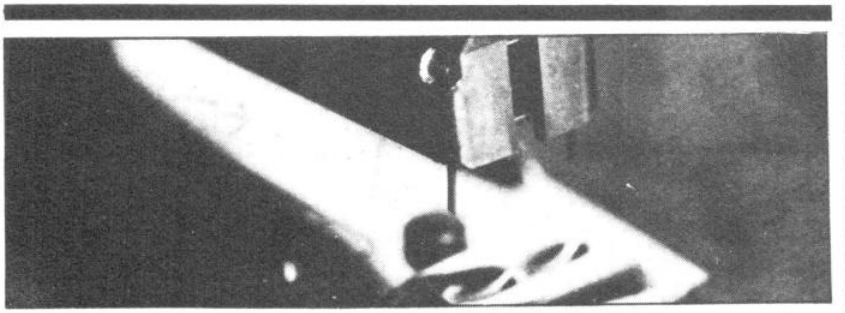

গত সংখ্যায় ছিল টিউব লাইটের একাংশের ফোটো

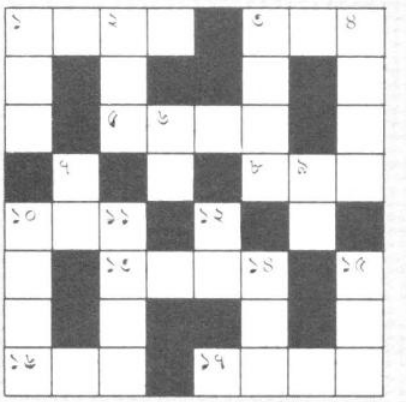

সংকেত : পাশাপাশি : (১) নক্ষত্রবিশেষ। (৩) ফুলের গন্ধে সুবাসিত। (৫) প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কবি-নাট্যকার। (৮) সূর্য। (১০) বালি। (১৩) ইন্দ্রজিতের জবর ফন্দি, রাম-লক্ষন কিসে বন্দী ? (১৬) বিক্রির জন্য পণ্য বিদেশে চালান। (১৭) মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠির কার হাতে রাজ্যভার দিয়ে গিয়েছিলেন ?

উপর-নীচ : (১) আগেকার দিনে রাজারা বনে যেতেন কী করতে ? (২) পালকি। (৩) অবসর, অবকাশ। (৪) প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন। (৬) গ্রীষ্মের ফল। (৭) সংগীতের রাগবিশেষ। (৯) রূপকথা আর গল্পেই যাদের দেখা মেলে। (১০) কেউ দারুণ সাহসের কাজ করলে তাকে কী আখ্যা দেওয়া হয় ? (১১) কানে-কানে কথা। (১২) এই কুল দেখলেই কারও কারও জিবে জল আসে। (১৪) রামের দেখা পেয়ে কার প্রতীক্ষার অবসান হয়েছিল ? (১৫) সবুজ বর্ণ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

গো	প্প	দ	■	প	রা	গ	■
ব	■	র	জ	■	■	র	■
র	ম	জা	ন	■	স	জ	ল
গ	জা	■	প	ত	ঙ্গ	■	ব
ণে	■	সু	দ	ক্ষ	■	জ	ঙ্গ
শ	হ	র	■	শি	শু	পা	ল
■	ল	■	■	লা	মা	■	তি
■	ফ	ট	ক	■	র	ক্তি	কা

রঞ্জন

ওরা আর আমরা

একদিন সকালের দিকে হাওড়া স্টেশনে আমার ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি, একজন মাঝবয়সী বিদেশী ভদ্রলোক (তাঁর কথা শুনে পরে বুঝলাম তিনি ইংরেজ) সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাবসাব দেখে মনে হল, একটু যেন বিপন্ন, কিংবা বিব্রত। আমি বললাম :

Yes ? Can I help you?

তার উত্তরে তিনি যা বললেন, সেটাই আমাদের এবারকার আলোচনার বিষয়। তিনি বললেন :

Yes. Well, I want to go to Srirampur. Could you tell me where I should wait for my train? You see, I'm not yet quite familiar with the English spoken here. So the announcements about the trains are not quite clear to me.

অবশ্যই মাইকে ইংরেজিতেও ঘোষণা হচ্ছিল, কিন্তু বুঝলাম, আমাদের মুখের ইংরেজি সেই ইংরেজের কানে শোনাচ্ছিল প্রায় তাঁর অজানা কোনও ভাষার মতো। তাঁকে আমি তাঁর নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মটি দেখিয়ে দিলাম, তারপর ভেবে দেখলাম, দোষ আমাদেরও নয়, তাঁরও নয়। আসলে, ইংরেজি ভাষাটা আমরা যেভাবে বলতে শিখি আর ইংরেজরা যেভাবে বলে, এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাত থাকতে বাধ্য। প্রথমে উচ্চারণের কথাই ধরো। এই 'সহজে ইংরেজি'-র একদম

শুরুতেই আমি বলে দিয়েছি, ইংরেজি উচ্চারণ শেখানো এই আসরে সম্ভব নয়। উচ্চারণটা মুখে বলে শেখাতে হয়, আর কানে শুনে শিখতে হয়। তবে, সেই সঙ্গে একটা কথা বলেছিলাম। আমাদের প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণর সঙ্গে, ইংরেজিতে তার কাছাকাছি যেসব স্বর, আর ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, তার তফাত অনেক। তা ছাড়া, শব্দের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ওরা বড্ড বেশি ঝোঁক দেয়, যাকে বলে অ্যাক্‌সেন্ট। সেই ঝোঁকটা না দিলে, কিংবা ভুল জায়গায় দিলে, শব্দের আওয়াজটাই অন্যরকম হয়ে যায়। তখন সে-কথাটা ওদের পক্ষে বোঝা অনেক সময়ে মুশকিল হয়। যেমন ধরো, আমাদের একটা অত্যন্ত পরিচিত ইংরেজি শব্দ, যে শব্দটি আমাদের প্রায়ই উচ্চারণ করতে হয় :

Esplanade

একজন ইংরেজের মুখে এই

শব্দটির শেষ অংশের ওপর ঝোঁক পড়ে। শব্দটি দাঁড়ায় এই রকম :

EsplanADE

আবার, আমাদের এই কলকাতা শহরের নামের ইংরেজি উচ্চারণ কী, জানো ?

CalCUTta

অর্থাৎ, এর মধ্যের অংশের ওপর জোরটা পড়ে। কিন্তু খেয়াল রাখবে : ক্যালকাট্টা নয়, ক্যালকাটা।

এ নিয়ে সামনের বার আরও কথা হবে।

প্রসাদ

অর্থ জানো

ফরিয়াদি…তছরুপ…

রামপ্রসাদী গান শোনেননি এমন বাঙালি নেই বললেই চলে। ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতায় এ-গানে হৃদয় জুড়িয়ে যায়। সাধক রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তখন মুসলমান রাজত্বে বাংলাভাষায় ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি। রামপ্রসাদের গানেও তাই বহু ফারসি শব্দ দেখা যায়। নীচের শব্দ এবং বাক্যগুলি রামপ্রসাদের রচনা থেকে নেওয়া। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

১। **দাগাদারি**—(ক) নিন্দা, (খ) প্রতারণা, (গ) প্রহার, (ঘ) অপদস্থ করা।

২। **ফরিয়াদি**—(ক) সাক্ষী, (খ) অপরাধী, (গ) নির্দোষ, (ঘ) বিচারপ্রার্থী।

৩। **দেওয়ানা**—(ক) চঞ্চল, (খ) পাগল, (গ) উচ্ছৃঙ্খল, (ঘ) দেওয়ানের কাজ।

৪। **তছরুপ**—(ক) লুকানো, (খ) সরিয়ে ফেলা, (গ) অপব্যবহার, (ঘ) হারানো।

৫। **জায়গির**—(ক) জমিদারি, (খ) পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি, (গ) একশো বিঘা জমি, (ঘ) দেবোত্তর নিষ্কর সম্পত্তি।

উত্তর : ১। **দাগাদারি**—(খ) প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা। কখনও কষ্ট দেওয়া অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ফারসি 'দগাদার' কথা থেকে এসেছে শব্দটি। যেমন, 'দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এরাই করছে দাগাদারি।'

২। **ফরিয়াদি**—(ঘ) বিচারপ্রার্থী বা বাদী। এটি ফারসি শব্দ। যেমন, 'হয়েছি মা জোর ফরিয়াদি, এবার বুঝে বিচার কর।'

৩। **দেওয়ানা**—(খ) পাগল। এটিও ফারসি কথা। যেমন, 'সে দরবারে ভাষ্য কী রে, দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে।'

৪। **তছরুপ**—(গ) অপব্যবহার বা নষ্ট করা। এটি আরবি শব্দ, এখন বাংলাভাষার হয়ে গেছে। যেমন, 'কালীর নামে দেও গো বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।'

৫। **জায়গির**—(খ) পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর জমি। মূলে আছে ফারসি শব্দ 'জাগির'। যেমন, 'অর্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী।'

দেব-সেনাপতি

গোয়েন্দা যখন ছোটমামা

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

অনেকদিন বাদে ছোটমামাকে আসতে দেখে মা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "আয়, বিরু, বোস। চা খাবি তো? মোচার চপ করেছি।"

একগাল হেসে ছোটমামা বললেন, "তা হলে তো ঠিক দিনেই এসেছি দেখা যাচ্ছে। তা তোমরা ভাল তো, ছোড়দি? জামাইবাবু বুঝি ফেরেননি অফিস থেকে?" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুলি, তোর খবর কী? পিন্টু কোথায়?"

"কোথায় আবার।" বিরক্ত সুরে জবাব দিলেন মা, "ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। স্কুল থেকে ফিরেই যে বেরিয়েছে আর পাত্তা নেই। পারেও বাবা..."

আমি বললাম, "বিশ্বকর্মা পুজো আসছে যে। এখন তো সবাই ঘুড়ি ওড়াবে।"

ছোটমামা বললেন, "ঘুড়ি ওড়ানোকে অত অশ্রদ্ধার চোখে দেখো না ছোড়দি। কখনও কখনও ঘুড়ি ওড়াতে জানাটা কাজে এসে যায়। যেমন আমার একবার হয়েছিল..."

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম, "বলো না ছোটমামা, কবে, কোথায়..."

"বলছি, আগে চা আন তো দেখি।"

অবশ্য ছোটমামা এলে যে চা আনতে হবে সেটা জানা কথা। তাই ওঁর আওয়াজ শুনে জলের কেটলি গ্যাস-স্টোভে চাপিয়েই এসেছিলাম। এবার ছুটলাম চা করতে।

মোচার চপ সহযোগে চা খাওয়া শেষ করে ছোটমামা গল্প শুরু করলেন। ততক্ষণে পিন্টুও এসে গেছে।

"বুঝলি বুলি," ছোটমামা শুরু করলেন, "এটা আমার আমেদাবাদ বাসের গোড়ার দিকের কথা। কোম্পানির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চায়ের এজেন্সিটা ছেড়ে দিয়েছি। অর্থাৎ বেকার। তবে আমেদাবাদটা কলকাতা নয়, তক্কে তক্কে থাকলে কাজ ঠিকই জুটে যায়। আমারও জুটে গেল। একজন শেঠ, অর্থাৎ বড় বিজনেসম্যানের হেড অফিসের ক্যাশবই লেজার এসব লেখার কাজ। কাজটা অবশ্য টেম্পোরারি, কিন্তু তার জন্য আমি পিছপা হলাম না। দশটা-পাঁচটা এক জায়গায় বসে খাতা লেখার চাকরিকে পার্মানেন্ট করতে কে চায়। মাসখানেক চাকরি করার পরই বুঝতে পারলাম যে, শেঠ আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট। খাতা লেখা ছাড়াও বিজনেসের অনেক ব্যাপারেই আমার পরামর্শ নিতে লাগলেন। আর মাসের শেষে মাস-মাইনে ছাড়াও খানকয়েক দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বিরুভাই, এটা তোমার বোনাস।'

"এর কিছুদিন পর নজর করলাম যে, শেঠকে কেমন মনমরা দেখাচ্ছে। চিন্তিতও। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম কারণটা।

"'বুঝলে বিরুভাই,' বললেন শেঠ, 'খুব মুশকিলে পড়েছি। কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছি যে, আমার কাপড়ের মিলের নতুন ডিজাইনগুলো অন্য মিলে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাপড় বাজারে বেরোবার আগেই অন্য মিল থেকে সেই ডিজাইনের কাপড় বাজারে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছ, তাতে আমাদের কাপড়ের চাহিদাও আর ততটা হচ্ছে না।'

"'আপনাদের ডিজাইন অন্য মিলে পাচার হয়ে যাচ্ছে!' অবাক হলাম, আমি। 'কী করে। ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের চার্জ তো আপনার জামাই নবীন পারেখের ওপর। তবে কি আপনাদের আর্টিস্টই ডিজাইনের কপি অন্য মিলে...'

"'না হে না। এই আর্টিস্ট অনেকদিন ধরে আমাদের এখানে ডিজাইন সাপ্লাই করে। ওকে খুব ভাল করে চিনি আমি।'

"'তা হলে? ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের চার্জ যখন আপনার জামাইয়ের ওপর...'

"'হ্যাঁ, নতুন ডিজাইন আর্টিস্টের কাছ থেকে এসে নবীনের কাছেই থাকে। মুশকিল তো ওখানেই।'

"'কীরকম?'

"'আমার যদ্দূর মনে হয়, নবীনই এসব ডিজাইন অন্য মিলে দিচ্ছে।'

"'তা হলে ওকে চেপে ধরুন না কেন?'

"'চেপে যে ধরব, প্রমাণ কই? হাজার হোক জামাই, প্রমাণ ছাড়া কোনও অ্যাকশন নিতে পারব না। তবে ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে সব-কিছু আমার নখদর্পণে। কিন্তু কোথায়, কীভাবে কার সঙ্গে যোগযোগ করছে ও সেটা বুঝতে পারছি না। আমার কথা শুনে অবশ্য আমার মেয়েও চোখ রাখছে, যাতে নবীন অন্য মিলের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে।'

"'মিঃ পারেখ তো চিঠির মারফত ডিজাইন পাচার করতে পারেন, কিংবা টেলিফোন করে কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর...'

"'সম্ভব নয়। ওর চিঠিপত্রের ওপর কড়া নজর রাখছি আমি। সবাইকে বলা আছে যাতে ওর লেখা কোনও চিঠিই আমাকে না দেখিয়ে পোস্ট না করা হয়। আর টেলিফোন? অফিসের টেলিফোনের ডিটেলস তো আমি অপারেটারের কাছ থেকে পেয়ে যাই। বাড়িতে টেলিফোনে প্যারালাল কানেকশন। কাজেই ও টেলিফোন করলে বা কেউ ওর কাছে ফোন করলে আমার শোবার ঘরের ফোন তুলে শুনতে পারি সেটা। কিন্তু বুঝতে পারছি না নবীন কেন এমন করছে?'

"বুঝলি বুলি, আমি অবশ্য শেঠকে বলতে পারতাম কারণটা। উনি আমাকে বোনাস দিলেও সাধারণভাবে বেশ কঞ্জুষ। নবীন পারেখ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শ্বশুরের আশ্রিত। আর এই শেঠের ধারণা সাধারণ ঘরের ছেলেরা হাতে টাকা পেলেই বেমক্কা ফুর্তিতে সব উড়িয়ে দেয়। তাই নবীন পারেখের বাড়ি গাড়ি দামি জামা-কাপড় আছে বটে, কিন্তু হাতে নগদ খুব কম। ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জের বেতনটা অবিশ্বাস্য রকমের অল্প। তবে এসব কথা শুনতে শেঠের ভাল লাগবে না, তাই কিছু বললাম না আর।

"এর প্রায় দিন পনেরো পরে শেঠ আবার আমায় একান্তে ডেকে পাঠালেন। বললেন,'বিরুভাই, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। নবীনের ওপর একটু চোখ রাখবে ক'টা দিন? আমাকে হয়তো বাইরে যেতে হতে পারে।'

"'কোনও বিশেষ কারণ ঘটেছে কী?'

"'হ্যাঁ। আজই আমাদের আর্টিস্টের কাছ থেকে একগাদা নতুন ডিজাইন এসেছে।'

"একটু চিন্তা করে বললাম, 'মিঃ পারেখ বসেন দোতলায় আর আমি একতলায়। নজরটা রাখব কী করে? অবশ্য আপনি যদি ওঁর ঘরেরই এক কোণে আমার বসার জায়গা করে দেন তো হয়...'

"'কিন্তু তা কী করে হবে? ও রাজি হবে কেন?

"'ওঁকে বলুন না কেন, আমার ওপর নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা করেছেন আপনি।'

"ব্যাপারটা বুঝতে এক মিনিট সময় নিলেন শেঠ। তারপর আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ব্র্যাভো, মাথাটা তোমার সত্যিই পরিষ্কার।'

"চলে আসছি, শেঠ ডেকে বললেন, 'বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। পরশু মকর-সংক্রান্তি। আমার বাড়ি এসো। বিকেলের দিকে ঘুড়ি ওড়ানো দেখবে আর সন্ধ্যার পর খাবে পুরি-উন্ধিয়া।'

"বুঝলি পিন্টু, তোদের যেমন বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা ঘুড়ি ওড়ানোর পরব, গুজরাতিদের তেমনি মকর-সংক্রান্তি। সেদিন সকাল থেকেই গুজরাতি ছেলে-বুড়ো সবাই ঘুড়ি ওড়ানোতে মেতে ওঠে। সন্ধের পর খাওয়া-দাওয়া হয়। বিশেষ করে পুরি-উন্ধিয়া।"

মা বললেন, "লুচিকে বোধহয় ওরা পুরি বলে? কিন্তু উন্ধিয়াটা আবার কী?"

ছোটমামা বললেন, "রেসিপিটা ঠিক বলতে পারব না। তবে সব তরকারি মিশিয়ে তৈরি। খেতে ফাইন।"

আমি বললাম, "ছোটমামা, তোমাকে রান্নার রেসিপি দিতে হবে না। তারপর কী হল বলো।"

"ব্যস্ত হোসনে বুলি। বলছি তো। হ্যাঁ, মকর-সংক্রান্তির দিনে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম করে গেলাম শেঠের বাড়ি। উনি থাকেন পুরনো আমেদাবাদে, যেখানে বসতি যথেষ্ট ঘিঞ্জি। চারতলা বাড়ি ওর। পৌঁছতেই একজন আমায় সোজা নিয়ে গেল ছাতের ওপর। দেখি শেঠের পরিবারের প্রায় সবাই সেখানে। অনেক

বন্ধুবান্ধবও আছেন মনে হল। কম বয়েসী, বেশি বয়েসী সব ছেলেদের হাতেই ঘুড়ি-লাটাই। মেয়েরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্পগুজব করছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি শ'য়ে শ'য়ে ঘুড়ি উড়ছে। সে এক দৃশ্য।

"আমি যেতেই আমার হাতে একটা ঘুড়ি-লাটাই ধরিয়ে দিলেন শেঠ।

"সেই কবে ছোটবেলায় ঘুড়ি উড়িয়েছি। প্রথমটায় ঠিক ম্যানেজ করতে পারছিলাম না। কিন্তু জানিস তো, কোনও কাজেই পিছ পা হবার পাত্র নয় বীরেশ্বর। দু' চারজনকে একটু নজর করে দেখেই কায়দা-কানুন রপ্ত করে ফেললাম। ফর্‌ফর্‌ করে আকাশে উড়ল আমার ঘুড়ি। তার আগেই অবশ্য নজরে পড়েছিল নবীন পারেখ একটু একটেরে হয়ে একমনে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে শেঠ বললেন, 'আমার জামাইয়ের ঘুড়ি ওড়াবার শখ খুব। প্রায় রোজই ওড়ায়।'

"আমার ঘুড়ি ততক্ষণে অনেক ওপরে উঠে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবিক্রমে দু' দুখানা ঘুড়ি কেটে ফেললাম। কিন্তু জানিস তো বুলি, উত্থান হলেই পতন আছে। এর পরই আমার ঘুড়িখানা কেটে গেল।

"সত্যিকথা বলতে কী, অনভ্যাসের দরুন আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা করছিল। ভাবলাম ঘুড়ি যে ওড়াতে পারি, সেটা তো প্রমাণ হয়েই গেছে, একটু আয়েস করা যাক এখন। আলসেতে হেলান দিয়ে অন্যের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে লাগলাম, আর তখনই নজর করলাম ব্যাপারটা।

"নবীন পারেখ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে বটে, কিন্তু নিজের ঘুড়ি সযত্নে বাঁচিয়ে। অন্য ঘুড়ি কাটারও ওর কোনও যেন আগ্রহ নেই। শুধু পাশের বাড়ির ছাদ থেকে উড়ছে সবুজ ঘুড়ি, ওই ঘুড়ি দেখলেই নবীনের ঘুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর ওপর। আর সেই সবুজ ঘুড়িও যেন কচুকাটা হতে গলা বাড়িয়েই আছে। হাওয়ার গতি এ-বাড়ির দিকেই, ছাদটাও বিরাট, তাই নবীনের কাটা-ঘুড়ি উড়তে উড়তে প্রায়ই এ-বাড়ির ছাতে এসে পড়ছে এবং নবীন পারেখ ঝাঁপিয়ে পড়ে কাটা ঘুড়িটা ঢুকিয়ে রাখছে একখানা সুটকেসে। আরও লক্ষ করলাম, পাশের বাড়ির ছাত থেকে উড়ছে ওই সবুজ-রঙা ঘুড়িই। আর ওই লোকটাও নিজের ঘুড়িটা অন্য ঘুড়ির থেকে সরিয়ে এনে নবীনের ঘুড়ির দিকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেন লোকটা চায় শুধু নবীনই ওর ঘুড়ি কাটুক। অথচ নবীনের ঘুড়ি কাটার জন্যে ওর তরফ থেকে কোনও চেষ্টাই নেই।

"এর মানে কী, মনে হল একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

"এর পর আমি কী করলাম জানিস ? নতুন একটা ঘুড়ি নিয়ে আবার শুরু করলাম ওড়াতে। ইচ্ছে ওই সবুজ ঘুড়ি একটা কাটব, বার-দুই বিফল চেষ্টার পর তৃতীয়বার সফল হলাম আমি ও একটা সবুজ ঘুড়ি কেটে ফেললাম। কপালগুণে কাটা-ঘুড়িটা উড়তে উড়তে আমার পায়ের কাছেই এসে পড়ল।

"নিচু হয়ে ঘুড়িটা ওঠালাম। উঠে দাঁড়াতেই দেখি নবীন পারেখ। ও বলল, 'ঘুড়িটা আমাকে দেবেন কাইণ্ডলি।'

"হেসে বললাম, 'ঘুড়ি কাটলাম আমি, আর নেবেন আপনি ? আর দেখলাম তো এই সবুজ-রঙা ঘুড়ি অনেক কেটেছেন আপনি। আর যত্ন করে কাটা-ঘুড়ি সুটকেসে তুলে রাখছেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো ?'

"একটু আমতা আমতা করে নবীন পারেখ বলল, 'ওই লোকটার সঙ্গে প্রায়ই আমার ঘুড়ি কাটাকাটি হয় তো। তাই আর কি কাটা-ঘুড়িগুলো রেখে দিচ্ছি, দেখি ক'টা কাটতে পারি।'

"'রেকর্ড করবেন বুঝি ? তা হলে তো আপনাকে ঘুড়িখানা দিয়ে দিতেই হয়।' বলে দিয়ে দিলাম ঘুড়িটা। অবশ্য ততক্ষণে দেখে নিয়েছি যে,সবুজ ঘুড়িটার লেজের দিকটার দু'ধারে সাদা কাটা কাগজ বসিয়ে নকশা করা। কিন্তু ফুলপাতার নকশার মধ্যে সাজানো রয়েছে একটা গুজরাতি অক্ষর, 'নি'। তবে কি সবগুলো ঘুড়িতেই কোনও না কোনও অক্ষর আছে ? কেন ?

"নিজে আর ঘুড়ি ওড়ালাম না। দেখতে লাগলাম। তবে নজর রাখলাম নবীনের ওপর।

"অবশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হল। সবাই কলকল করে কথা বলতে বলতে নীচে নামতে লাগলেন। আমি অবশ্য নবীন পারেখের কাছাকাছিই রইলাম। নীচে নেমেই ওকে বললাম, 'মিঃ পারেখ আপনার সবুজ ঘুড়ির কালেকশনটা একটু দেখতে চাই।'

"নবীন পারেখ ভুরু কুঁচকে বললে,'ঘুড়িতে দেখার কী আছে, সবই তো প্রায় একই রকম।'

"শেঠ কাছাকাছিই ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে, বিরুভাই তোমার মতোই ঘুড়িতে ইন্টারেস্টেড। দেখাও না, ক্ষতি কী।'

"অগত্যা নবীন পারেখ আমাকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকল।

"সুটকেস খুলে ঘুড়িগুলো বার করলে দেখলাম, সবগুলিতেই নীচের দিকে সাদা কাগজ দিয়ে নকশা করা ও নকশার মাঝখানে বসানো এক-একটা গুজরাতি অক্ষর। কিছু অক্ষর একাধিক ঘুড়িতে রয়েছে। সব কাটা ঘুড়ি যদি নবীনের হাতে না আসে তার জন্যই কি এই বাড়তি ব্যবস্থা ? কিন্তু অক্ষরগুলো কী করে টোকা যায় ?

"জানিস তো বুলি, তোদের ছোটমামার কাছে কোনও প্রবলেমই বেশিক্ষণ প্রবলেম থাকে না। চট করে নবীন পারেখের দিকে ফিরে বললাম, 'ঘুড়ির লেজের দিকে চমৎকার নকশা দেখছি। একটু টুকে নিয়ে যেতে চাই। কলকাতা গিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোয় এরকম ঘুড়ি তৈরি করাব। একটু কাগজ-পেন্সিল দিতে পারেন ?' অবশ্য অনুরোধ করার আগে চারপাশ দেখে নিয়েছিলাম যে, অন্তত সে-ঘরে কোনও কাগজ-পেন্সিল দেখা যাচ্ছে না।

"নবীন বললে, 'বসুন, আমি নিয়ে আসছি।'

"আসলে কাগজ ও একটা বলপয়েন্ট পেন আমার পকেটেই ছিল। নবীন পারেখ সরে যেতেই আমি চটপট অক্ষরগুলো টুকে নিলাম। একটু পরে নবীন পারেখ ফিরল কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। তখন অবশ্য দু-একটা নকশা টুকতেই হল আমায়।

"এর পর আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি সেখানে, অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলে।

"বাড়ি ফিরেই সেই টোকা অক্ষরগুলো নিয়ে পড়লাম। জানিস তো, 'শব্দ-জব্দ' খেলায় আমার হাত পাকা। খানিকক্ষণ চেষ্টার পরই অক্ষরগুলো ঠিক ভাবে সাজিয়ে ফেললাম। দেখা গেল কিছু বাড়তি অক্ষর বাদ দিলে এই কথাটা তৈরি হয়ে যায় 'রবিবার বিকেল ভাবনির্ঝর।'

"ভাবনির্ঝর শহরের বাইরে একটা সুন্দর বাগানের নাম। নানারকম গাছপালা, ফুল—এসব ছাড়াও ধ্যান করার জন্য মন্দির রয়েছে একটা। ভারী নিরিবিলি ও চমৎকার জায়গাটা। তবে কি রবিবার বিকেলে ভাবনির্ঝরে যেতে নবীনকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে কেউ ? ঘুড়ির মারফত অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হচ্ছে ? কিন্তু লোকটা কে ? এই কি সেই লোক, যাকে ডিজাইন পাচার করছে নবীন ? তা হলে তো এক্ষুনি কিছু করতে হয়, কারণ পরদিনই তো রবিবার।

"তক্ষুনি বের হয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করলাম শেঠকে। 'আপনি একটা কাজ দিয়েছিলেন আমায়। সে সম্পর্কেই বলছি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কাল ভাবনির্ঝরে যান তবে আমাকেও সঙ্গে নেবেন দয়া করে।'

"শেঠ বললেন, 'কী আশ্চর্য, একটু আগেই আমার মেয়ে এসে বলছিল যে, কাল বিকেলে নবীন ভাবনির্ঝরে বেড়াতে যেতে চায়। ঠিক আছে, তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

"আমি বললাম, 'আপনিও আসুন না। ভাল হবে তা হলে।'

"পরদিন দু' গাড়ি বোঝাই করে সবাই গেলাম ভাবনির্ঝরে। দেখা গেল শেঠ শুধু নিজেই আসেননি, ওঁর স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে এসেছেন। নবীন অবশ্য আমাকে দেখেই ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আপনি !'

"'ভাবনির্ঝর জায়গাটা ভারী সুন্দর, না ?' ভালমানুষের মতো মুখ করে বললাম।

"ভাবনির্ঝরে এসে সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। লক্ষ করলাম নবীন একা একা হাঁটছে। ওর নজরে না পড়ে এভাবে ওর পিছু নিলাম আমি। দেখলাম একটা ঝোপের আড়ালে গিয়েও বসে পড়ল। যেন কারও অপেক্ষায়।

"আমি ছুটে শেঠকে ডেকে নিয়ে এসে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম।

"একটু পরেই দেখলাম ছোট ব্রিফকেস হাতে আরেকটি লোক এল নবীনের কাছে এবং দু'জনে নিচু গলায় কী সব কথাবার্তা বলল। তারপর ব্রিফকেস খুলে লোকটি বার করল একতাড়া নোট আর নবীন প্যান্টের পকেট থেকে বার করল কিছু কাগজ। দূর থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওগুলি ট্রেসিং পেপার, যাতে ডিজাইন আঁকা রয়েছে।

"কাগজগুলো দেখেই শেঠ এক লাফে নবীনের কাছে এসে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'নবীন, এটা কী হচ্ছে ?'

"আমি সরে এলাম। আত্মীয়দের ব্যাপারে বাইরের লোক না থাকাই ভাল। আর নবীন যখন হাতেনাতেই ধরা পড়েছে তখন আমার আর করবারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম ছোড়দি, ঘুড়ি ওড়ানোকে অত অশ্রদ্ধার চোখে দেখো না। আমি ঘুড়ি ওড়াতে না গেলে নবীন পারেখের ব্যাপারটা ধরাই পড়ত না।"

ছোটমামা থামলেন। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন বাকি। বললাম, "ছোটমামা, শেঠ নবীনকে কোনও শাস্তি দিলেন না ?"

"আরে সে এক মজার ব্যাপার। কয়েক দিন বাদে হঠাৎ অফিসে আমার ঘরে এসে হাজির নবীন পারেখ। আমি তো বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছি। ও কিন্তু সোজা এসেই হ্যান্ডশেক করে বলল, "থ্যাঙ্কস বিরুভাই, আপনার গোয়েন্দাগিরি আমার কাছে শাপে বর হয়ে গেছে। শ্বশুরমশাই আমাকে ফ্রান্সে পাঠাচ্ছেন টেক্স্টাইল ডিজাইনিং শেখার জন্য। তিন বছরের কোর্স। আমার স্ত্রীও সঙ্গে যাচ্ছে। ফেরার আগে ইউরোপ ঘুরে দেখারও পারমিশন দিয়েছেন।"

মা বললেন, "তুই-ই ধরলি ব্যাপারটা,আর তোকে কিছু দিল না শেঠ ?"

ছোটমামা একটা হাই তুলে বললেন, "মাস পেরোলে বড় গোছের বোনাস একটা দিতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ততদিনে দি গ্রেট শিলিগুড়ি টি কোম্পানির সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই ছেড়ে দিলাম চাকরিটা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

স্টার ওয়ারস

লেখা : আর্চি গুডউইন ছবি : আল উইলিয়ামসন

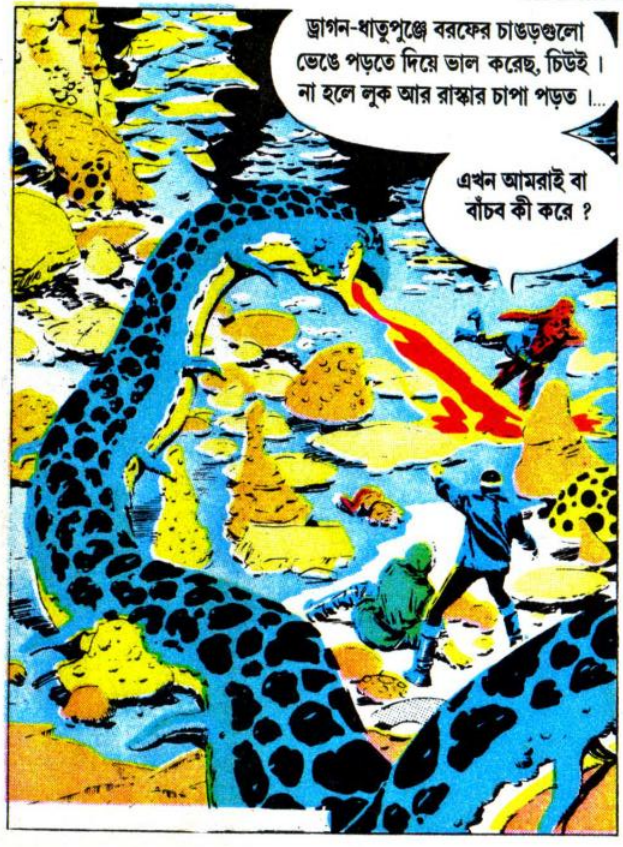

স্টার ওয়ারস

লেখা : আর্চি গুডউইন ছবি : আল উইলিয়ামসন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
পুকুরের বরফটা পরখ করে দেখা যাক গাবলু।
এখানে স্কেট করা যায় কিনা দেখি।
হ্যাঁ, স্কেট করার উপযুক্ত জায়গা!
1-2

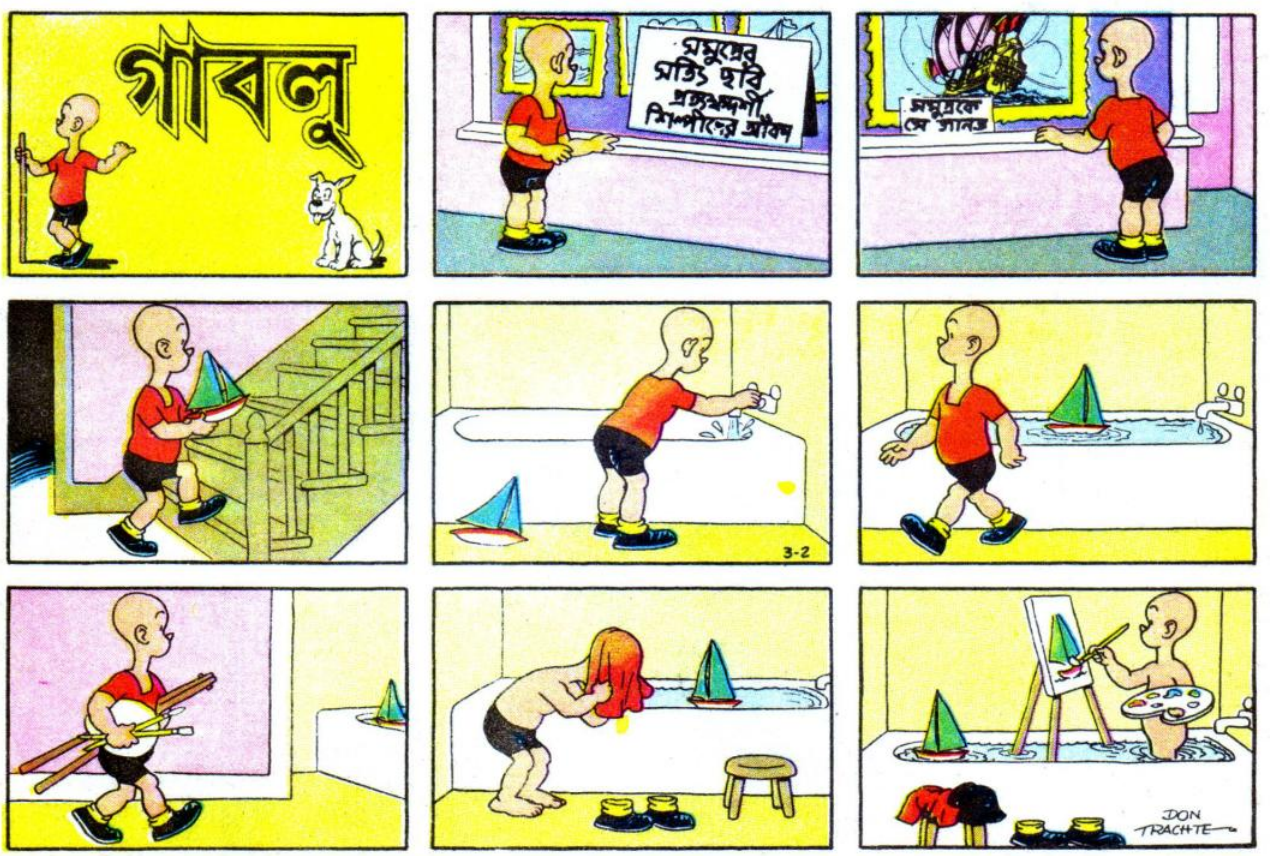
গাবলু
সমুদ্রের সত্যি ছবি প্রকৃতিদর্শী শিল্পীদের আঁকা
সমুদ্রকে যে জানত
3-2
JON TRACHTE

অলকানন্দার দেশে

উদয়ারুণ রায়

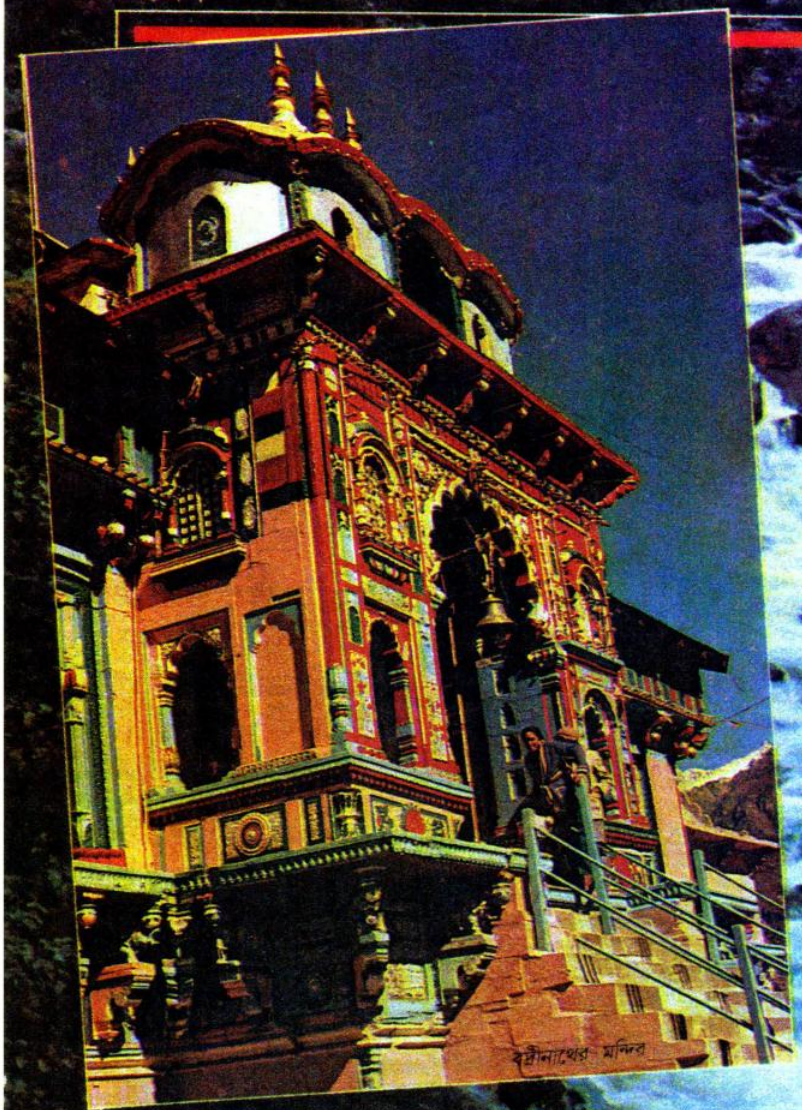

বদ্রীনাথের মন্দির

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রায় পুরোটাই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওটাই হল হিমালয় পর্বতের একদিক। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে-মাঝে পাহাড়ের পাথুরে গা চিরে খরস্রোতা নদী বা ছোট্ট শিশুর মতো চঞ্চল ঝরনা। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর অংশ জুড়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অপরূপ হিমালয় পর্বত। আর এই হিমালয়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর দেবভূমি। এইসব দেবস্থান নিয়ে রয়েছে আবার নানান গল্প। গল্প তো মানুষকে টানেই, আবার সেই সঙ্গে হিমালয়ের অসাধারণ সৌন্দর্যও মানুষকে আকর্ষণ করে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই দলে-দলে মানুষ যায় পুণ্য সঞ্চয়ে, আবার কেউ-বা সৌন্দর্যের টানে।

সবার মতো আমরাও তিন বন্ধু মিলে পুজোর সময় হঠাৎই বেরিয়ে পড়লাম সেই পাহাড়-ঘেরা গাড়োয়ালের পথে। ঠিক ছিল, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির দেখব, আর সময় বাঁচলে যাব গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। হাতে সময় মাত্র দশ দিন।

হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। একদিন ট্রেনে কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন সকালে পৌঁছলাম হরিদ্বার। হরিদ্বারকে অবশ্য ইউ·পি'র লোকেরা বলে 'হরদুয়ার'। আমাদের পবিত্র গঙ্গা নদী পাহাড় ছেড়ে হরিদ্বারেই প্রথম সমতলে নেমেছে। হরিদ্বার থেকে সেই ভোরেই বাসে করে হৃষীকেশে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর সাতটা।

দূরপাল্লার বাস টার্মিনাসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ভোর ছ'টায় বদ্রীনাথ-কেদারনাথের বাস ছেড়ে চলে গেছে। আর-একটা বাস বেলা আটটা নাগাদ ছাড়বে, তবে সেটা বদ্রীনাথ বা কেদারনাথ যাবে না। সেটা যাবে শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে পরদিন সকালে কেদারনাথের বাস পাওয়া যাবে। যত দূর যাওয়া যায়,এই ভেবে শ্রীনগরের বাসেই উঠে পড়লাম। বাস ছাড়ল ঠিক আটটায়। মিনিট দশেক যাওয়ার পরেই পাহাড়ে চড়া শুরু হল। পাক খেতে-খেতে একটা-দুটো করে অসংখ্য পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বাস উঠতে লাগল। একদিকে হাজার ফুটের খাদ আর অন্যদিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। বাস যত উপরে ওঠে,আমরা ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে হয়, এ কোথায় এলাম! দুপুর বারোটা নাগাদ আমরা টেহেরি নামে দু' হাজার তিনশো ফুট উঁচু এক পাহাড়ি শহরে এসে থামলাম। টেহেরির কিছু পরেই আমরা একটা সমতল উপত্যকা অঞ্চল দেখতে পেলাম। চারদিকে ঘিরে আছে পাহাড় আর মাঝখানে রয়েছে মাইলখানেকের এক সমতল ভূমি। ওই সমতলে নানা রকমের চাষ হয়েছে। দু-একটা ছোট পাহাড়ি ঘরও আছে।

বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছলাম গাড়োয়ালের রাজধানী পাঁচ হাজার ফুট উঁচু শহর শ্রীনগরে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। কিন্তু আশ্চর্য, এত উঁচুতেও কোনও ঠাণ্ডা নেই। কিন্তু রাতে থাকব কোথায়? পুজোর সময় ভ্রমণার্থীর ভিড় প্রচুর। সবাই বাস থেকে নেমে ছুটছে মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতে। আমরাও ছুটলাম। এখানে থাকার জন্য আছে বেশ কয়েকটা ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস ও হোটেল। একটা হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পরদিন ভোর পাঁচটার বাসে আমরা পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আর-একটা বাসে করে যেতে হবে গৌরীকুণ্ড। তারপর গৌরীকুণ্ড থেকে চোদ্দ

দেখা যায় নীলকণ্ঠের চূড়া

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

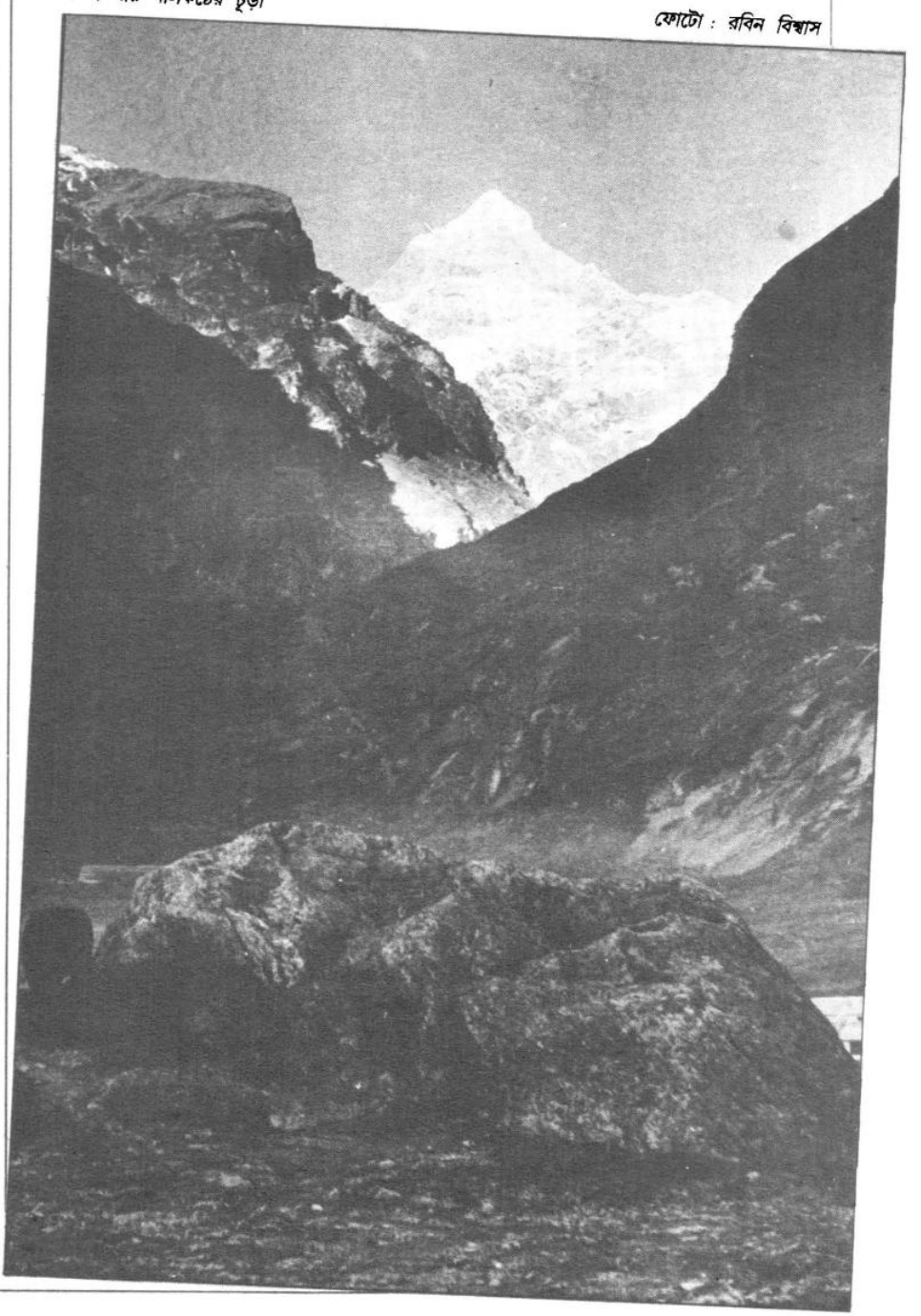

কিলোমিটারের হাঁটাপথ কেদারনাথ। রুদ্রপ্রয়াগের দু' ঘন্টার এই রাস্তাটা খুবই মনোরম। এক পাশের খাদের গা-ধরে পাইনের সারি, আর অন্যপাশে পাথুরে দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে সবুজের ছোঁয়া নেই বললেই চলে। রাস্তাটাও বেশ চওড়া। কোথাও ধস নামেনি। রুদ্রপ্রয়াগ শহরটা খুব ছোট্ট শহর। এখানেই অলকানন্দা আর মন্দাকিনী নদী এসে মিশেছে। গৌরীকুণ্ডের বাস ছাড়তে তখনও ঘন্টাখানেক বাকি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নেমে গিয়ে দুই নদীর সংযোগস্থলটা দেখে এলাম। দুপুর দশটা নাগাদ বাস পৌঁছল গুপ্তকাশী। এখানে মন্দাকিনী ঝরনার মতো পাহাড় ভেঙে নামছে। কয়েকশো ফুট ওপরে দাঁড়িয়েও তার কুলুকুলু ধ্বনি কানে এসে বাজে। এখান থেকে কেদারনাথের দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল। বাস এখানে অনেকক্ষণ থামবে। কারণ এর পর থেকে রাস্তা এত সরু ও অসমতল যে, সেখানে পাশাপাশি দুটো বাস একসঙ্গে ওঠা-নামা করতে পারে না। কিছু সময় ধরে ওপর থেকে বাস শুধু নামতেই থাকে, তারপর ওপরের বাস দাঁড়ায়। নীচ থেকে বাস ওঠে। তাই এখানে যতক্ষণ না ওপরের বাস নামে, ততক্ষণ নীচের বাস ওঠে না।

গুপ্তকাশী থেকে বাস ছাড়ল প্রায় এগারোটায়। বাস যত ওপরে উঠতে লাগল হিমালয় যেন তার সৌন্দর্যের পাতা এক-এক করে খুলতে আরম্ভ করল। রাস্তা বেশ দুর্গম। মাঝে-মাঝেই ধস নেমে রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। বাস ওই ধসের ওপর দিয়েই চলেছে, তবে আর একদিকে যে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য, তার আকর্ষণ কি কম? দুটোয় মিলে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি। ডান পাশে অনেক নীচে সরু শাড়ির মতো প্রবহমান মন্দাকিনী, মাথার ওপর নীল আকাশ আর তাকে ছুঁয়ে আছে বাঁ পাশের অসংখ্য পাহাড়চুড়ো। সামনে অনেক দূরে তুষারধবল কেদার শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মন আনন্দে নেচে উঠল। আমরা যাব ওই তুষারশৃঙ্গের পদতলে, কেদার - মন্দিরই আমাদের গন্তব্যস্থল। দুপুর একটা নাগাদ বাস এসে থামল গৌরীকুণ্ডে। বাস যেখানে থামল, সেখান থেকেই দেখা যায় কিছু দূরে মন্দাকিনীর স্রোত প্রায় শ'খানেক ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নদীর দু'ধার ঘেঁষে উঠেছে হিমালয়। মন দিয়ে কি প্রকৃতিকে দেখার উপায় আছে? হাতে সময় কম। চোদ্দ কিলোমিটার হেঁটে আজই পৌঁছতে হবে কেদারনাথে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি গৌরীকুণ্ডের এক হোটেলে মালপত্র রেখে সামনের উষ্ণকুণ্ডে ভাল করে স্নান করে নিলাম। গৌরীকুণ্ডে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। যেখানে ঠাণ্ডা প্রায় দু-তিন ডিগ্রি, যেখানে নদীর বা পানীয় জল বরফের মতো ঠাণ্ডা, সেখানে পাহাড়ের ফাটল থেকে গরম জল আসে কীভাবে! অদ্ভুত এই প্রকৃতির লীলা।

দুটো নাগাদ শুরু হল আমাদের হাঁটা। হাতে লাঠি, গায়ে যত রাজ্যের গরম জামা। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আর জল। পাহাড় ঘুরে-ঘুরে উঠতে লাগলাম ওপরে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঠতে

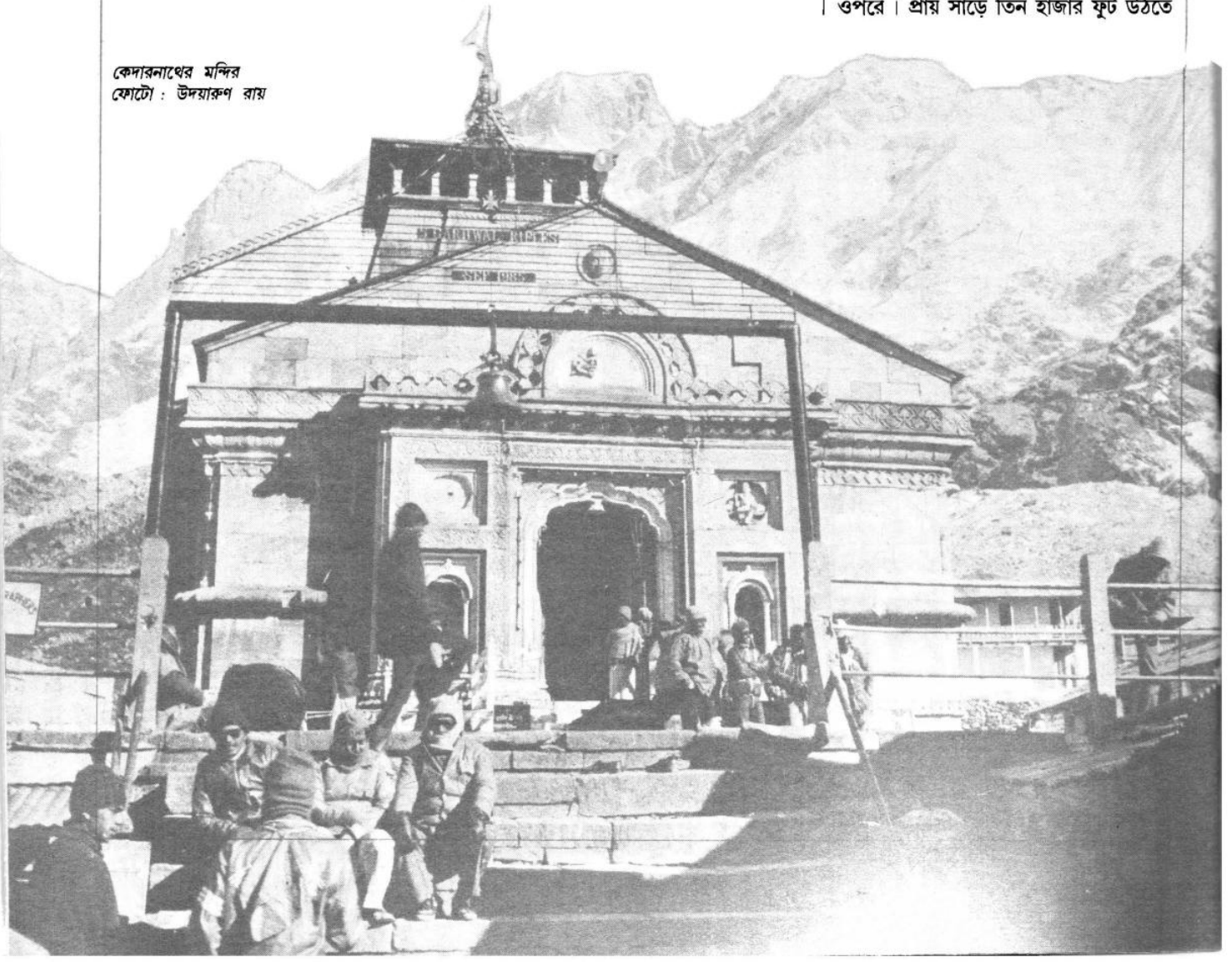

কেদারনাথের মন্দির
ফোটো : উদয়ারুণ রায়

হবে। শুধু চড়াই আর চড়াই। রাস্তাও অত্যন্ত উঁচু-নিচু পাথরে ভর্তি। এর ওপর আবার দলে-দলে ঘোড়া, মানুষ নিয়ে ওপরে উঠছে আর নামছে। ওদের রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় বারবার। পথ এত চড়াই যে, একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরে যায়। নিশ্বাসের কষ্ট হয়। তবে সব কষ্টই তুচ্ছ হয়ে যায় প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখে। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই বরফে-ঢাকা পাহাড়। ঠাণ্ডাও ক্রমশ বাড়তে বাড়তে মাইনাস দু'-তিন ডিগ্রি। সঙ্গে একটা হাড়কাঁপানো হাওয়া। কিছু দূর যাওয়ার পরেই শুরু হল তুষার বৃষ্টি। তবে ভাগ্য ভাল তুষার বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলল না। শুরু হল আবার হাঁটা। দেখতে দেখতে আলো কমে এল। রাস্তা আরও দুর্গম হয়ে উঠল। আলো থাকাকালীন আমরা হাঁটাপথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য বেশ কয়েকবার পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছিলাম। কিন্তু আলো কমে যাওয়ায় পাকদণ্ডীর পথ ছাড়তে হল। আমরা টর্চ জ্বেলে যতটা সম্ভব খাদের দিক থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। পায়ের তলায় তখন বরফ। কেদারনাথে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে সাতটা বেজে গেছে। চারদিক নিঝুম। সবাই যে-যার ঘরে লেপের তলায়। ঠাণ্ডা তখন মাইনাস পাঁচ ডিগ্রির নীচে। শুধু কেদারনাথের মন্দিরের চাতালে একটা লাইট জ্বলছে। বোধহয় এই আলো জ্বলে জেনারেটরে। আমাদের আশ্রয় মিলল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। দোতলার একটা ঘর। জানলা দিয়ে দেখা যায়, সেই তুষারাবৃত কেদার-শৃঙ্গ। সামনেই লক্ষ্মী পূর্ণিমা। চাঁদে আর বরফে মিলে রুপোলি আলোর বন্যা চারদিকে। ঠাণ্ডার ভয় ভেঙে আবার বেরোলাম আশ্রমের বাইরে। মন্দিরের কাছে এসে দেখি, বরফ আর জ্যোৎস্নার বন্যায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে এ যেন এক মায়াবী জগৎ, এক বরফনগরী।

পরদিন সকাল সাতটায় আমরা চটপট বরফজলে কোনওমতে হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কেদার মন্দিরে পুজো দিয়ে সোজা গৌরীকুণ্ডে। সেখান থেকে আবার যাত্রা বদ্রীনাথের দিকে।

গৌরীকুণ্ড থেকে রুদ্রপ্রয়াগে এসে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোর ছ'টায় আবার বাস। সারাদিন বাস চলবে। বিকেল চারটেতে পৌঁছবে বদ্রীনাথে। এখানে আর পায়ে হাঁটা নেই। তবে চলতি পথের দৃশ্য তো ভুলবার নয়। এখানে পাহাড় বেশ ন্যাড়া, গাছপালা নেই বললেই চলে। পাথরের রঙ কিছুটা কালচে। ঘাস বা গাছের রঙে বাদামি ছোঁয়া। নীচে সরু অলকানন্দার স্রোত। রাস্তা ভীষণ সরু আর খাড়াই। কোনও-কোনও জায়গায় বাসের মাথার ওপর পাহাড় ঝুঁকে এসেছে।

বদ্রীনাথে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটায়। বদ্রীনাথের উচ্চতা দশ হাজার তিনশো ফুট। বদ্রীনাথ মন্দিরকে ঘিরে এখানে সুন্দর একটা জনপদ গড়ে উঠেছে। অক্টোবরের ঠাণ্ডায়ও প্রচুর ভ্রমণার্থী। দেখে মনে হল, বদ্রীনাথপুরীও একটা পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চল। এখান থেকে তিব্বতের 'মানা' সীমান্ত অঞ্চলের দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার। এখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্মশালা নেই, অন্য একটা ধর্মশালায় উঠতে হল। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মন্দিরের দিকে পা চালালাম।

মন্দিরের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। মন্দির থেকেই নেমেছে নদী-ঘাটের সিঁড়ি। আশ্চর্য এই যে, নদীর পাশেই আছে এক উষ্ণকুণ্ড। এর গরম জল গিয়ে পড়ছে অলকানন্দায়। এখানে অলকানন্দা পাহাড়ি নদীর তুলনায় বেশ চওড়া। আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে নদীর ওপারে একটা রেস্তোরাঁয় বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। আকাশে তখন সূর্যের শেষ রাঙা আলো। নীচে অলকানন্দার স্বচ্ছ নীল জল। সামনে বদ্রীনারায়ণের মন্দির আর মন্দিরের ডান পাশে মাথার ওপর তাকিয়ে আছে নীলকণ্ঠ-শৃঙ্গ, যেখানে আজও কেউ পৌঁছতে পারেনি।

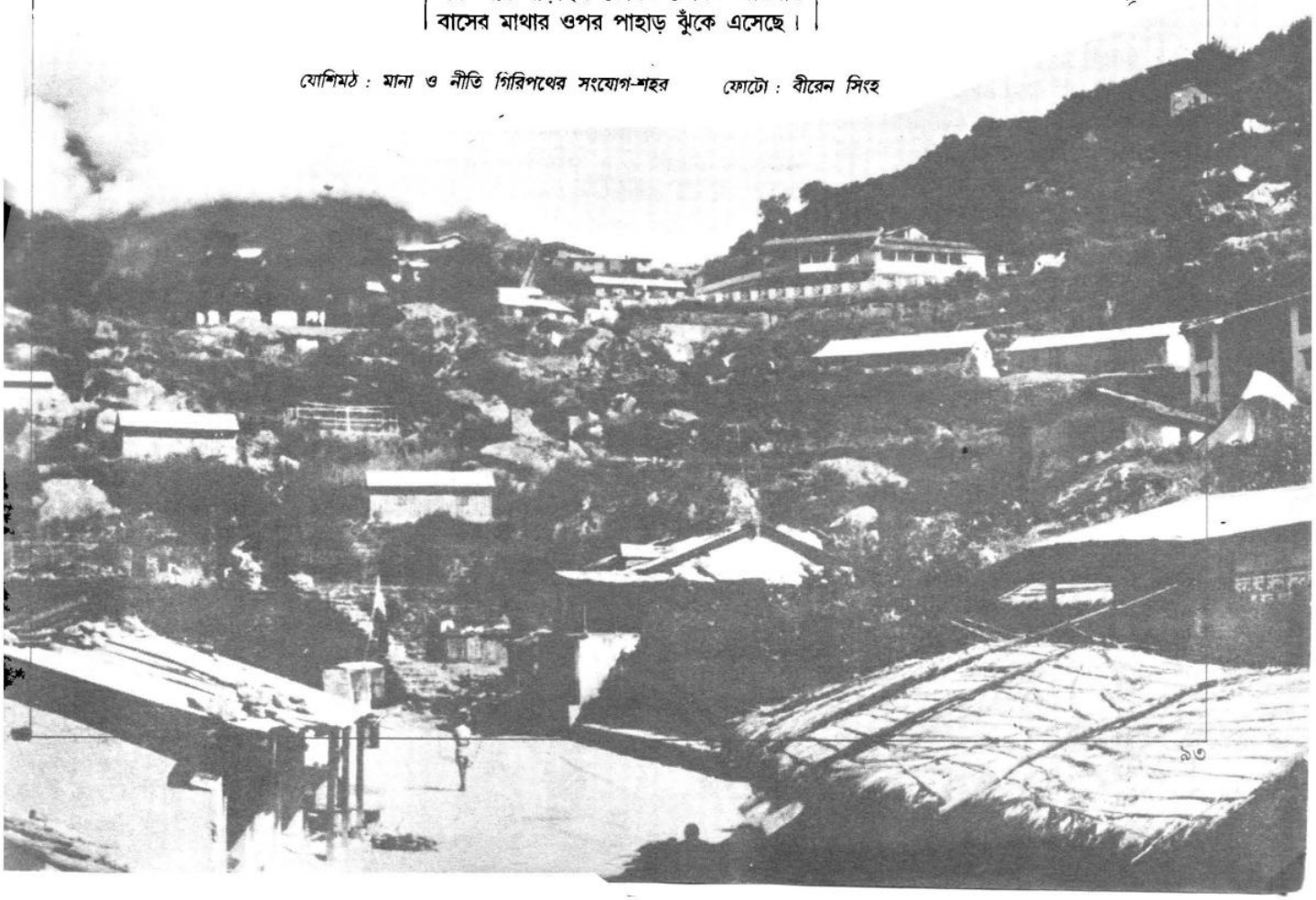

যোশিমঠ : মানা ও নীতি গিরিপথের সংযোগ-শহর *ফোটো : বীরেন সিংহ*

দুটি বই : নানা ধরনের লেখা

কিশোর সাহিত্য সমগ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩। দাম : কুড়ি ও পঁচিশ টাকা।

কিশোরদের জন্য নানা ধরনের সাহিত্য পরিবেশন করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তাঁর এই বই দুটিতে। রূপকথা, ডিটেক্‌টিভ গল্প, ভ্রমণকাহিনী, ভারতের বীরদের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শুরু করে কল্পলোকের কথা, পৃথিবীর ইতিহাস, ডিকেন্স-এর কিছু গল্পের অনুবাদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং এধরনের আরও কিছু গল্প গ্রন্থ দুটির কলেবর বাড়িয়েছে। কিশোরদের অনুসন্ধিৎসু মনের কথা বিবেচনা করেই প্রবীণ লেখক এত কিছুর আয়োজন করেছেন।

প্রথম খণ্ডে ভারতের সংগ্রামের যে আঠারোটি ঐতিহাসিক কাহিনী আছে, সেগুলিই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। ঝিলমের যুদ্ধ থেকে সিপাহিবিদ্রোহের কাহিনী কিশোরদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু বানানো কিছু গল্প-উপন্যাস না পড়ে, কিশোররা যদি এ-ধরনের ঐতিহাসিক গল্পও পাঠ করে তা হলে তারা দেশ ও জাতিকে ভালভাবে বুঝতে পারবে। তবে কিছু-কিছু কাহিনী নিছক বিবরণধর্মী হয়ে পড়েছে। যেমন 'সিপাহি বিদ্রোহ' লেখাটি। এখনকার ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা নিছক বিদ্রোহ বলে ছোট করে দেখাতে চান না। বরং সিপাহিদের অভ্যুত্থানকে তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলেই মনে করেন। সিপাহিদের অভ্যুত্থানের ঘটনাটি লেখক যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখালে পারতেন। ওই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নতুন একটি ব্যাখ্যা তা হলে তাঁর কাছে পাওয়া যেত।

প্রথম খণ্ডে 'দেশে-বিদেশে' অংশে কিছু ভ্রমণকাহিনী আছে। উদয়পুর ও চিতোরগড়, সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্, মীনাক্ষী মন্দির, 'আচারী'দের মহাতীর্থ ইত্যাদি। গজেন্দ্রকুমারের এগুলি তরুণ বয়সের লেখা বলে জানানো হয়েছে। তবে পুরনো লেখা হলেও এখনও পড়তে ভাল লাগে। অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গ অবশ্য এসে পড়েছে। কিন্তু সেই সব অংশ উপেক্ষা করা কঠিন নয়। বরং ভ্রমণকাহিনীগুলিতে এমন কিছু অংশ আছে, যা রীতিমত উপভোগ্য। প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানকে মিলিয়ে লেখক তাঁর ভারত-দর্শনের নানা কথা লিখেছেন। লেখাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে এক ধরনের নস্টালজিয়া।

কিন্তু ডিটেকটিভ গল্পের দক্ষ ও সফল লেখক হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। তাঁর গোয়েন্দা তরুণ গুপ্ত আমাদের হতাশ করেছেন। তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথার প্রথম গল্পটি তো বাস্তবতাকে

পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছে। একটি মালগাড়ির মাঝখানের একটি ওয়াগন চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় যে চমকই থাক, গল্পটি কিন্তু এগিয়েছে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে।

প্রথম খণ্ডেই আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কিশোর সাহিত্য সমগ্রে কৃত্তিবাসের রামায়ণ কেন সংযোজিত হল? বলা হয়েছে এই রামায়ণ 'গজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত'। সপ্তকাণ্ড পড়েও কিন্তু বোঝা গেল না, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের করণীয় কী? প্রাচীন সাহিত্যের ভাষাগত কিছু আধুনিকীকরণেই কি সম্পাদকের কাজ ও দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়?

দ্বিতীয় খণ্ডে ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার টুইস্ট, ওল্ড কিউরিওসিটি শপ্, এ টেল অব টু সিটিজ-এর মতো কয়েকটি বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের

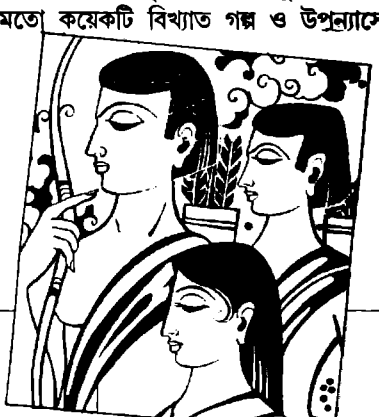

সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশিত হয়েছে। লেখক গল্পগুলি একটু বেশি কাটছাঁট করেছেন। তা হলেও, তাঁর অনূদিত ভাষ্য মূল গল্প পাঠে কিশোরদের উৎসাহিত করবে। 'কল্পলোকের কথা' প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন : 'এই গল্প দুটিই দুটি বিখ্যাত ইংরেজি গল্পের কঙ্কাল অবলম্বন করে লেখা। অনাবশ্যক বোধে তাদের নাম দিলুম না।' মূল গল্পের লেখকদের নাম উল্লেখ করাটা 'অনাবশ্যক' হবে কেন? এই গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'পৃথিবীর ইতিহাস' বইটি। লেখক তাঁর এই বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন। পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনা এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী হত্যা পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ নথিবদ্ধ হয়েছে। সুলিখিত পৃথিবীর ইতিহাস। তবে সুখপাঠ্য নয়। আর তার জন্য লেখককে আমরা কোনও মতেই দায়ী করতে পারি না। কারণ তথ্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর নানা দেশে ক্রমবর্ধমান অশান্তি ও অসন্তোষের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন নানা বিরোধ, সংঘর্ষ ও বর্ণবিদ্বেষের কথা। হানাহানির ইতিহাস পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। লেখক আর কী করবেন। তবে তিনি যেভাবে ১৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে পৃথিবীর আদ্যন্ত ইতিহাসের একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা করতেই হয়। আরও ভাল কথা যে, লেখক কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যও যোগ করেছেন। অর্থাৎ নিস্পৃহ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করতে চাননি, চেয়েছেন নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী ইতিহাসকে দেখতে। এখানে তিনি পুরোদস্তুর সচেতন লেখক।

'পৃথিবীর ইতিহাস'-এর শেষ পঙ্‌ক্তি হল : '...আজ সারা পৃথিবী এক আতঙ্কের মধ্যে প্রহর গুনছে, আবার কবে এক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে ওঠে—সেই আশঙ্কায়।' পৃথিবীর এখনকার অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখে লেখক কোনও আশার বাণী শোনাতে পারেননি। কিন্তু মেঘের আড়ালে আশার রুপোলি রেখা কি চিরদিনের মতো আমাদের চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে? সব বিশ্বাসই কি আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি। লেখক যাঁকে 'পৃথিবীর ইতিহাস' উৎসর্গ করেছেন তিনিই না বলে গেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ন্যাক্স-এ কী রকম স্বাদ আপনার পছন্দ ?

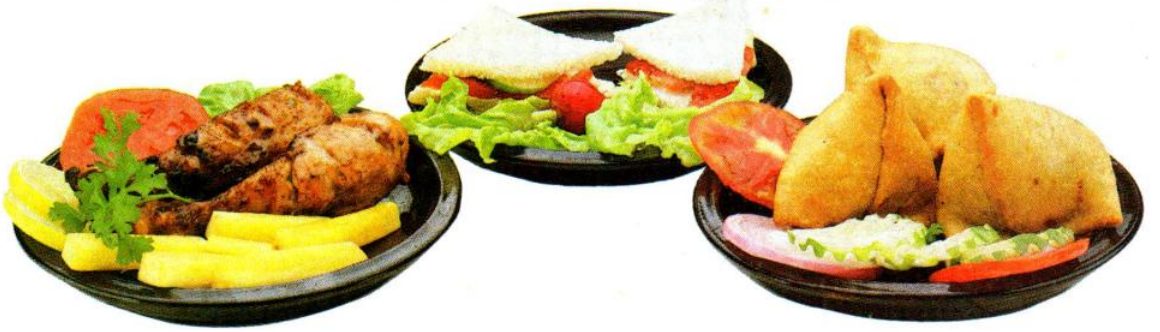

টক-মিষ্টি?

কিসান টম্যাটো সস্ *। রসালো টম্যাটোর টকমিষ্টি এ এক আলাদা নতুন স্বাদ! পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া নেই। গরম গরম সিঙ্গারা ও পাকোড়া তো বটেই—বড়া, ইডলি বা দোসার সঙ্গে যা জমে-না, কী বলব!

ঝাঁঝ-ঝাঁঝ?

কিসান টম্যাটো কেচাপ *। স্যান্ডউইচ, বার্গার বা হট ডগ, যা মন চায় নিয়ে বসুন। মিশিয়ে নিন চনমনে স্বাদের এই চমৎকার কেচাপ। আহ্—কী অপূর্ব স্বাদ। বলে বোঝানো যায় না।

ঝাল-ঝাল?

কিসান টম্যাটো চিলি সস্। লঙ্কার স্বাদে-গুণে টইটম্বুর। যখন মন বলছে একটু ঝাল-ঝাল খাবার হলে বেশ জমতো তখন চীনে স্ন্যাকস, খাবার অথবা দিশি রান্নার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। দেখুন, কী দারুণ লাগে!

মশলাদার?

কিসান টম্যাটো গার্লিক সস্। আহ্—রসুনের সেই খোশবু। প্রতিটি খাবার করে এত মুখরোচক যে চেটেপুটে খেতে ইচ্ছে হয়। বিশেষ করে ককটেল মেনু হলে তো কথাই নেই—কাবাব, চিজ, টোস্ট বা অন্যকিছু—সবেতেই দারুণ!

সব সময় সবার পছন্দ!

Kissan

* এখন নতুন "দারুণ-দেখতে"লেবেলে।

OBM 2484 Ben

ANANDAMELA 21 JANUARY 1987 REGD. NO. WB/CC/264. MH By-SOUTH 683 TN/MS(C)/731

everest/86/PP/412-bn